প্রকাশক :
গৌরকিশোর মুখোপাধ্যায়
জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং
২২-এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

মুদ্রাকর :
১ থেকে ২২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত
স্বপনকুমার কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

অবশিষ্টাংশ
অজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের কাছে
যিনি পিতামহ ভীষ্মের তুল্য,
সেই
আচার্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
মহোদয়কে
এই সামান্য বইখানি উৎসর্গ করে ধন্য হলাম

সূচীপত্র

ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক্ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক্ পর্যন্ত সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান স্রষ্টা ও অনুপ্রেরয়িতাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য একত্র করা হয়েছে এবং তাঁদের আবির্ভাবকাল নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঐ সময়টিই যথার্থ মধ্যযুগ। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ অর্থাৎ উন্মেষ-পর্ব ; ঐ পর্বের তথ্য ও কালক্রম সম্বন্ধে আমার আর একখানি বই—'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়'-এ বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব ও চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যের একটি সুনির্দিষ্ট ঠাট গড়ে ওঠে এবং তার ফলে অজস্র গ্রন্থ রচিত হতে সুরু করে ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ-পর্ব অর্থাৎ মধ্যযুগ দেখা দেয় ; ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের অল্প পরে এই যুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগ সুরু হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সব প্রয়োজনীয় তথ্য এই গ্রন্থে দিতে পেরেছি, এমন দাবী করি না। এই যুগের সাহিত্যকে ভিত্তি করে গবেষণার সৌধ যাঁরা গড়ে তুলবেন, তাঁদের জন্য আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু ইঁট, কাঠ ও লোহা এ-বইয়ে সংগ্রহ করে রেখে গেলাম। তাঁরা এগুলি ব্যবহার করবেন কিনা, তা জানি না।

এই বইয়ে শুধু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকবৃন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নি,—চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এবং তাঁর পরিকরবৃন্দ, তাঁর অনুবর্তী বৈষ্ণব নেতৃবর্গ এবং তাঁর চরিতগ্রন্থ (সংস্কৃত)-রচয়িতাদের মধ্যেও অনেকের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এর 'ছয়', 'সাত', 'আট', 'নয়', 'আঠার' ও 'উনিশ' সংখ্যক অধ্যায়গুলিতে। ঐ অধ্যায়গুলির দিকে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে আরও দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। এ বইয়ের 'সাত' সংখ্যক অধ্যায়ে হরিদাস ও রূপ-সনাতন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু হরিদাসের মৃত্যুর তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে 'পনের' সংখ্যক অধ্যায়ে (পৃঃ ১০১) এবং রূপ-সনাতনের তিরোভাবের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে 'আঠার' সংখ্যক অধ্যায়ে (পৃঃ ১২৩-১৩১)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান গ্রন্থে (পৃঃ ৪৯) আমরা নিত্যানন্দের জন্মের শুধু বৎসর নয়, তারিখটিও নির্ণয় করেছি।

আর একটি কথা এই ভূমিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার বলে মনে করছি। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এই বইয়ের দু'টি পুথিতে রচনাকালবাচক শ্লোক

মিলেছে। শ্লোকটি যিনি আবিষ্কার করেছেন, তিনি শীঘ্রই পুথির বিবরণ সমেত শ্লোকটিকে প্রকাশ করবেন। তবে, শ্লোকটি সম্বন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমরা এখানে দিচ্ছি যে—শ্লোকটি থেকে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের যে রচনাকাল পাওয়া যায়, তা ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বছর পরবর্তী। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বারা খাঁর নামাঙ্কিত ১০৪৭ বঙ্গাব্দ বা ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের দানপত্র (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৬১ দ্রঃ) পেয়ে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ১৬৪০ খ্রীঃর কয়েক বছর পরে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল লিখেছিলেন ; এই বইয়ে (পৃঃ ২৪২-৪৫ দ্রঃ) আমরা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে দীনেশবাবুর সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছি। দীনেশবাবুর নির্ণীত ও আমাদের সমর্থিত ঐ সময়ই কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের প্রকৃত সময় বলে এখন প্রমাণিত হল।

কাশীরাম দাস সম্বন্ধে এই বইয়ে আমরা যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি, তাদের মধ্যে বনপর্ব অসম্পূর্ণ রেখে কাশীরামের পরলোক গমন ও মুখটি অভিরামের আশীর্বাদে গ্রন্থ রচনার সমর্থন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কোন কোন পুথিতে মেলে ; ঐ সমিতির একটি পুথিতে জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি কাশীরামের বাড়ীতে বসে বনপর্ব সম্পূর্ণ করার দাবী জানিয়েছেন। (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' পৃঃ ১০৫-০৬ দ্রষ্টব্য)।

'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' সম্পূর্ণ নতুন বই হলেও আমার 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' (১৯৫৮) বইয়ের সঙ্গে এর কিছু সম্পর্ক আছে। এ সম্বন্ধে আমি 'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' বইয়ের ভূমিকায় আলোচনা করেছি।

এই বইটি লেখার সময়ে কয়েকজন বন্ধু ও হিতৈষীর কাছে আমি বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ আমাকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বহু বই ও পত্রপত্রিকা দিয়েছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন পুথি দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। মুকুন্দরাম ও ক্ষেমানন্দের কাল-নির্ণয়ের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—মুকুন্দরাম-পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীর দানপত্রটি যে নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' প্রকাশিত হয়েছিল, এ খবর শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী আমায় জানান : তাঁর কাছ থেকেই ঐ বইটির সংশ্লিষ্ট খণ্ডটি নিয়ে দানপত্রটির আলোক-চিত্র ও অনুলিপি এই বইয়ের ১৬০-৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছি , সুরেশবাবুর কাছে আরও কোন কোন তথ্য পেয়েছি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়ালও কয়েকটি

ব্যাপারে আমায় সাহায্য করেছেন ; বইয়ের মধ্যেই যথাস্থানে তার স্বীকৃতি আছে। ঢাকা-নিবাসী জনাব সৈয়দ মূরতজা আলী ও জনাব শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমীন এবং বিশ্বভারতী পল্লীশিক্ষাসদনের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন রায়ও কোন্ কোন বিষয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

এ বইয়ে যখন কোন বই থেকে উদ্ধৃতি বা নিদর্শনী দেওয়া হয়েছে, তখন সেই বইয়ের সংস্করণ উল্লিখিত না থাকলে প্রথম সংস্করণ বুঝতে হবে।

অনবধানতা-বশত এই বইয়ে একই শব্দ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বানানে লেখা হয়েছে। যেমন, আলাওলের একটি বই 'সেকান্দরনামা', 'সেকান্দারনামা' ও 'সেকেন্দারনামা' তিন রূপেই লেখা হয়েছে ; প্রথম রূপটিই সর্বত্র লেখা উচিত ছিল। এই জাতীয় ত্রুটির জন্য সকলের কাছে মার্জনা চাইছি। আর একটি কথা। পৃঃ ২২৪, ১২শ ছত্রে "মহম্মদ সৈয়দ" স্থলে "সৈয়দ মহাম্মদ" পঠনীয়।

এ বইয়ের বানান সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলার আছে। 'পুথি' শব্দটি আমি মূল বানানেই সর্বত্র উল্লেখ করেছি, কোথাও কোথাও অবশ্য অনবধানতার দরুন 'পুঁথি' ছাপা হয়ে থাকতে পারে। রেফাক্রান্ত হলে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব আমি আমার লেখায় বর্জন করি। কিন্তু পুরোনো বাংলা সাহিত্যে রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জিত হত না বলে সেই সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দেবার সময়ে ঐ ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বজায় রেখেছি ; কোন লোক বানানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম অনুসরণ করেছেন, তার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও আছে বলে আমি মনে করি না। "পরিষদের" না লিখে "পরিষতের" (পরিষৎ+এর) লিখেছি জ্ঞাতসারে। যাঁরা "পরিষদের" লেখেন, তাঁদের মাথায় বোধ হয় সাময়িকভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূত ভর করে। তাঁরা কি "জগতের" না লিখে "জগদের" লেখেন?

আমার আগেকার বইয়ের মত এ বইতেও 'বাংলা দেশ' শব্দটিকে তার মৌলিক অর্থে—আবহমান কাল ধরে যে অর্থে সকলে শব্দটিকে ব্যবহার করে এসেছেন,—সেই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ইংরেজীতে Bengal বললে যা বোঝায়, 'বাংলা দেশ' বলতে আমি তা'ই বুঝিয়েছি।

সুখময় মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

বিজয় গুপ্ত

বান, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাপ, বাঘ, রাজরোষ প্রভৃতির অত্যাচারে মধ্যযুগের বাঙালী যতই জর্জরিত হয়েছে, ততই নানা লৌকিক দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়ে অব্যাহতির প্রার্থনা জানিয়েছে। এই লৌকিক দেবদেবীর মহিমা কীর্তন উপলক্ষ করেই গড়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা—মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই সবচেয়ে প্রাচীন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসামঙ্গল পাওয়া গিয়েছে। অন্য কোন মঙ্গলকাব্যের এত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

এদের মধ্যে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (বা পদ্মাপুরাণ) বাংলার জনপ্রিয় কাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববঙ্গে এই কাব্যের জনপ্রিয়তা এত বেশী হয়েছিল যে গায়েনদের হাতে পড়ে মূল রচনা একান্ত বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং তার সঙ্গে অন্য কবিদের রচনা এসে মিশেছে। এ দিক দিয়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে এই বই-এর তুলনা চলে।

কিন্তু এই বই-এর রচনাকাল সম্বন্ধে গবেষকদের মধ্যে এখনও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তার কারণ এর পুথি খুবই দুর্লভ এবং বিভিন্ন ছাপা বইতে বিভিন্ন রচনাকালবাচক শ্লোক পাওয়া যায়। তাই অনেকে এইসব শ্লোকের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি।

এসম্বন্ধে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমরা বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের সবচেয়ে পুরোনো মুদ্রিত সংস্করণটির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করব। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে বরিশাল থেকে রামচরণ শিরোরত্ন এই সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে তিনখানি পুথি ব্যবহৃত হয়েছিল। একখানি ১১৮১ সন বা ১৭৭৪-৭৫ খ্রীস্টাব্দের, দ্বিতীয়টি ১৭২০ শক বা ১৭৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দের এবং তৃতীয়টি ১৭৯৪ শক বা ১৮৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দের। তখনও বিজয় গুপ্তের সময় নিয়ে কোন বিরোধ বা বিতর্ক দেখা দেয় নি বলে এই বিষয়ে এই সংস্করণের সাক্ষ্য মূল্যবান।

এই সংস্করণে এই রচনাকালনির্দেশক শ্লোকটি পাওয়া যায়—

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতিতিলক॥

বিজয় গুপ্তের নিজের গ্রামের পুথিতেও শ্লোকটির এই পাঠই পাওয়া গিয়েছে। এর

থেকে জানা যায়, ১৪০৬ শকে (=১৪৮৪-৮৫ খ্রীঃ) বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ে কোন সুলতান হোসেন সাহাকে পাওয়া গেল না। হোসেন সাহা বলতে সকলে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্কেই জানতেন। তিনি ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর জন্য অনেকে রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

তখন কোন কোন গবেষক জানালেন একখানি পুথিতে 'ঋতু শূন্য বেদ শশী'র জায়গায় 'ঋতু শশী বেদ শশী' পাঠ পাওয়া গিয়েছে। ১৪১৬ শক (=১৪৯৪-৯৫ খ্রীঃ) আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালের মধ্যে পড়ে বলে অনেকে এই পাঠ গ্রহণ করলেন। কিন্তু অনেকেরই সন্দেহ ঘুচল না। কারণ, যে পুথিতে এই পাঠ পাওয়া গিয়েছিল, তার কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি।

আমাদের মনে হয়, 'ঋতু শশী বেদ শশী' পাঠ আসলে কোন পুথিতে আদৌ ছিল না। ১৪০৬ শকে হোসেন শাহ্কে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি কৃত্রিম প্রমাণিত হলে বিজয় গুপ্তের প্রাচীনত্বের দাবি কমে যায়। এইসব কারণেই 'ঋতু শশী বেদ শশী' এই কাল্পনিক পাঠের উদ্ভাবন করা হয়েছিল।* আসলে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম মুদ্রিত সংস্করণ এবং তাঁর নিজের গ্রামের পুথির সাক্ষ্যই ঠিক্। 'ঋতু শূন্য বেদ শশী' পাঠই শুদ্ধ। ১৪৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ ছিলেন না বটে, কিন্তু আর এক হোসেন শাহ্ ছিলেন। তাঁর রাজকীয় নাম জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ্ হলেও সাধারণের কাছে তিনি হোসেন শাহ্ নামেই পরিচিত ছিলেন। ইনি "পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশে"র লোক। এঁর রাজত্বকাল ১৪৮১-১৪৮৭ খ্রীঃ। এঁর সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal (Vol. II)-এ লেখা আছে, "...named Husain, who on his accession assumed the title of Jalaludin Fath" এবং "Most of his coins bear, after the regnal titles, the words 'Husain Shahi', which, like the 'Badr Shahi' of Ghiyasuddin Mahmud of the Husaini dynasty, must refer to his popular name." (p.136)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দ বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের প্রকৃত রচনাকাল এবং হোসেন সাহার উল্লেখের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই।

*বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৬২) সংস্করণে যে তিনটি পুথি ব্যবহৃত হয়েছিল, তার একটিতে নাকি "ঋতু...শী বেদ শশী" পাঠ আছে, অন্য দু'টি পুথিতে "ঋতু শূন্য বেদ শশী" আছে (ঐ সংস্করণ, পৃঃ ৮)। সম্পাদক যাকে "শী" মনে করেছেন, তা "শূন্য"-ই, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

এ'ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয় থেকে মনে হয় যে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল।* সেগুলি এই :—

(ক) বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে'র হাসন-হোসেন পালায় হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচারের একটি চিত্র পাওয়া যায়। জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে এই ধরনের অত্যাচার যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে জানা যায়। ('বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল', ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২৭-২৩৫ দ্রষ্টব্য।)

(খ) বিজয় গুপ্তের বাসভূমি ফুল্লশ্রী গ্রাম "মুলুক ফতেয়াবাদ"-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে বিজয় গুপ্ত লিখেছেন। এই "ফতেয়াবাদ" বা ফতেহাবাদ জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখানকার টাকশাল থেকে তাঁর অনেকগুলি মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল।

(গ) বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল যদি ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪-৯৫ খ্রীস্টাব্দেই রচিত হয়ে থাকে, তা হলে বলতে হবে—আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল; তা হলে বিজয় গুপ্ত রাজা হিসাবে "হোসেন সাহা"র যে প্রশংসা † করেছেন তা অর্থহীন হয়ে পড়ে, কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে নতুন রাজা এতখানি যোগ্যতার পরিচয় দেবেন এবং সুদূর ফতেহাবাদ অঞ্চলে সে কথা ছড়িয়ে পড়বে বলে ভাবা যায় না। কিন্তু বিজয় গুপ্ত ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করে থাকলে এই প্রশ্ন ওঠে না, কারণ জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ্ তার কয়েক বছর আগে থাকতেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর রাজ্যের সব অঞ্চলের লোকেরাই ইতিমধ্যে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়েছিলেন। এ থেকেও বলা যায়, বিজয় গুপ্ত কর্তৃক উল্লিখিত "হোসেন সাহা" আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ নন, জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ্।

সুতরাং বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল যে ১৪৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দেই রচিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

* ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আমার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন (আমার লেখা 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল' বইয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† সুলতান হোসেন সাহা নৃপতিতিলক।
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের সূচনায় বিজয় গুপ্ত* যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তার থেকে জানা যায় যে—বিজয় গুপ্তের নিবাস ছিল (বর্তমানে পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত) ফুল্লশ্রী গ্রামে ; গ্রামটি ছিল ফতেয়াবাদ বা ফতেহাবাদ "মুল্লুক"-এর বাঙ্গরোড়া তকসিমে অবস্থিত ; এর পশ্চিম দিক্ দিয়ে ঘাঘর এবং পূর্ব দিক্ দিয়ে ঘণ্টেশ্বর নদ প্রবাহিত হত ; গ্রামটিতে "চারি বেদধারী" ব্রাহ্মণরা, 'নিজ শাস্ত্রেতে কুশল" বৈদ্যরা, লিখননিপুণ কায়স্থরা এবং অন্য কোন কোন জাতির লোকরা বাস করত, এই গ্রামের সব লোকই "গুণময়" ছিল বলে কবি লিখেছেন ; তাঁর পূর্ববর্তী কবি কাণা হরি দত্তের 'মনসামঙ্গল' মনসার পছন্দ না হওয়াতে ও তা লুপ্ত হওয়াতে মনসা বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে নতুন 'মনসামঙ্গল' লিখতে আদেশ দেন।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত History of Bengal দ্বিতীয় খণ্ডে (p. 152) ডঃ এ বি এম. হবীবুল্লাহ্ "Bijay Gupta (Chhota Vidyāpati)" লিখেছেন। বিজয় গুপ্ত কস্মিনকালেও "ছোট বিদ্যাপতি" নামে পরিচিত ছিলেন না, ডঃ হবীবুল্লাহ্ এখানে কবিরঞ্জন ও বিজয় গুপ্তের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেছেন। ডঃ হবীবুল্লাহ্‌র ভুল আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের সম্পাদক জয়ন্তকুমার দাশগুপ্তকেও বিভ্রান্ত করেছে।

॥ দুই ॥

বিপ্রদাস পিপিলাই

বারাসত অঞ্চলের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই-এর লেখা মনসামঙ্গল (বা মনসাবিজয়) বাংলার সর্বপ্রাচীন মনসামঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এই কাব্যে কবি এইভাবে কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন,

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের প্রধান ॥

সুতরাং ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দই বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলকাব্যের রচনাকাল।

কিন্তু এই তারিখে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সন্দেহের প্রধান কারণ, কাব্যের নবম পালায় চাঁদো অর্থাৎ চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় ক'টি স্থানের উল্লেখ। এক জায়গায় রয়েছে,

খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দণ্ডবত।
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত ॥

আর এক জায়গায় আছে,

পূর্ব্ব কূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা ॥

১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের পরে নিত্যানন্দ খড়দহে বসতি স্থাপন করলে খড়দহ ভক্তদের কাছে শ্রীপাট নামে পরিচিত হয়। আর 'কলিকাতা' জব চার্নকের আগমনের (১৬৯০ খ্রীঃ) পরে খ্যাতি অর্জন করে।*

এ' ছাড়াও নবম ও দশম পালায় চাঁদোর বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকীনাড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাপদানি, ইছাপুর, রিসিড়া (রিসড়া), সুখচর, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটি, দিগঙ্গা (দেগঙ্গা), ঘুসুড়ি, চিতপুর, বারুইপুর প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ' সব স্থানের অধিকাংশই ব্রিটিশ আমলে প্রাধান্য অর্জন করে; প্রাচীন সাহিত্যের অন্য কোথাও এই স্থানগুলির উল্লেখ দেখা যায় না।

* জব চার্নকের অন্তত একশো বছর আগে থাকতেই যে 'কলিকাতা' একটি বিশিষ্ট জনপদ (শহর না হলেও) ছিল, তার প্রমাণ আছে। এ' সম্বন্ধে আমরা এই বইয়ের পরিশিষ্টে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

নবম পালায় "নিমাই-তীর্থ" নামে একটি স্থানের উল্লেখ দেখা যায়, নিঃসন্দেহে চৈতন্য-দেবের "নিমাই" নামটিই এই তীর্থের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই সব কারণে এই মনসামঙ্গলের প্রাচীনত্বে সন্দেহ প্রকাশ করা অযৌক্তিক নয়।

সন্দেহের কারণ আরও আছে। এই কাব্যের চতুর্থ পালায় (হাসন-হোসেন পালা) হাসনের অন্তঃপুরের বর্ণনা দেবার সময়ে বলা হয়েছে গোলামেরা হাসনের সেবা করার সময়ে

কেহ আনন্দিত হৈয়া স্থবর্ণের হুকা লৈয়া
তমাকু ভরিয়া দেয় আগে।

কিন্তু "তমাকু" বা তামাক ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে প্রথম এনেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন কবির রচনায় এর উল্লেখ থাকা অসম্ভব। তামাক তখনও আমেরিকার বাইরে যায় নি।

তারপর, এই কাব্যের এক জায়গায় লেখা আছে (এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত সংস্করণ, পৃঃ ১৪৩) যে সপ্তগ্রামে

নিবসে যবন যত তাহা বা বলিব কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম।

"মোঙ্গল পাঠান" অর্থাৎ কিনা মোগল-পাঠান। কিন্তু মোঙ্গলরা মুসলমান নয়। আসলে যাঁদের 'মোগল' (শব্দটি 'মোঙ্গল' শব্দেরই বিকৃত রূপ) বলা হয় (বরাবর ভুল করেই বলা হয়ে এসেছে), তাঁরা আসলে তুর্কী জাতির চাগতাই শাখার লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে—"মোগল" সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বাবরের ভারতবর্ষে আসার কয়েক দশক আগে—সপ্তগ্রামে চাগতাই-তুর্কী মুসলমানরা বাস করতেন কিনা, অথবা করলেও তাঁদের "মোঙ্গল" বলা হত কিনা, অথবা তখন "মোঙ্গল-পাঠান" এই জাতীয় উক্তি লোকে করত কিনা? এই তিনটি প্রশ্নেরই সম্ভাব্য উত্তর—না। অতএব, "মোঙ্গল-পাঠান"-এর উল্লেখ থেকে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলকে অর্বাচীন রচনা বলে সন্দেহ করা যেতে পারে।

যা' হোক্, সন্দেহের কারণ খুব যুক্তিসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়, বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ১৪১৭ শকাব্দেই রচিত হয়েছিল। কারণ,

(১) রচনাকালসূচক শ্লোকটিতে "গৌড়ের প্রধান"—"হুসেন শাহা" অর্থাৎ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের উল্লেখ আছে। যদি ধরা যায় যে—বইটি ১৪১৭ শকাব্দে লেখা নয়, পরবর্তীকালে কোন লোক জাল করেছিল—তা' হলে প্রশ্ন উঠবে ঐ জালিয়াৎ কী করে জানতে পারল যে ১৪১৭ শকাব্দে হোসেন শাহ্ "গৌড়ের প্রধান" ছিলেন?

(২) বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে'র নবম পালার মধ্যে লেখা আছে যে, বাণিজ্যযাত্রার সময়ে উজানি, কাটোয়া, নদীয়া, ফুলিয়া, হাতিকান্দা, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করার পরে চাঁদো বললেন,

দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তঋষি স্থান সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
সোক্ষ মোক্ষ রম্যতর ধাম॥

এরপর কবি সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ সপ্তগ্রাম নগরীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন (অবশ্য এই বর্ণনার মধ্যেও কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করেছে)। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তগ্রাম বন্দরের অবনতি ঘটতে থাকায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগেই লেখা বলে মনে হয়—যে সময়ে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধ নগরী ছিল এবং লোকে গঙ্গার উপর দিয়ে যাবার সময় সপ্তগ্রাম ভাল করে না দেখে যেত না।

এর থেকে আমাদের মনে হয়, বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' মূলত ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দেই রচিত হয়েছিল, পরে তাতে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ যুক্ত হয়েছে। আমাদের ধারণার সমর্থনে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করছি। কাব্যের প্রথম পালায় বিপ্রদাস লিখেছেন,

সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত
বিস্তারে কহিব সপ্ত নিশি॥

কিন্তু বর্তমানে (এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য) কাব্যটিতে তেরটি পালা পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, কবি মূলে সাতটি পালায় কাব্যটিকে সম্পূর্ণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত উপাদান যুক্ত হয়ে কাব্যটি স্ফীতকায় হয়েছে এবং সাতটি পালাকে ভেঙে তেরটি পালায় দাঁড় করানো হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের প্রচার আদৌ ছিল বলে জানা যায় না—সুতরাং তাতে প্রক্ষেপ পড়বে বলে ভাবা চলে না। কিন্তু আমরা এই মত সমর্থন করতে পারি না। কারণ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের চারটি পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, বিপ্রদাসের বাসভূমির নিকটবর্তী দত্তপুকুর, জাগুলিয়া, ছোট জাগুলিয়া প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা এই পুঁথিগুলি নকল করেছিল এবং এই অঞ্চল থেকেই সব ক'টি পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের প্রচার না হলেও, তাঁর

নিজের দেশে তার যথেষ্টই প্রচার হয়েছিল। পুরুষানুক্রমে ঐ অঞ্চলের লোকেরা বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল গান করেছে এবং তাতে রাশি রাশি প্রক্ষিপ্ত উপাদান ঢুকিয়েছে।

বিপ্রদাস কাব্যের প্রথম পালায় যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন—তার থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতার নাম ছিল মুকুন্দ ; কবি সামবেদী ব্রাহ্মণ—কৌথুম শাখা। তাঁর বাৎস্য গোত্র, পঞ্চ প্রবর—পদবী 'পিপলায়' বা পিপিলাই। কবিরা চার ভাই। কবির গ্রামের নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুথির সাক্ষ্যে মিল নেই ; কোন কোন পুথিতে গ্রামের নাম পাওয়া যায় 'বাদুড্যা', আবার কোন কোন পুথিতে 'নাদুড্যা'। বারাসতের কাছে 'বাদুড়িয়া' নামে একটি বিখ্যাত ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে, আবার এই অঞ্চলে 'নাদুড়িয়া' নামে একটি ছোট গ্রামও আছে। এই দু'টি গ্রামেরই কোন একটিতে কবির নিবাস ছিল।

॥ তিন ॥

শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র

ষোড়শ শতাব্দীর আগে বাংলা সাহিত্যে যে ক'জন কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। এই কারণে—পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন অজ্ঞাত বঙ্গীয় কবিকে যদি কোন গবেষক হঠাৎ আবিষ্কার করেন, তা'হলে তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যায় না। এই অভিনন্দন লাভের অধিকারী হয়েছেন ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহোদয়। বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'পুঁথি-পরিচয়' তৃতীয় খণ্ডে (পৃঃ ৪৮-৭৫ এবং ভূমিকা, পৃঃ ৬-১০ দ্রঃ) তিনি এমন একজন আনকোরা নতুন কবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে 'গৌরীমঙ্গল' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এই কবি 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের বেশির ভাগ স্থানেই 'কবিচন্দ্র' ও 'কবিচন্দ্র মিশ্র' নামে ভনিতা দিয়েছেন। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন, "গৌরীমঙ্গলের ভনিতায় 'শ্রীকবি শঙ্কর', 'কবিচন্দ্র মিশ্র', 'কবিচন্দ্র', 'শঙ্করকিঙ্কর' এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে।' পঞ্চাননবাবুর মতে " 'শঙ্করকিঙ্কর' নাম নহে, উপাধি," কিন্তু তা' হলে ভনিতায় "শ্রীকবি শঙ্কর" কখনই লেখা হত না। অতএব এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের কারণ নেই যে, আলোচ্য কবির নাম 'শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র' এবং উপাধি 'কবিচন্দ্র'।

'গৌরীমঙ্গলে' কবির সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ আত্মকাহিনী পাওয়া যায়। এর থেকে জানা যায় যে, কবি গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সমসাময়িক। তাঁর নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর কাছে—গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত বালাণ্ডা গ্রামে (পঞ্চাননবাবু 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃঃ ২১৫ থেকে বালাণ্ডার প্রাচীন ঐতিহ্য সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত করেছেন)। বালাণ্ডার গুণিসমাজের অনুরোধে শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র 'গৌরীমঙ্গল' রচনা করেছিলেন। 'পুঁথি-পরিচয়', তৃতীয় খণ্ড (পৃঃ ৪৯) থেকে আমরা আত্মকাহিনীটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি (তৎসম শব্দের বানানগুলি শুদ্ধ করে দিয়েছি),

পৃথিবীর সার রাজ্যে পঞ্চগৌড় নাম।
নৃপতি হুষেন সাহা কলিযুগে রাম ॥
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপে তপন।
জার ভয়ে কম্পিত সকল নৃপগণ ॥

গৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম মহাপুণ্যস্থান।
ত্রিবেণীর তীরে সপ্তঋষির বিশ্রাম ॥
তথা সপ্ত মুনি তপ কৈল সুখে।
তে কারণে সপ্তগ্রাম বলে লোকমুখে ॥
সেই সপ্তগ্রাম মধ্যে বালাণ্ডা নামে পুরী।
পুবে জার যমুনা পশ্চিমে সুরেশ্বরী ॥
উত্তরেত চক্রতীর্থ নাম পুণ্যস্থান।
দেব চক্রপাণি তথা নিত্য অধিষ্ঠান ॥
দক্ষিণে পবিত্র জল নাম বিদ্যাধরী।
জার জল পরসিলে সকল পাপে তরি ॥
অনেক পণ্ডিত [ত] থা অনেক মহাজন।
কুলে শীলে তপের নিধান দ্বিজগণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত নৃপতি পূজিত।
ক্ষেত্রি বৈদ্য বৈসে অতি সুচারী বৈশ্য ॥
শূদ্রগণ বৈসে দ্বিজসেবাএ তৎপর।
নৃপতিগণ হিতকারী সুবুদ্ধিসাগর ॥
তথা গুণিজন সভে করিয়া সমাজ।
কবিচন্দ্র মিশ্র আনিঞা বলিলে কাজ ॥
গন্ধ মাল্য দিয়া তবে করিল সম্মান।
সভে মিলিআ বলিলেন পাচালি বিধান ॥
পাচালি প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙ্গল।
তোমার মহিমা যেন ভ্রমে মহীতল ॥
ভকতি করিয়া যেন সর্ব্বলোকে পূজে।
পুরাণবচন যেন সর্ব্বলোকে বুঝে ॥

এরপর কবি 'গৌরীমঙ্গল'-এর রচনাকাল জানিয়েছেন। সেটি পুথির বানানে এই,

নব সসি ষুর ইন্দ্র সক পরিমিত।
কবীচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত ॥

বানান শুদ্ধ করলে,

নব শশী স্বর ইন্দ্র শক পরিমিত।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত ॥

এর থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৪১৯ (নব=৯, শশী=১, সুরইন্দ্র=১৪)* শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দে 'গৌরীমঙ্গল' রচিত হয়। তৎকালীন রাজা হিসাবে হোসেন শাহের নাম উল্লেখ থেকে প্রমাণ হয় যে, এই কালনির্ণয় সঠিক।

রচনাকাল-বাচক শ্লোকে কবি তাঁর কাব্যকে বলেছেন "চণ্ডীর চরিত"। আর একটি ভনিতাতেও কবি বলেছেন,

চণ্ডীর চরিত্র কিছু কবিচন্দ্র ভনে।
ভকতি রহুক হরগৌরীর চরণে ॥

(পুঁথি-পরিচয়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮)

এর থেকে বোঝা যায় যে, এই কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'গৌরীমঙ্গল' হলেও এটি আসলে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। প্রত্যেক চণ্ডীমঙ্গলের সূচনাতেই হরগৌরীর কাহিনী থাকে, এতেও তা'ই আছে। তবে এই কাব্যের পুথির প্রথম ২১ পৃষ্ঠার পরে আর পাওয়া যায় নি। সুতরাং এর সূচনার অংশটুকু ভিন্ন আর কিছু আমরা পাই নি। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থাকতেই এদেশে "মঙ্গলচণ্ডীর গীত" অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল গাওয়া হত। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের আগের বছরে তাঁর দলের সঙ্কীর্তন শুনে জগাই-মাধাই "মঙ্গলচণ্ডীর গীত" গাওয়া হচ্ছে ভেবেছিল। কিন্তু এই সময়কার কোন চণ্ডীমঙ্গলের নিদর্শন এতদিন আমরা পাই নি। 'গৌরীমঙ্গল'-এর আবিষ্কার এই অভাব কতকটা পুরণ করল। এটি সে যুগের একমাত্র চণ্ডীমঙ্গল না হলেও অন্যতম চণ্ডীমঙ্গল যে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'পদ্যাবলী'-তে রূপ গোস্বামী জনৈক কবিচন্দ্রের লেখা কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক সঙ্কলন করেছেন। এই কবিচন্দ্র 'গৌরীমঙ্গল'-রচয়িতা কবিচন্দ্রের স ঙ্গ অভিন্ন হতে পারেন।

এখন, কবিচন্দ্র শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র এবং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহোদয়ের কয়েকটি অভিমতের বিচার করব। তাঁর প্রত্যেকটি মত পৃথকভাবে উল্লেখ করে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দিলাম।

(১) বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে "সন ১১৯৬ মঘি' তারিখযুক্ত কবিচন্দ্র মিশ্রের

*ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল "নব=৯, শশী=১, সুর=৪, ইন্দ্র=১" ধরে ১৪১৯ শকাব্দ পেয়েছেন। কিন্তু "সুর" শব্দের আঙ্কিক অর্থ ৪ হতে পারে না, "সুর" আদৌ আঙ্কিক শব্দই নয়। "ইন্দ্র" এবং তার সমস্ত সমার্থবাচক শব্দের সর্বজনবিদিত আঙ্কিক অর্থ ১৪। সুতরাং "সুরইন্দ্র" একটি অখণ্ড আঙ্কিক শব্দ; কবি ছন্দের অনুরোধে "ইন্দ্র" বা "সুরেন্দ্র" না লিখে "সুরইন্দ্র" লিখেছেন।

'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের একটি সম্পূর্ণ পুথি আছে। জনৈক পরমেশ্বর দাসের আদেশে এই কাব্য রচিত হয় বলে ঐ পুথিতে লেখা আছে,

একদিন সভামধ্যে বসি মহাশয়ে।
কবিচন্দ্র মিশ্র আনি বলিল বিনয়ে॥
পাঞ্চালি প্রবন্ধে রচ চণ্ডীর চরিত।

এই পুথিতে প্রায় সব ভনিতাতেই পরমেশ্বর দাসের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে এই পুথিটি শঙ্করকিঙ্কর মিশ্রের 'গৌরীমঙ্গল'-এরই আর একটি পুথি।

আমাদের বক্তব্য :—দুই কাব্যেরই নাম 'গৌরীমঙ্গল' এবং কবির নাম 'কবিচন্দ্র মিশ্র' হওয়া সত্ত্বেও এ দু'টি পৃথক দুই কবির লেখা দু'টি আলাদা কাব্য। তার প্রমাণ, শঙ্করকিঙ্কর মিশ্রের 'গৌরীমঙ্গল' রচিত হয়েছিল বালাণ্ডার গুণিসমাজের অনুরোধে এবং এই কাব্যের কোথাও পরমেশ্বর দাসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অপর 'গৌরীমঙ্গল'টি পরমেশ্বর দাসের আদেশে রচিত, এর প্রতি ভনিতাতেই তাঁর নাম মেলে। আসলে পরমেশ্বর দাসের আদেশে যিনি 'গৌরীমঙ্গল' লিখেছিলেন, তিনি দ্বিতীয় কবিচন্দ্র মিশ্র; শঙ্করকিঙ্কর মিশ্রের 'গৌরীমঙ্গল' তাঁর পড়া ছিল, তাই তিনি শঙ্কর-কিঙ্করের মতই 'কবিচন্দ্র মিশ্র' উপাধি নিয়েছিলেন এবং কতকটা তাঁর রচনাভঙ্গীর অনুকরণ করে ("কবিচন্দ্র মিশ্র আনি", "পাঞ্চালি প্রবন্ধে রচ চণ্ডীর চরিত" প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারের মধ্যে অনুকরণের প্রমাণ মেলে) কাব্য রচনার উপলক্ষ বর্ণনা করেছেন। এঁর কাব্যের পুথিতে "মঘি", সনের তারিখ থেকে মনে হয়, এঁর বাড়ি ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে। কিন্তু শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র পশ্চিম বঙ্গের লোক।

(২) পঞ্চাননবাবু মনে করেন, উপরে উল্লিখিত কবিচন্দ্র মিশ্রের আদেশদাতা পরমেশ্বর দাস বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা ও পরাগল খানের সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে অভিন্ন।

আমাদের বক্তব্য :—দুই "পরমেশ্বর দাস" যে পৃথক লোক, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। কারণ পরমেশ্বর দাস যে সভায় বসে কবিচন্দ্র মিশ্রকে 'গৌরীমঙ্গল' রচনা করতে বলেছিলেন, তা যদি পরাগল খান বা ছুটি খানের সভা হত, তা' হলে তাঁরাই হতেন কবিচন্দ্র মিশ্রের আসল পৃষ্ঠপোষক, সে ক্ষেত্রে কবিচন্দ্র কাব্যের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁদের নাম উল্লেখ করতেন; কিন্তু তা তিনি করেন নি। এর থেকে বোঝা যায়, ঐ সভা পরমেশ্বর দাসেরই সভা, তিনিই কবিচন্দ্র মিশ্রের পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি কোন

অভিজাত ভূস্বামী বা রাজপুরুষ; তিনি যদি মহাভারত-রচয়িতা পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে অভিন্ন হতেন, তাহলে তাঁর সুপরিচিত "কবীন্দ্র" উপাধিটির উল্লেখ নিশ্চয়ই কবিচন্দ্র মিশ্রের কাব্যে থাকত।

(৩) পঞ্চাননবাবুর "স্থির ধারণা"—শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র ওরফে কবিচন্দ্র মিশ্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অগ্রজ কবিচন্দ্র মিশ্রের সঙ্গে অভিন্ন।

আমাদের বক্তব্য :—তা কখনই সম্ভব নয়, কারণ শঙ্করকিঙ্কর মিশ্রের সময়ের সঙ্গে মুকুন্দরামের সময়ের ১০০ বছরের ব্যবধান। শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র ১৪৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দে গৌরীমঙ্গল লিখেছিলেন; আর মুকুন্দরাম বাংলায় মানসিংহের শাসনকালে (১৫৯৬-১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ) জীবিত ছিলেন।

॥ চার ॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী ও 'সঞ্জয়'

বাংলা ভাষায় লেখা মহাভারতের মধ্যে পরাগলী মহাভারত ও ছুটি-খানী মহাভারতই প্রাচীনতম। পরাগলী মহাভারত রচিত হয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সেনাপতি ও চট্টগ্রামের লস্কর (সামরিক শাসনকর্তা) পরাগল খানের আজ্ঞায়। এই মহাভারতে লেখকের ভনিতা পাওয়া যায় 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস', 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' এবং 'কবীন্দ্র' নামে। এতে আঠারোটি পর্বই পাওয়া যায়। এর রচনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত। এতে লেখক ব্যাস-রচিত মূল মহাভারতকে অনুসরণ করলেও বাংলা দেশের নিজস্ব মহাভারত-ঐতিহ্যের প্রভাবও এর মধ্যে দেখা যায়। এর অশ্বমেধপর্বে জৈমিনি-সংহিতার প্রভাব খুব বেশি। জৈমিনি সংহিতার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের কাহিনীই কেবলমাত্র বর্ণিত হয়েছে; এই অশ্বমেধ-কাহিনী ব্যাস-রচিত মহাভারতে বর্ণিত অশ্বমেধ-কাহিনীর তুলনায় বেশী চিত্তাকর্ষক বলে বাংলা মহাভারতের রচয়িতারা এর দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। ছুটি-খানী মহাভারতে কেবলমাত্র অশ্বমেধপর্বই আছে এবং তা 'জৈমিনি-সংহিতা' অবলম্বনে বিস্তারিত আকারে রচিত; ছুটি খানী মহাভারত রচিত হয়েছিল পরাগল খানের পুত্র লস্কর ছুটি খানের আজ্ঞায়।* এর মধ্যে বিশেষভাবে 'শ্রীকর নন্দী'র ভনিতা পাওয়া যায়।

অধিকাংশ গবেষকেরই ধারণা কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী পৃথক লোক। কিন্তু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ ও ২০২৫ নং পুথির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন (সা. পা. প., ১৩৩৪, পৃঃ ১৬১-২১২ দ্রঃ) যে এঁরা অভিন্ন ব্যক্তি। বসন্তবাবুর প্রবন্ধ থেকে তিনটি ভনিতা উদ্ধৃত করছি :—

(১) লস্কর ছুটিখান কর্ন্নসম যার দান মেদিনি মহিমা সমসর।
তাহান আদেস মাথে যুধিষ্ঠীর নরনাথে কবিন্দ্রে জে রচিল পয়ার॥

(২) একলক্ষ নব তিন শ্লোক হইল সার। কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার॥

... ...

পুস্তক কারণে নাম হৈল ধরাতল। লস্কর পরাগল গুণের সাগর॥
তাহান আদেসমাল্য মাথে আরোপীয়া। শ্রীকরনন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া॥

* 'ছুটিখানী মহাভারত'কে বাংলা মহাভারত না বলে বাংলা 'জৈমিনি-সংহিতা' বললেই বোধহয় যথার্থ বলা হয়

(৩) লস্কর যে পরাগল প্রণমিল বহুতর নাম কির্ত্তি বাড়ে দিনে দিনে ॥
শ্রীকর যে নন্দি কবি তাহার বচন ধরি রচিলেক পাঞ্চালি প্রকার।
কুরু পাণ্ডু সংগ্রাম যুদ্ধ ছিল অনুপাম দ্রোন হইল জম অবতার ॥

আমরা সকলেই জানি পরাগল খানের আজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং ছুটি খানের আজ্ঞায় শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেছিলেন। কিন্তু উদ্ধৃত ভনিতাগুলি থেকে পাওয়া যাচ্ছে পরাগল খানের আজ্ঞায় শ্রীকর নন্দী এবং ছুটি খানের আজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভনিতাটিতে একই জায়গায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী একই লোক।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়েরও আগে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই দুই কবিকে অভিন্ন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৪।৯।৫৮ তারিখের এক চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন, "বোধ হয় ১৯২২।২৩ সালে ঢাকার 'প্রতিভা' পত্রিকায় আমি দেখাইয়াছিলাম যে শ্রীকর নাম, নন্দী কৌলিক পদবী এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধি।"

ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র 'প্রতিভা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন, সেগুলি যে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বসন্তবাবু যে দু'টি পুথির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাদের সব ক'টি পর্বেই 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' ও 'শ্রীকর নন্দী'র ভণিতা যুগপৎ পাওয়া যায় বলে তিনি জানিয়েছেন।

'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে (১৯৫৮) আমি বসন্তবাবুর প্রমাণগুলিকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী এক ব্যক্তি ছিলেন বলেই সিদ্ধান্ত করেছিলাম (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ১২৫-১২৮)। কিন্তু সে সময় কতকগুলি বিষয় আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। তাই বর্তমানে এ সম্বন্ধে পুনর্বিচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করা বিশেষ দরকার।

প্রথমত, মাত্র দু'টি পুথির সাক্ষ্য কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর অভিন্নতা প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে কিনা? প্রাচীনকালে গায়েনদের দৌরাত্ম্যে প্রায়ই এক কবির কাব্যে অন্য কবির ভনিতা প্রবেশ করত এবং গায়েনরা খুশিমত ভনিতা পালটে দিত, তার ভূরি ভূরি নিদর্শন আমরা পাই। সুতরাং দু'টি (বা এই জাতীয় আরও দু'একটি) পুথিতে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর ভনিতা একাকার হয়ে

গিয়েছে বলেই দু'জনকে এক ব্যক্তি বলা যায় না। অধিকাংশ পরাগলী মহাভারতের পুথিতে কেবলমাত্র 'কবীন্দ্র'র ও ছুটি-খানী মহাভারতের পুথিতে কেবলমাত্র 'শ্রীকর নন্দী'র ভনিতাই পাওয়া যায়। সুতরাং দুই কবিকে পৃথক্ বলে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

দ্বিতীয়ত, 'শ্রীকর নন্দী'কে কবির নাম এবং 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর'কে উপাধি বলে গ্রহণ করাতেও মুশকিল আছে। 'কবীন্দ্র' কোন কবির উপাধি হতে পারে। কিন্তু 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' উপাধি হয় কী করে? আর, এই কবির শুধু 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' নয়, 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস' নামও কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে পরাগলী মহাভারত যিনি লিখেছিলেন, তাঁর উপাধি 'কবীন্দ্র'ই ছিল, 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' নয়। তার প্রমাণ—এই মহাভারতের বেশির ভাগ জায়গায়ই কবি 'কবীন্দ্র' নামে* ভনিতা দিয়েছেন; 'পরমেশ্বর'-এর উল্লেখ কচিৎ পাওয়া যায়, 'পরমেশ্বর দাস'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় আরও কম। প্রাচীনকালে কবিরা কোন উপাধি পেলে ভনিতায় সাধারণত সেই উপাধিরই উল্লেখ করতেন, নিজের নাম উল্লেখ করতেন না। মালাধর বসু তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' কাব্যে গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া 'গুণরাজ খান' উপাধিই প্রায় সর্বত্র ভনিতায় উল্লেখ করেছেন, মাত্র দু'এক জায়গায় 'মালাধর বসু' নামে ভনিতা দিয়েছেন। 'কবীন্দ্র' যদি আলোচ্য কবির উপাধি হয়, তাহলে 'পরমেশ্বর' নিশ্চয়ই তাঁর নাম এবং 'দাস' পদবী।

তৃতীয়ত, 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' যদি শ্রীকর নন্দীরই উপাধি হ'ত, তা'হলে সেই উপাধি পাওয়ার পরেও তিনি ছুটি-খানী মহাভারতে বারবার 'শ্রীকর নন্দী' নামে ভনিতা দিতেন না। গ্রন্থ রচনার উপলক্ষ তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা'ও লক্ষণীয়।

অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥

*পরবর্তী কালের লোকদের কাছে 'আলোচ্য কবি 'কবীন্দ্র' নামেই পরিচিত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সৈয়দ সুলতান তাঁর 'নবীবংশ' কাব্যে লিখেছেন,

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিলা বিচারি॥
হিন্দু মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে।

দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারোক কীর্ত্তি মোর জগৎ সংসার ॥
তাহার আদেশ-মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া ॥
(দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪)

এখানে কবির 'শ্রীকর নন্দী' নামই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা গ্রন্থরচনার উপলক্ষ বর্ণনা করার সময় 'কবীন্দ্র' বলেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন (দেওয়া খুব স্বাভাবিক, কারণ শুধু সে যুগের বাংলা দেশে নয়, এ যুগের ইংলণ্ডেও দেখা যায় যে কেউ উপাধি পেলে তার উপাধিটাই নামের স্থলাভিষিক্ত হয়)—

লস্কর পরাগল শুনন্ত কাহিনী।
যেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী ॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কেন-মতে ধর্ম্ম রইল বনের ভিতর ॥
বৎসরেক আছিলন্ত অজ্ঞাত বসতি।
কেন-মতে তারা সবে পাইল বসুমতী ॥
এহি সব কথা কহ সংক্ষিপ্ত করিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া *
তাঁহার আদেশ-মাল্য মস্তকে করিয়া।
কবীন্দ্র কহিল কথা পাঁচালী রচিয়া।

এর থেকেও বোঝা যায়—পরাগলী মহাভারত ও ছুটি-খানী মহাভারতের রচয়িতারা পৃথক লোক।

চতুর্থত, ছুটি-খানী মহাভারতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দু'টির সাক্ষ্য আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ,

* কোন কোন গবেষক কবীন্দ্র রচিত মহাভারতের আয়তনের সঙ্গে এই উক্তির অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এ' কথার তাৎপর্য এই নয় যে পরাগল খান কবীন্দ্রকে একদিনে পড়ার উপযোগী করে বাংলা মহাভারত রচনা করতে বলেছিলেন। আসলে পরাগল খান কবীন্দ্রকে বলেছিলেন, 'এমন মহাভারত রচনা কর, যা ভেঙে (সংক্ষিপ্ত আকারে) পাঁচালি করে এক দিনেই গোটা মহাভারত শোনা সম্ভব হয়।"

শ্রীচরণ বন্দিয়া অশ্বমেধ সমর্পিয়া।
শেষ কহি কবীন্দ্র কৃত সব বিরচিয়া॥
অশ্বমেধ শেষ আছিল যে কথন (পাঠ—কথন)।
কবীন্দ্র রচিত গাথা লিখিত কারণ॥*
(মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৯)

পাঠে গোলমাল থাকার দরুন শ্লোক দু'টির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়; কিন্তু এটুকু পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, ছুটি-খানী মহাভারতের রচয়িতা 'কবীন্দ্র'রচিত গাথার উল্লেখ করেছেন।

অতএব সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস' এবং ছুটি-খানী মহাভারতের রচয়িতা 'শ্রীকর নন্দী' ভিন্ন লোক।

এখন এই দুই মহাভারতের রচনাকাল নির্ধারণের চেষ্টা করব। পরাগলী মহাভারতের উপক্রম থেকে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহ্ তাঁর সেনাপতি পরাগল খানকে "লস্কর" (সামরিক শাসনকর্তা †) নিযুক্ত করে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। পরাগল খান চট্টগ্রামে অনেক দিন বাস করবার পরে কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারত রচনা করতে অনুরোধ করেন। সমস্ত মিলে ৭।৮ বছরের কম সময় লাগতে পারে না। হোসেন শাহ্ ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ১৫০০ খৃস্টাব্দ পরাগলী মহাভারতের রচনাকালের ঊর্ধ্বতন সীমা। হোসেন শাহের রাজত্বের অবসান হয় ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে; তার অল্প আগে ছুটি-খানী মহাভারতরচিত হয়েছিল (পরে

---

* এই ক'টি ছত্র যে শ্রীকর নন্দীর নিজের লেখা, তা এর ভাষার প্রাচীনত্ব থেকে বোঝা যায়। "কবীন্দ্র রচিত গাথা লিখিত কারণ"— এই রচনাটির ভাষা ষোড়শ শতকের দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ভাষার বৈশিষ্ট্য বহন করছে। ত্রিপুরার 'রাজমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডের (ষোড়শ শতকে লেখা) নিম্নোদ্ধৃত অংশে অনুরূপ ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়,

দ্বাদশ বাঙ্গলা দিল মল্লিকের সাতে।
বহুল কটক দিল নিজে ছিল জতে॥
বহু তর তরি বর গোমতি কারণ।
(বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, ২য় সং, পৃঃ ৩১৬)

†আরবী ভাষায় "লস্কর" শব্দের অর্থ সৈন্য হলেও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় শব্দটি 'সামরিক শাসনকর্তা' অর্থে ব্যবহৃত হত—তার প্রমাণ কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' ও ত্রিপুরার 'রাজমালা' (২য় খণ্ড) থেকে মেলে।

আলোচনা দ্রষ্টব্য)। পরাগলী মহাভারত তার কয়েক বছর আগেই রচিত হয়েছিল। সুতরাং ১৫০০ থেকে ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পরাগলী মহাভারত রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করতে পারি।

এখন ছুটি-খানী মহাভারত বা শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার সুলতানদের মধ্যে এই নিয়ম চালু হয়েছিল যে সুলতানের পুত্র যুবরাজপদে অভিষিক্ত হবার সময় থেকে রাজকীয় মর্যাদা লাভ করে পিতার সঙ্গে যৌথভাবে রাজত্ব করবেন এবং ঐ সময় থেকেই পিতার মত তাঁরও নামে মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উৎকীর্ণ হবে। সুলতানের মৃত্যুর পর যাতে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ না ঘটে সেই জন্যই সম্ভবত এই ব্যবস্থা হয়েছিল। এই নিয়ম অনুসারে হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ্ যুবরাজপদে অভিষিক্ত হয়ে মুদ্রা প্রভৃতি প্রকাশ করতে থাকেন। অন্তত ৯১৮ হিজরা বা ১৫১২-১৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে হোসেন শাহ্ ও নসরৎ শাহ্ যৌথভাবে রাজত্ব করতে থাকেন, কারণ ৯১৮ হিজরা থেকেই নসরৎ শাহের যৌবরাজ্য অবস্থার মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীকর নন্দীর মহাভারত এই যৌথ রাজত্বের সময় রচিত হয়েছিল, কারণ এই মহাভারতের সূচনায় লেখা আছে,

নসরৎ শাহ্ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন শাহ্ হএ ক্ষিতিপতি।
পঞ্চ (পাঠ—পঞ্চম) গৌড়েত যার পরম যে খ্যাতি॥*

*বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ নং পুথিতে উদ্ধৃত ছত্রগুলির এই পরিবর্তিত পাঠ পেয়েছিলেন,

নসরৎ সাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা॥
নৃপতি হুসন সাহা তনয় সুমতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কোন্ পাঠ ঠিক ? এই পাঠ—না "নসরৎ শাহ তাত" ইত্যাদি পাঠ ? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় "নসরৎ শাহ তাত" ইত্যাদি পাঠই ঠিক, কারণ ঐ পাঠ বহু পুথিতে মেলে। "নসরৎ শাহ্ নাম" ইত্যাদি পাঠ একটি মাত্র পুথিতে মেলে। কিন্তু আসলে দু'টি পাঠই ঠিক হতে পারে। আমাদের মনে হয়, হোসেন শাহের রাজত্বকালেই শ্রীকর নন্দী তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন, তখন "নসরৎ শাহ্ তাত" ইত্যাদি লিখে তিনি হোসেন শাহের প্রশস্তি রচনা করেছিলেন; হোসেন শাহের মৃত্যুর পর নসরৎ শাহ্ রাজা হলে তিনি প্রশস্তির ভাষার পরিবর্তন করে নসরৎ শাহের প্রশস্তিতে দাঁড় করান। ঠিক এই ভাবেই, জগন্নাথ পণ্ডিত তাঁর লেখা দারাশুকোর প্রশস্তিমূলক কাব্য 'জগদাভরণম্'-এর ভাবাকে দারার মৃত্যুর পরে পরিবর্তিত করে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের প্রশস্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন।

এর থেকে বোঝা যায় যে, এই মহাভারত রচনার সময় হোসেন শাহই জীবিত এবং বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু নসরৎ শাহও সে সময়ে 'শাহ' বলে অভিহিত হয়েছেন, অর্থাৎ তখন তিনি রাজকীয় মর্যাদা লাভ করেছেন। সুতরাং শ্রীকর নন্দীর মহাভারত ১৫১২ থেকে ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়।

পরাগলী মহাভারতের চেয়ে পুরোনো কোন বাংলা মহাভারতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেছিলেন এর আগে হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের আদেশে একজন অজ্ঞাতনামা কবি একটি বাংলা মহাভারত লিখেছিলেন। কারণ তিনি কবীন্দ্রের মহাভারতের একটি পুথিতে এই উক্তি পেয়েছিলেন,

শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত-খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥

কিন্তু যতদূর মনে হয়, উদ্ধৃত উক্তি শ্রীকর নন্দীর মহাভারত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। (কবীন্দ্রের মহাভারতে এটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে)। শ্রীকর নন্দীর পৃষ্ঠপোষক ছুটি খানের প্রকৃত নাম ছিল নসরৎ খান (বা সা. ই. ১।২, পৃঃ ২২৭ দ্রঃ)। সুতরাং উদ্ধৃত উক্তি থেকে কবীন্দ্রের পূর্ববর্তী মহাভারত-রচয়িতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

পূর্ববঙ্গে 'সঞ্জয়'-ভণিতাযুক্ত একটি বাংলা মহাভারত পাওয়া যায়। ৺দীনেশচন্দ্র সেন এই 'সঞ্জয়'কে কবীন্দ্রেরও পূর্ববর্তী কবি এবং, বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা মনে করেছিলেন। তাঁর একমাত্র যুক্তি এই, "যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন, একথা লিখিত হইয়াছে।...... 'অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর। পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জ্বল॥' প্রভৃতি কথা পাঠ করিলে মনে হয় মহাভারতরূপ মহাভাণ্ডার বহুকাল পর্যন্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট অনধিগম্য ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃঃ ১৪২)।

এই যুক্তির ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ 'লোক বুঝাইতে' অনুবাদ করার দোহাই বহু অর্বাচীন কবিও দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে সনাতন ঘোষাল তাঁর 'ভাষা-ভাগবতে' লিখেছেন,

ব্যাসের বচনে বোধ নহে সভাকারে।
এ হেতু করিতে চাই ভাষা অনুসারে॥

সুতরাং দীনেশবাবুর যুক্তি থেকে সঞ্জয়ের প্রাচীনতা প্রমাণ হয় না। দীনেশবাবু

সঞ্জয়কে কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরও আগে স্থাপন করেছেন। কিন্তু কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার আগে কোন বাংলা মহাভারত লেখা হয় নি। পরাগল খান সংস্কৃত মহাভারত শুনে পরিপূর্ণ রস উপলব্ধি করতে না পেরে কবীন্দ্রকে বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করতে আদেশ দেন * (বা. সা. ই., ১।২, পৃঃ ২২৬ দ্রঃ)। এই সময়ের আগে যদি সঞ্জয়ের মহাভারত রচিত হয়ে থাকত, তা'হলে পরাগল বাংলা মহাভারতের অভাব বোধ করতেন না। সঞ্জয়ের মহাভারত পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই সুপ্রচারিত দেখা যায়, সুতরাং কবীন্দ্রের মহাভারতের আগেই তা রচিত হয়ে থাকলে তা নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচার লাভ করত, তাহলে পরাগল খান সঞ্জয়ের মহাভারতই পড়তেন, কবীন্দ্রকে দিয়ে বাংলা মহাভারত লেখাবার প্রয়োজন বোধ করতেন না।

সঞ্জয়ের মহাভারত আসলে কবীন্দ্রের মহাভারতেরই সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ পরিবর্তিত সংস্করণ। 'সঞ্জয়' কোন কবির নামও নয়। হরিনারায়ণদেব নামে জনৈক ভরদ্বাজবংশীয় ব্রাহ্মণ মহাভারতের অন্যতম চরিত্র 'সঞ্জয়'-এর নামের আড়ালে নিজেকে গোপন করে এই পাঁচালী গান করতেন। একথা জানা যায় বিভিন্ন পুথির নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি থেকে,

হরিনারায়ণ দেব দিনহিন মতি। সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব্ব ভারতী॥

(বঙ্গীয় প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭২)

রচনা বিসেসত নানা রসময়। হরিনারায়ণ দেব বাখানে সঞ্জএ॥ (ঐ)

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। সঞ্জএ ভারতকথা কথিলেক মর্ম্ম॥

(সা. প. প., ১৩৩৫, পৃঃ ১৪১)

ভরদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে। সঞ্জএ ভারতকথা কহে কুতূহলে॥

(ঐ, পৃঃ ১৪২)

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার। সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঁচালি প্রচার॥

(ঐ, পৃঃ ১৪২)

"সঞ্জয়" বা হরিনারায়ণদেবকে সপ্তদশ শতাব্দীর আগেকার লোক ভাবার কোন কারণ নেই। "সঞ্জয়ের মহাভারতে"র ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার কোন পুথি পাওয়া যায় নি।

পরিশিষ্ট

ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড চতুর্থ সংস্করণে (পূর্বার্ধ, পৃঃ ২৫৪-২৫৬) এমন দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন, যা খণ্ডন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

(১) ডক্টর সেন লিখেছেন, "সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে চাটিগাঁয়ের কবি মোহাম্মদ খান তাঁহার 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষের মধ্যে এই তিন পুরুষেরও নাম আছে,—রাস্তি খান, তৎপুত্র মিনা খান, তৎপুত্র গাভুর খান। রাস্তি খানকে বলা হইয়াছে চাটিগ্রামের অধিপতি, মিনা খানের 'কীর্তি গৌরদেশ ভরি', আর গাভুর খান ত্রিপুরা-বিজেতা। এখানে গাভুর খান নিশ্চয়ই পরাগলের প্রিয়পুত্র যাহাকে পরমেশ্বর ও শ্রীকর 'ছুটি (অর্থাৎ ছোট) খান' বলিয়াছেন। তাহা হইলে পরাগলই মিনা খান।" এই উক্তি ঠিক নয়। আমার 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' বইয়ে (২য় সংস্করণ. পৃঃ ৪২৫-৪২৮) এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে পরাগল খান ও মিনা খান আলাদা লোক—তাঁরা রাস্তি খানের দু'জন পুত্র; দ্বিতীয়ত, মোহাম্মদ খান মিনা খান সম্পর্কে নয়, গাভুর খান সম্পর্কেই বলেছেন, "যার কীর্তি গৌড়দেশ ভরি"। তৃতীয়ত, মোহাম্মদ খান গাভুর খানকে "ত্রিপুরা-বিজেতা" বলেন নি, বলেছেন গাভুর খানের পুত্র হামজা খানকে।

(২) তারপর, ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "পরাগল (—তাঁহার পুত্র নহে—) শ্রীকর নন্দীকে দিয়া [অশ্বমেধপর্ব] লিখাইয়াছিলেন।" এরপর তিনি পাদটীকা দিয়ে লিখেছেন. "আগে আমিও মনে করিয়াছিলাম যে পরাগলের পুত্র 'ছুটি খান' এর আদেশে অশ্বমেধপর্ব রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আদেশদাতা বলিয়া কোথাও ছুটিখানের উল্লেখ নাই।"

এই মত খুবই বিস্ময়কর। কারণ শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের যে কোন পুথির বহু জায়গায় আদেশদাতা হিসাবে ছুটি খানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দু'টি পুথি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি.

(ক) খান পরাগল সুত দানে কল্পতরু।
পিতার দুর্লভ বড় গুরুভক্তি চারু॥
চিরজীবী হউক নৃপতি ছুটি খান।
বলি কর্ণ দধীচি সমান যার দান॥
তাহার আদেশ পাঞা পয়ার রচিল।
জয়মুনি (জৈমিনি) পুরাণ গ্রন্থ যেরূপ দেখিল॥

শ্রীকর নন্দী কহে বিচারিঞা পোথা।
পরম রহস্য ভারতের পুণ্যকথা ॥

(এসিয়াটিক সোসাইটির ৩৭১০ নং পুথি থেকে উদ্ধৃত)

(খ) খান পরাগল সুত রূপে গুণে অদভুত
মেদিনী মণ্ডল সমসর।
বন্ধুকুলবিকাশক অবিমল কমলক
পুত্র লভে যেন শশধর ॥
লস্কর ছুটি খান কর্ণসম যার দান
বলবন্ত ভীমসেন সম।
তাহার আদেশ লভি শ্রীকর নন্দী যে কবি
পোথাখণ্ড কৈল অনুপাম ॥

(এসিয়াটিক সোসাইটির গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহের ৪১২৪ নং পুথি থেকে উদ্ধৃত)

সুতরাং ডক্টর সুকুমার সেনের পূর্বোল্লিখিত মতের কোন ভিত্তিই নেই।

॥ পাঁচ ॥

ব্রজবুলি সাহিত্যের আদি কবি

ব্রজবুলি ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল এবং মৈথিল কবি 'বিদ্যাপতি'র সঙ্গে তার সম্পর্ক কতখানি, তা অনিশ্চিত। তবে এটা ঠিক, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ থেকেই পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ে আসামের শঙ্করদেব ব্রজবুলি ভাষায় বহু পদ লিখেছিলেন এবং উড়িষ্যার রায় রামানন্দ ব্রজবুলিতে বিখ্যাত 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' পদটি রচনা করেছিলেন। এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার দু'জন কবিকে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করতে দেখি।

পশ্চিমবঙ্গের কবির নাম যশরাজ (যশোরাজ) খান। রামগোপাল দাস তাঁর 'রসকল্পবল্লী'র দ্বাদশ কোরকে লিখেছেন,

যশরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী ॥

রামগোপাল দাস আরও লিখেছেন যে যশরাজ খান জাতিতে বৈদ্য এবং বৈদ্যখণ্ড অর্থাৎ শ্রীখণ্ড গ্রামের রাঘব সেনের বংশধর। (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী', পৃঃ ১৬৭ দ্রষ্টব্য।)

রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের লেখা 'রসমঞ্জরী'তে যশরাজ খানের একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে; পদটির প্রারম্ভ-ছত্র—"এক পয়োধর চন্দন-লেপিত আরে সহজই গোর"। এর ভনিতা এই,

শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর
ভনে যশরাজ খান।

এর থেকে জানা যায় যে, যশরাজ খান যে রাজার "সেবী" ছিলেন, তিনি হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)।

এই সময়ে রচিত ত্রিপুরার যে কবির ব্রজবুলিতে লেখা পদ পাওয়া গিয়াছে, তাঁর নাম জানা যায় নি, উপাধি "রাজপণ্ডিত"; তিনি ছিলেন হোসেন শাহের সমসাময়িক

ও শক্র রাজা ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের আশ্রিত। "রাজপণ্ডিত"-এর পদের ভনিতাংশ নীচে উদ্ধৃত করছি,

বৈরিহু কে এক দোষ মরসিঅ
রাজপণ্ডিত ভান।
বারি কমলা কমল রসিয়া
ধন্যমাণিক জান॥

(বা. সা. ই. ১।পূ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১০৭ থেকে উদ্ধৃত)

পদটি কিন্তু ত্রিপুরায় পাওয়া যায় নি, পাওয়া গিয়েছে নেপালে, মিথিলার কবি বিদ্যাপতির এক পদসংগ্রহের মধ্যে। সেখানে এ পদ কী করে গেল, তার উত্তর কেউই খুজে পান নি। সম্প্রতি ত্রিপুরার 'রাজমালা'র ধন্যমাণিক্য-খণ্ডে এর উত্তর পেয়েছি; সেখানে লেখা আছে যে ধন্যমাণিক্য ত্রিহুত অর্থাৎ মিথিলা থেকে ত্রিপুরায় নাচ-গানের লোক আনিয়েছিলেন,

ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি।
রাজ্যেতে শিখায় গীত-নৃত্য নৃপমণি॥

ত্রিহুতের গায়করা নিশ্চয়ই বিদ্যাপতি প্রভৃতি মৈথিল কবিদের লেখা গান গাইত। সেইসব গানের অনুকরণে ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত উপরে উল্লিখিত পদটি রচনা করেছিলেন ধরলে অন্যায় হবে না। ত্রিহুতের গায়করা তাঁর এই গানটিও কণ্ঠস্থ করে এবং দেশে ফিরে সেখানে চালু করে—এইভাবে পদটি ঐ দেশে যায়।

॥ ছয় ॥

শ্রীচৈতন্যদেব

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের স্থান অনন্য। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বঙ্গ-সংস্কৃতির অন্ধকার প্রাঙ্গণ দিবালোকে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নয়। সারা ভারতেই ঐ সময়ে ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এক নতুন জাগরণের পর্ব এসেছিল। উত্তর ভারতের বল্লভাচার্য ও কবীর, রাজপুতানার মীরাবাই, পঞ্জাবের নানক এবং আসামের শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সঙ্গে এক সময়েই আবির্ভূত হন। বাংলা দেশেও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ সময় বিরাট বিরাট প্রতিভার অভ্যুদয় হয়েছিল। ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনীষী রঘুনাথ শিরোমণি, স্মৃতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনীষী রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুতরাং বাংলায় ও সর্বভারতে ঐ সময় এক বিরাট জাগৃতি বা রেনেশাঁসের যুগ এসেছিল; চৈতন্যদেব সেই যুগেরই অন্যতম দান।

ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ দান বলে গণ্য করা হয়, সেগুলির ভিত্তি আগে থেকেই স্থাপিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। চৈতন্যদেবের ধর্মসম্প্রদায় মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যে কীর্তনকে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত করে তিনি বাঙালীর ধর্মরাজ্যে ও ভাবরাজ্যে বিপ্লব আনেন, তাও তাঁর আগে থাকতেই ছিল; চৈতন্যভাগবতে লেখা আছে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে নবদ্বীপে দোল-লীলা উপলক্ষে হরিসঙ্কীর্তন হচ্ছিল। যে শ্রীরাধার মহিমাকে তিনি উচ্চে তুলে ধরেন, তাঁর প্রাধান্যও জয়দেবের সময় থেকেই বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল যে বৈষ্ণব পদাবলী, তারও ভাব ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পূর্বযুগের প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুর বেশ মিল আছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন, তার ইন্ধন আগে থাকতেই সঞ্চিত হয়েছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব না এলে তা প্রচণ্ড শিখায় জ্বলত না।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেব যে আশ্চর্য যুগান্তর এনেছেন, তা বর্ণনা করা যায় না। তাঁর আগে রচিত বাংলা সাহিত্যের ক'টি নিদর্শনেরই বা সন্ধান মেলে! তারও মধ্যে আবার কয়েকটির মূল রূপ পাওয়া যায় না এবং বাকীগুলি খুব উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি নয়। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তীকালে শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য নয়, অন্যান্য সাহিত্যও কি বৈচিত্র্য, কি প্রাচুর্য, কি বৈশিষ্ট্য সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধির উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছেছিল। এর কারণ আমরা যা মনে করি, তা হচ্ছে এই। মুসলমানদের বাংলা দেশ

জয় করার ফলে ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম সংস্কৃতির আঘাতে বাঙালীর সংস্কৃতি টলমল করছিল। প্রাচীন সংস্কৃতি তখন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, অথচ নবযুগের নতুন পরিবেশের উপযোগী সংস্কৃতি তখনও গড়ে ওঠে নি। তাই ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর হাত দিয়ে কোন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাঙালী-সংস্কৃতি যখন প্রথম আত্মস্থ হতে সুরু করল, তখন আমরা কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু প্রভৃতিকে পেলাম। কিন্তু চৈতন্যদেব ও স্মার্ত রঘুনন্দনের আবির্ভাবের ফলে হিন্দু-সংস্কৃতির স্বস্থ হওয়া সম্পূর্ণ হল। স্মার্ত রঘুনন্দন বিধিনিষেধের সুদৃঢ় দুর্গ রচনা করে এবং চৈতন্যদেব উদার বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে দুই দিক্ থেকে হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধ করলেন। তার ফলে বাঙালীর হাতে এর পর থেকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টিও সম্ভব হল। চৈতন্যদেব যে ভাববন্যা বইয়ে দিলেন, তার প্রত্যক্ষ দান বৈষ্ণব পদাবলী।

একথা সত্য যে চৈতন্যদেবের প্রভাবে যেমন বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এসেছিল, তেমনি বল্লভাচার্য, কবীর, মীরাবাই, নানক ও শঙ্করদেব প্রভৃতি ধর্মাচার্যদের প্রভাব ঐ সময়ে তাঁদের ভাষার সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল। কিন্তু এঁরা নিজেরা সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, চৈতন্যদেব তা ছিলেন না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে চৈতন্যদেবের আশ্চর্য কৃতিত্ব আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আলো যেমন নিজে অদৃশ্য হয়েও জগতের সমস্ত পদার্থকে দৃশ্যমান্ করে তোলে, তেমনি চৈতন্যদেব নিজে সাহিত্যসৃষ্টি না করেও বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাঁর নাম বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার কল্পনাই কেউ করতে পারেন না। এই কারণে এই গ্রন্থে চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি।

চৈতন্য-জীবনীর কালক্রম

[নীচে চৈতন্য-জীবনীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির যতদূর সম্ভব সঠিক সময় পারম্পর্য অনুসারে উল্লেখ করা হল। এই কালানুক্রমিক ঘটনাসূচীর শেষে প্রমাণপঞ্জী দেওয়া হয়েছে। কোন ঘটনার আগে যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার সময়ের প্রমাণ দেখতে হলে প্রমাণপঞ্জীতে সেই সংখ্যক আলোচনা দেখতে হবে। অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের জন্মের সময়ের আলোচনার জন্য প্রমাণপঞ্জীতে (১) সংখ্যক আলোচনা দেখতে হবে।]

(১) ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী/১৪০৭ শকাব্দ, ২৩শে ফাল্গুন, দোলপূর্ণিমা তিথি, শনিবার, সন্ধ্যা প্রায় ৬টার মত সময়—জন্ম।

(২) ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, ৯ই মার্চ/১৪০৭ শকাব্দ, ১২ই চৈত্র—নামকরণ।

(৩) ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, ৮ই এপ্রিল/১৪১৬ শকাব্দ, অক্ষয়তৃতীয়া তিথি—উপনয়ন।

(৪) (আ:) ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ—পিতৃবিয়োগ।

(৫) ১৫০১-১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ—লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহ।

(৬) (আ:) ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ—অধ্যাপনা স্বরু।

(৭) (আ:) ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ—পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ ও লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু।

(৮) (আ:) ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ।

(৯) ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দ—গয়া যাত্রা।

(১০) ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দ, ডিসেম্বরের শেষ/১৪৩০ শকাব্দ, পৌষের শেষ—গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন।

(১১) ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ, জানুয়ারীর প্রথম/১৪৩০ শকাব্দ, মাঘের প্রথম—সঙ্কীর্তন ও ভাবপ্রকাশ আরম্ভ।

(১২) ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ, এপ্রিল/১৪৩১ শকাব্দ, বৈশাখ—অধ্যাপনা ত্যাগ।

(১৩) ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ, ডিসেম্বরের শেষ/১৪৩১ শকাব্দ, পৌষের শেষ—সঙ্কীর্তনাদির অবসান।

(১৪) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, ২৫শে জানুয়ারী/১৪৩১ শকাব্দ, ২৭শে মাঘ, শেষ রাত্রি—গৃহত্যাগ।

(১৫) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬শে জানুয়ারী/১৪৩১ শকাব্দ, ২৯শে মাঘ—সন্ন্যাসগ্রহণ।

(১৬) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে জানুয়ারী/১৪৩১ শকাব্দ, ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন—নিত্যানন্দের সঙ্গে রাঢ়দেশে ভ্রমণ।

(১৭) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, ৩০শে জানুয়ারী/১৪৩১ শকাব্দ, ৪ঠা ফাল্গুন—ফুলিয়ায় হরিদাসের গৃহে আগমন।

(১৮) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা ফেব্রুয়ারী/১৪৩১ শকাব্দ, ৬ই ফাল্গুন—শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে আগমন।

(১৯) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী/১৪৩১ শকাব্দ, ৯ই ফাল্গুন—শান্তিপুর ত্যাগ ও নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

(২০) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী/১৪৩১ শকাব্দ, ২৮শে ফাল্গুন—নীলাচলে দোলযাত্রা দর্শন।

(২১) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, মার্চ/১৪৩২ শকাব্দ, চৈত্র—বাসুদেব সার্বভৌমের উদ্ধার।

(২২) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, এপ্রিলের প্রথম/১৪৩২ শকাব্দ, বৈশাখের প্রথম—নীলাচল থেকে দক্ষিণভারত অভিমুখে যাত্রা।

(২৩) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, জুন/১৪৩২ শকাব্দ, আষাঢ়—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীতি।

(২৪) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ, শরৎকাল—শ্রীরঙ্গক্ষেত্র থেকে সেতুবন্ধের দিকে যাত্রা।

(২৫) ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ, শরৎকাল—গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের গৃহে আগমন।

(২৬) ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ, মে/১৪৩৪ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ—নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন ও আবার নীলাচল ত্যাগ করে আলালনাথ এবং সেখান থেকে গোদাবরী-তীরের দিকে যাত্রা।

(২৭) ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ, হেমন্তকাল—রায় রামানন্দের সঙ্গে গোদাবরী-তীর থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন।

(২৮) ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে সেপ্টেম্বর/১৪৩৬ শকাব্দ, বিজয়াদশমী তিথি—নীলাচল থেকে বাংলা অভিমুখে যাত্রা।

(২৯) ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ, জুন/১৪৩৭ শকাব্দ, আষাঢ়—বাংলা থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন।

(৩০) ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ, শরৎকাল—নীলাচল থেকে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা।

(৩১) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ, জানুয়ারীর প্রথম/১৪৩৭ শকাব্দ, মাঘের মাসের প্রথম—বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগে আগমন। প্রয়াগে দশদিন বাস।

(৩২) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ, জানুয়ারীর মাঝামাঝি—প্রয়াগ থেকে কাশী আগমন।

(৩৩) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারীর শেষ/১৪৩৭ শকাব্দ, ফাল্গুনের শেষ—কাশী থেকে বাংলার দিকে যাত্রা। নবদ্বীপে আগমন।

(৩৪) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫ই মার্চ/১৪৩৭ শকাব্দ, চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি—শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে ভোজন।

(৩৫) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ, মে/১৪৩৮ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ—নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ও জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন। অতঃপর আঠারো বছর নীলাচলে বাস।

(৩৬) (আঃ) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ—উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎকার।

(৩৭) ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দ—মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা আরম্ভ।

(৩৮) (আঃ) ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ—বিজয়নগর-নিবাসী চেনাপ্পা নামক ভক্তের কাছে দু'টি গ্রাম দান স্বরূপে গ্রহণ।

(৩৯) ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৯শে জুন/১৪৫৫ শকাব্দ, ৩১শে আষাঢ়—তিরোধান।

প্রমাণপঞ্জী

(১)—বিভিন্ন প্রাচীন ও প্রামাণ্য চরিতগ্রন্থগুলি চৈতন্যদেবের জন্মতিথি সম্বন্ধে একমত। তারই উপর নির্ভর করে জ্যোতিষ-গণনার সাহায্যে এই তারিখ স্থির করা হয়েছে। এসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। ব্রজমোহন দাসের 'চৈতন্য-তত্ত্বপ্রদীপে' তারিখটি স্পষ্টভাবেই দেওয়া আছে। এসম্বন্ধে ৮ই মার্চ, ১৯৫৫ তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকুণ্ডলী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (প্রবন্ধটি বর্তমানে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বলে এর প্রয়োজনীয় অংশ গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করলাম।)

(২)—"বিশ্বম্ভর নাম হইল বিংশতি দিবসে"—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নদীয়াখণ্ড, ৮ম অধ্যায়, ৫ম শ্লোক। ১৮ই ফেব্রুয়ারীর পর বিংশতি দিবস ৯ই মার্চ।

(৩)—লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' লেখা আছে, নয় বছর বয়সে মহাপ্রভুর উপনয়ন হয়েছিল—"নবম বরিখ পুত্র যোগ্য সুসময়"। চূড়ামণি দাস বলেন উপনয়নের তিথি 'অক্ষয়তৃতীয়া তিথি শ্রীবৈশাখ মাস'। এই দুই উল্লেখের উপর নির্ভর করে এই তারিখ গণনা করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের নবম জন্মতিথি ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমা। সুতরাং তাঁর জীবনের নবম বর্ষ ১৪১৫-১৬ শকাব্দ। ঐ বছরের অক্ষয়তৃতীয়া তিথি ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল পড়েছিল (Pillai, Indian Ephemeries, Vol. V, p. 190 দ্রষ্টব্য)।

(৪)—এই তারিখ আনুমানিক। বিভিন্ন চরিতগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের বাল্য বয়সে ও পঠদ্দশায় চৈতন্যদেবের পিতৃবিয়োগ ঘটেছিল।

(৫)—চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বিবাহের বর্ণনা আছে এবং ঐ অধ্যায়ের সুরুতে লেখা আছে "ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন"। চৈতন্যদেবের জীবনের ষোড়শ বৎসর ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দের দোলপূর্ণিমায় সুরু হয় এবং ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের দোলপূর্ণিমায় শেষ হয়। সুতরাং ১৫০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

(৬-৭)—এই তারিখগুলি আনুমানিক।

(৮-১৩)—এই সব ঘটনার সময়-নির্দেশ প্রধানত কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে এবং অংশত অন্যান্য প্রামাণিক সূত্রে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ('শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৬-১০ দ্রষ্টব্য)।

(১৪-১৫)—চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের তারিখটি প্রামাণিকভাবে জানা যায় তাঁর সহপাঠী ও পার্ষদ মুরারি গুপ্তের লেখা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'-এর তৃতীয় প্রক্রম, দ্বিতীয় সর্গ, দশম শ্লোক থেকে। শ্লোকটি এই,

ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতি মকরান্মনীষী।
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥

(তারপরে মাঘ মাসের শেষ দিনে শুভ সংক্রান্তিতে সূর্যের সংক্রমণের সময়ে বিধানবিৎ মহাত্মা শ্রীকেশব হরিকে সন্ন্যাসমন্ত্র দান করলেন।)

শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত নয়, কারণ লোচনদাস এই শ্লোকের অনুবাদ করেছেন তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে'; লোচনদাসের অনুবাদ এই,

মকর লেউটে কুম্ভ আইসে যেই বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥

১৪৩১ শকাব্দের মাঘ-সংক্রান্তি ছিল ২৯শে মাঘ তারিখে। ঐদিন ইংরেজী তারিখ ২৬শে জানুয়ারী, ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায় যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের ঠিক আগের দিন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তার আগের রাত্রিতে "দণ্ড চারি রাত্রি" বাকী থাকতে শয্যা থেকে উঠে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং তিনি নিঃসন্দেহে ২৭শে মাঘ শেষ রাত্রিতে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

মহাপ্রভু যে ২৭শে মাঘ গৃহত্যাগ করেছিলেন তার প্রমাণ মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের তৃতীয় প্রক্রম, প্রথম সর্গ, অষ্টম শ্লোক থেকে পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকে আছে যে গৃহত্যাগ থেকে সপ্তম দিবসে মহাপ্রভুর সহযাত্রী চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন নবদ্বীপে ফিরে এসে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এর পরে আলোচনা করে দেখাব যে চন্দ্রশেখর ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে নবদ্বীপে ফিরেছিলেন। ২৭শে মাঘ গৃহত্যাগের তারিখ ধরলে তার থেকে সপ্তম দিবস ৪ঠা ফাল্গুনই হয়।

এর আগে আমরা বলেছি, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের দিন অর্থাৎ ২৯শে মাঘ ইংরেজী তারিখ ছিল ২৬শে জানুয়ারী। সুতরাং ২৭শে মাঘ ২৪শে জানুয়ারী হয়। কিন্তু ২৭শে মাঘ রাত্রি বারোটার পর থেকে ২৫শে জানুয়ারী সুরু হয়েছিল (ইংরেজী তারিখ রাত্রি বারোটার পর থেকে এবং বাংলা তারিখ সূর্যোদয়ের সময় থেকে সুরু হয়)। অতএব ২৭শে মাঘের শেষ রাত্রি ২৫শে জানুয়ারীতেই পড়বে।

(১৬-১৯)—সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরবর্তী রাত্রি কাটোয়ায় কাটিয়ে (চৈ. ভা. ৩।১।৩৭০) মহাপ্রভু কয়েকদিন ভাবাবেশে বিভোর হয়ে রাঢ়ে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের কাল বৃন্দাবন দাসের মতে "দিন তিন চারি" (৩।১।৩৭৫), মুরারি গুপ্ত (৩।৩।১৮), কবিকর্ণপুর (মহাকাব্য, ১১।৬১), লোচন দাস (অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত 'চৈতন্যমঙ্গল', ২য় সং, পৃঃ ১৪৪) ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের (২।৩।৩) মতে তিন দিন। অধিকাংশের মত তিন দিন, বৃন্দাবনদাসের উক্তিও তার বিরোধী নয়। সুতরাং ১লা ২রা ও ৩রা ফাল্গুন মহাপ্রভু রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। অতঃপর মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে (নিঃসন্দেহে ফুলিয়ার অপর পারে) এক গ্রামে পৌঁছে নিত্যানন্দের সঙ্গে সে গ্রামে রাত্রি যাপন করেন। তার পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা ফাল্গুন সকালে তিনি ফুলিয়ায় হরিদাসের কাছে যান।* কিন্তু নিত্যানন্দকে তিনি বলেন যে তিনি অবিলম্বেই শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে যাবেন, নিত্যানন্দ যেন ভক্তদের শান্তিপুরে নিয়ে আসেন। নিত্যানন্দ তৎক্ষণি নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করেন এবং কতক হেঁটে, কতক সাঁতার দিয়ে নবদ্বীপে পৌঁছোন। 'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের প্রথম অধ্যায় থেকে এই সব কথা জানা যায়। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থে (তৃতীয় প্রক্রম, তৃতীয় সর্গ) লেখা আছে (আলোচ্য বিষয়ে মুরারি গুপ্তের অধিকাংশ উক্তির সমর্থন লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' পাওয়া যায়) যে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিন দিন কাট বার পর চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ৪ঠা ফাল্গুন তারিখেই চৈতন্যদেবের আর একজন সহযাত্রী—তাঁর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন—তাঁর আদেশ পেয়ে নবদ্বীপে ফিরে এসে ভক্তদের বললেন, "আপনারা আগামী পরশু অদ্বৈতের গৃহে মহাপ্রভুর দর্শন পাবেন।" এই উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে যে—চৈতন্যদেব ৬ই ফাল্গুন তারিখে ফুলিয়া থেকে শান্তিপুরে আসেন।

এদিকে নিত্যানন্দ ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে নবদ্বীপে পৌঁছে † সে রাত্রি চৈতন্যদেবের বাড়িতে কাটিয়ে পরের দিন শচী দেবীকে ও ভক্তদের নিয়ে শান্তিপুরে পৌঁছোন। পরের দিন চৈতন্যদেব ফুলিয়া থেকে শান্তিপুরে এসে পৌঁছোন ও সকলের সঙ্গে মিলিত হন।

কবিকর্ণপূর বলেন শচী দেবী শান্তিপুরে এসে পৌঁছোনোর পরে মহাপ্রভু তিন দিন

---

* এর থেকেই বোঝা যায় তার আগের রাত্রি চৈতন্যদেব ফুলিয়ার আড়পারের কোন গ্রামে কাটিয়েছিলেন।

† বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' লেখা আছে যে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌঁছে দেখেন শচী দেবীর "দ্বাদশ উপাস"—অর্থাৎ বারোটি উপবাস গিয়েছে। চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের দিন থেকে ৪ঠা ফাল্গুন অবধি গণনা করলে ছয় দিন হয়। সে যুগের বিধবারা এক দিনে মাত্র দু'বার ভোজন করতেন। সুতরাং "দ্বাদশ উপাস" মানে ছ' দিনের সম্পূর্ণ উপবাস এবং বৃন্দাবনদাস এক্ষেত্রে ঠিকই লিখেছেন।

শান্তিপুরে ছিলেন (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৮।৫)। এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (২।৩।১৩৩) লিখেছেন যে মহাপ্রভু শান্তিপুরে দশ দিন ছিলেন, এ কথায় একেবারে আস্থা স্থাপন করা যায় না। কারণ, যিনি সংসার ত্যাগ করে এসেছেন, তিনি আত্মীয়, বন্ধু ও ভক্তদের সঙ্গে এতদিন বাস না করে তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হবেন, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ৯ই ফাল্গুন তারিখে চৈতন্যদেব শান্তিপুর থেকে নীলাচলের দিকে রওনা হয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

(২০) এই বিষয়টির কথা লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন। লোচনদাস লিখেছেন,

জগন্নাথ দোলেতে দেখিব মনে করি।
সত্বরে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, "ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল" (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৭।৩-৪)। জ্যোতিষ-গণনা দ্বারা জানা যায় যে, ১৪৩১ শকাব্দের দোলযাত্রা ফাল্গুন মাসের শেষেই পড়েছিল—২৮শে ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৫১০ খ্রীঃ) তারিখে (Pillai, Indian Ephemeries, Vol. V, p. 222 দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এক্ষেত্রে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠিকই লিখেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্যদেব ৯ই ফাল্গুন তারিখে শান্তিপুর থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে থাকলে ২৮শে ফাল্গুন তারিখের আগেই নীলাচলে পৌছোনো তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। সে সময়ে সোজা পথে শান্তিপুর থেকে নীলাচলে যেতে তেরো চৌদ্দ দিনের মত সময় লাগত বলে মনে হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে রঘুনাথ দাস বারো দিনে সপ্তগ্রাম থেকে নীলাচলে গিয়েছিলেন, তাও আবার ঘুর পথে এবং তার মধ্যে প্রথম দিন ধরা পড়ার ভয়ে অন্যদিকে চলে সময় নষ্ট করেছিলেন। সুতরাং ৯ই ফাল্গুন তারিখে শান্তিপুর থেকে রওনা হয়ে মহাপ্রভু ২২শে বা ২৩শে ফাল্গুন নাগাদ নীলাচলে পৌছেছিলেন এবং ২৮শে ফাল্গুন তারিখে দোলযাত্রা দর্শন করেছিলেন।

চৈতন্যদেব তাঁর জননীর অনুরোধে অন্য তীর্থস্থানে বাস না করে নীলাচলে বাস করেন বলে চরিতগ্রন্থগুলিতে উক্ত হয়েছে। আমাদের মনে হয়, তাছাড়া নীলাচল হিন্দু-রাজার অধিকারভুক্ত ছিল বলে চৈতন্যদেব ধর্মচর্চার নিরাপদ স্থান হিসাবে নীলাচলকে পছন্দ করেছিলেন।

(২১-২২) প্রধানত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে এই দুই ঘটনার সময় জানা যায়। কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটকেও এই সময়নির্দেশের সমর্থন

মেলে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের লেখা 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ২য় সং, পৃঃ ১৪ দ্রষ্টব্য।

(২৩-২৭) এই ঘটনাগুলির কালক্রম কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' অবলম্বনে প্রস্তুত করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে মহাপ্রভুর কতদিন লেগেছিল, সে সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, "দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল" (২।১৬।৮৩)। কবিকর্ণপূর লিখেছেন. নীলাচল থেকে যাত্রা করে প্রভু চাতুর্মাস্যের আগেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌছোন, সেখানে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চাতুর্মাস্য যাপন করে শরৎকাল উপস্থিত হলে (১৩।৬) সেতুবন্ধের দিকে রওনা হন। তারপর আবার "জলদাগমান্তে", অর্থাৎ বর্ষার অবসানে (স্পষ্টত এক বছর পরে) সেখান থেকে ফিরে গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের আলয়ে এসে উপস্থিত হন। সেখানে রামানন্দের সঙ্গে আলোচনা করে অনেক দিন কাটিয়ে (১৩।৪৯) নীলাচলে যখন ফিরে আসেন, তখন জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সময় অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস। এখানেও সর্বশুদ্ধ দু'বছরের হিসাব পাওয়া গেল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। এরপর কবিকর্ণপূর বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারত থেকে নীলাচলে ফিরে শ্রীচৈতন্যদেব স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথ দর্শন করলেন, কিন্তু তারপর দিন তাঁর দেখা না পেয়ে দুঃখে "কৃতবাষ্পমোক্ষ" হয়ে আলালনাথে চলে গেলেন, সেখান থেকে তিনি গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের কাছে আবার গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রিয়কথায় চাতুর্মাস্য এবং আরও কয়েক মাস যাপন করলেন (নিনায় মাসাংশ্চতুরোঽপরাংশ্চ)। তারপর হেমন্তকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে একসঙ্গে তিনি নীলাচলে ফিরে এলেন (১৩।৬১)।

কবিকর্ণপূরের কথা মানলে বলতে হয় মহাপ্রভু ১৪৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণ-ভারত থেকে নীলাচলে ফিরে সেখানে মাত্র স্নানযাত্রার সময়টুকু থেকে আবার গোদাবরী-তীরে ফিরে যান এবং ১৪৩৪ শকের কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু একথা কবিকর্ণপূর ভিন্ন অন্য কোন চরিতকার বলেন নি, তাই এর সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার দরকার আছে। আসলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'তেই এর সমর্থন আছে। নীলাচলে যেবার প্রভু প্রথম রথযাত্রা দর্শন করলেন, সেবার গৌড় থেকে ভক্তেরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। কৃষ্ণদাস তার বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন,

প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ। প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রিগমন ॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস। প্রভু সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস ॥
বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সভারে। প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥

প্রভু আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া।
বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি। অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥

এর থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রথমবার রথযাত্রার সময় চৈতন্যদেবকে দেখার পরে ভক্তেরা বিশ বছর প্রভুকে দেখবার জন্য নীলাচলে আসা-যাওয়া করেছিলেন। অর্থাৎ রথের সময় ভক্তদের সঙ্গে প্রথমবার নীলাচলে মিলনের পর চৈতন্যদেব আরও বিশ বছর জীবিত ছিলেন।

এখন, ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকের রথযাত্রার সময় চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে ছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই। ১৪৩৪ শকেও তিনি রথযাত্রার সময় নীলাচলে ছিলেন না, একথা কবিকর্ণপূর বলেছেন। তা যদি হয়, তাহলে ১৪৩৫ শকে চৈতন্যদেব সর্বপ্রথম নীলাচলে রথযাত্রা দর্শন করেন এবং ভক্তেরাও সকলে তাঁকে দেখবার জন্য ঐ বছরেই প্রথম আসেন। এর পরে চৈতন্যদেব ঠিক বিশ বছরই বেঁচে ছিলেন, কারণ ১৪৫৫ শকে রথযাত্রার কয়েকদিন পরে তাঁর তিরোধান হয়। কবিকর্ণপূরের কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে বলতে হবে ১৪৩৪ শকে চৈতন্যদেব প্রথম নীলাচলে রথযাত্রা দর্শন করেন, কিন্তু তাহলে কৃষ্ণদাসের "বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি" উক্তি মিথ্যা হয়ে যায়। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, দক্ষিণ ভারত থেকে নীলাচলে ফিরে কয়েকদিন বাদেই প্রভু আবার গোদাবরী-তীরে রামানন্দের কাছে চলে যান এবং ৫।৬ মাস সেখানে থাকেন, কবিকর্ণপূরের এই কথা সত্য এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করলেও তাঁর সময়নির্দেশ এই কথাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছে। কবি-কর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যের অন্তত তিন জায়গায় (২০।৪০, ১৮।৬১, ১৮।৬৩) বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব বিশ বছর ধরে নীলাচলের সমস্ত উৎসব দর্শন ও তাতে যোগদান করেছেন। এখানে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৪৩৪ শকের হেমন্তকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী বিশ বছরের কথাই তিনি বলেছেন। কারণ এই বিশ বছরের আগে মহাপ্রভু নীলাচলের মাত্র দু'টি উৎসব—১৪৩১ শকের দোলযাত্রা ও ১৪৩৪ শকের স্নানযাত্রা দেখেছেন এবং এই বিশ বছরের মধ্যে মাত্র দু'একটি উৎসবের সময় তিনি নীলাচলে থাকেন নি।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র "বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি" উক্তি থেকে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মনে করেছেন, ভক্তেরা বিশবার রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে বারের কোন কথা বলা হয়নি, বিশ বছর ধরে যে এই যাওয়া-আসা চলেছিল, সেই কথাই

বলা হয়েছে। এই বিশ বছরের মধ্যে যে ভক্তেরা অন্তত দু'বার নীলাচলে যান নি, তা চরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৬শ অধ্যায়ের ২৪৫শ শ্লোক এবং অন্ত্যলীলার ২য় অধ্যায়ের ৩৬-৪৪শ শ্লোক থেকে জানা যায়।

(২৮) কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার পরে প্রভু বৃন্দাবন যেতে চাইলেন, কিন্তু ভক্তেরা নানা অছিলা করে তাঁকে দু'বছর আটকে রাখলেন। অবশেষে সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরের বিজয়াদশমীতে প্রভু গৌড় হয়ে বৃন্দাবনে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে নীলাচল থেকে রওনা হলেন (২।১৬।৯৩)। সেবারে অবশ্য প্রভু গৌড় পরিভ্রমণ করেই ফিরে আসতে বাধ্য হন।

কবিকর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যের উনবিংশ সর্গে এ সম্বন্ধে এইটুকু লিখেছেন,

দক্ষিণাদাগতো যাবত্তাবত্তত্র মহাপ্রভুঃ
মথুরায়াং চলত্যেব রামানন্দোঽত্র বাধতে ॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে নাথং কর্হিচিদ্গমনোদ্যতং।
উবাচ বহুদুঃখেন শ্রীরামানন্দরায়কঃ ॥ (৩-৪ শ্লোক)

এর থেকে জানা যায় দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার পর কোন এক চাতুর্মাস্যের পরে মহাপ্রভু মথুরার দিকে যাত্রা করেছিলেন। অবশ্য সেবার গৌড় অবধি গিয়েই প্রভু ফিরে আসেন। দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার কত পরে এই যাত্রা, তা কবিকর্ণপূর বলেন নি, কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর দুই ভ্রমণের বর্ণনার মাঝখানে ছ'টি সর্গ জুড়ে তাঁর পুরীতে বিভিন্ন উৎসব দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং দক্ষিণ ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন ও গৌড় অভিমুখে যাত্রার মাঝখানে যে প্রভু দীর্ঘ একটা সময় পুরীর বিভিন্ন উৎসব দেখে কাটিয়েছেন, কবিকর্ণপূর পরোক্ষে তাই বলেছেন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। সুতরাং কৃষ্ণদাসের উক্তির সঙ্গে তাঁর উক্তির কোন বিরোধ হচ্ছে না। মহাপ্রভু বিজয়াদশমীর দিনে যাত্রা করেছিলেন, এই কথা কবিকর্ণপূরও বলেছেন। কৃষ্ণদাস স্বরূপ দামোদরের কড়চা অবলম্বন করে মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্ত্যলীলা লিখেছেন; স্বরূপ দামোদর মধ্য ও অন্ত্যলীলার সময় প্রায় আগাগোড়া নীলাচলে ছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভুর জীবনের এই অধ্যায়ের কালক্রম সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের উক্তি নির্ভরযোগ্য। অতএব সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষের অর্থাৎ ১৪৩৬ শকের বিজয়াদশমীর দিনে প্রভু নীলাচল থেকে গৌড়ের দিকে যাত্রা করেছিলেন বলে স্থির করা যায়।

(২৯) নীলাচল থেকে প্রভু প্রথমে কুলিয়া গ্রামে আসেন, সেখানে কয়েকদিন থেকে প্রভু সেখান থেকে রামকেলি গ্রামে যান, কিন্তু তারপর আর তাঁর যাওয়া হয়নি। রামকেলি গ্রাম থেকে প্রভু শান্তিপুরে আসেন, সেখান থেকে কুমারহট্ট, পানিহাটি,

বরাহনগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে নীলাচলে ফিরে যান। ইতিমধ্যে আবার বর্ষা এসে গিয়েছিল। কারণ ভক্তেরা প্রভুকে বললেন,

এই যে আইলা প্রভু বর্ষা চারিমাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥ (চৈ. চ.)

সুতরাং মহাপ্রভুর গৌড় পরিভ্রমণে ৮।৯ মাসের মত সময় লেগেছিল এবং ১৪৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে তিনি পুরীতে ফিরেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

(৩০-৩২) এই ঘটনাগুলির কালক্রম 'চৈতন্যচরিতামৃত' অবলম্বনে রচিত। এর থেকে জানা যায় যে বাংলা থেকে ফেরার অব্যবহিত পরবর্তী শরৎকালে প্রভু নীলাচল থেকে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হন। সেখানে কিছুদিন বাস করে ও সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে প্রভু মাঘ মাসের প্রথম দিকে প্রয়াগের দিকে যাত্রা করেন (২।১৮।১৭৫)। প্রয়াগে তিনি দশ দিন ছিলেন এবং সেখানে মকরস্নান করেন। এই সময় তিনি শ্রীরূপকে শিক্ষা দেন। তারপর তিনি কাশীতে আসেন এবং সেখানে তিনি দু'মাস ধরে সনাতনকে শিক্ষা দেন।

(৩৩-৩৪) চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং লীলার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রম চতুর্দশ অধ্যায়ে লিখেছেন যে কাশী থেকে মহাপ্রভু নীলাচলের দিকে রওনা হন, নীলাচলে যাওয়ার পথে দেশে এসে সকলের সঙ্গে দেখা করে যান। কাশী থেকে মহাপ্রভু কুলিয়ায় আসেন, সেখান থেকে নবদ্বীপে এসে মার চরণ বন্দনা করেন এবং সমস্ত ভক্তের সঙ্গে দেখা করেন; তারপর অদ্বৈতের বাড়িতে যান। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে অদ্বৈত মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দকে ভোজন করান। মুরারি গুপ্তের এই কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই; এই অংশ প্রক্ষিপ্তও নয়, কারণ লোচনদাস এই অংশের অনুবাদ করেছেন। সমসাময়িক পদকর্তা বাসু ঘোষ গৌরাঙ্গের নদীয়ায় আগমন নিয়ে একটি পদ লিখেছেন। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীর আগেই মহাপ্রভু নবদ্বীপে এসেছিলেন। সুতরাং চৈত্র মাসের একেবারে প্রথমে তিনি কাশী থেকে রওনা হয়েছিলেন ধরা যেতে পারে। কৃষ্ণদাস মোটামুটি দু'মাস ধরে সনাতনকে শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন; তা যে পুরো দু'মাস হতে পারেনা, তা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

(৩৫) মুরারি গুপ্ত বাংলা থেকে মহাপ্রভুর নীলাচলে ফেরার কথা লেখবার (৪।১৫) পরেই গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে গমন (৪।১৭) ও জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শনের বর্ণনা (৪।২০) দিয়েছেন। সুতরাং ১৪৩৮ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের আগেই মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরেছিলেন বলা যেতে পারে।

প্রভুর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর্ব যে ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল, সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥

তিনি যে ঠিক ছ'বছর ভ্রমণেরই হিসাব দিয়েছেন, তা উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন, "কালের পরিমাপ-হিসাবে না ধরিয়া শক-হিসাবে ধরিলে কবিরাজ গোস্বামীর ছয় বৎসর গমনাগমন বলার একটা মানে বাহির করা যায়"। কিন্তু কৃষ্ণদাস ঠিকই হিসাব দিয়েছেন। ডঃ মজুমদার নিজেই হিসাবে ভুল করেছেন। তিনি ঠিক এর পরেই লিখেছেন "১৪৩৫ শকে সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে (চৈ. চ., ২।১৬।৮৫) বিজয়া দশমীর পর গৌড়ে যাত্রা (ঐ, ২।১৬।৯৩)।' মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের মাঘ-সংক্রান্তির দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষ ১৪৩৫ শকের মাঘ-সংক্রান্তি থেকে ১৪৩৬ শকের মাঘ-সংক্রান্তি। অতএব ঐ বর্ষের বিজয়াদশমী ১৪৩৬ শকে পড়বে, ১৪৩৫ শকে নয়।

কবিকর্ণপুর লিখেছেন,

চতুর্ব্বিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ
প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত-নবদ্বীপ-তলতঃ॥
ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যানগময়-
স্তথা দৃষ্ট্বা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ॥

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব চতুর্বিংশ বৎসরে নিজের প্রেমপ্রকটন করে বিবশ হয়ে নবদ্বীপ থেকেই সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ক্ষেত্র থেকে ইতস্তত গমনাগমনে তিন বছর যাপন করে সমস্ত যাত্রা (উৎসব) দর্শন করে অখিল বিংশতি বৎসর যাপন করেছিলেন।

ডঃ মজুমদার কবিকর্ণপুরের এই উক্তির সঙ্গে "কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির ঘোরতর বিরোধ" দেখেছেন এবং কষ্টকল্পনার মধ্য দিয়ে দুই উক্তির সামঞ্জস্য করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি যে, কবিকর্ণপুর ইতস্তত গমনাগমন বলতে দক্ষিণ ভারতের গমনাগমনের কথা বুঝিয়েছেন। কবিকর্ণপুর নিজেই বলেছেন যে মহাপ্রভু দু' বছর ধরে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন, তারপর অল্প সময়ের জন্য নীলাচলে ফিরে আসেন, তারপর আবার গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের কাছে গিয়ে কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। এই দু'বছর কয়েক মাস সময়কেই কবিকর্ণপুর তিন বছর ধরেছেন। তিনি এই ভ্রমণের বর্ণনা দেবার পরেই লিখেছেন,

ইত্থং শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিতবতি প্রত্যাসমালীদ্ধ্বনিঃ
সর্ব্বাসাং বিদিশাং দিশাঞ্চ জনতাসোৎকণ্ঠমেবাগতা।

(এইরূপে তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিত হলে প্রতিদিকে ধ্বনি অর্থাৎ শব্দ হওয়ায় সমস্ত দিখিদিকের লোক সকল অত্যুৎকণ্ঠায় সমাগত হল।)

এর পর মহাপ্রভু বিশ বছর ও কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। এই বিশ বছর সময়কেই কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানের কাল ধরে নিয়েছেন। মহাপ্রভুর গৌড় ও বৃন্দাবনে গমন যে এই বিশ বছরেরই অন্তর্গত, তা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন,

ইত্থং শ্রীপুরুষোত্তমে বিহরণং কৃত্বা শচীনন্দনো
হর্ষাদ্বিংশতিবৎসরেণ বিহিতক্রীড়ো বভৌ নির্ভরং।
এতন্মধ্যমধিপ্রয়াণকুতুকাদাগত্য ভাগীরথী-
তীরে শ্রীমথুরামলঙ্কৃতিমতিং কর্ত্তুং স বিক্রীড়তি॥ (১৮।৬৩)

গৌড় ও মথুরা-বৃন্দাবন পরিভ্রমণে বেশী সময় লাগে নি বলেই কবিকর্ণপূর এই ভ্রমণকে নীলাচলে অবস্থানের পর্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দুই ভ্রমণের পরবর্তী অংশকেই প্রভুর প্রকৃত নীলাচলে অবস্থানের পর্ব বলে ধরেছেন। সুতরাং কবিকর্ণপূরের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, হিসাবের পার্থক্য নয়।

(৩৬) চৈতন্যদেবের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের প্রথম মিলনের সময় নিয়ে চরিতকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। জয়ানন্দ ও উড়িয়া চরিতকার ঈশ্বরদাস বলেন, চৈতন্যদেব প্রথমবার নীলাচলে গিয়েই প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে দেখা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরবার পরে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারি গুপ্ত তাঁর গ্রন্থের ৪র্থ প্রক্রম ১৬শ সর্গে লিখেছেন, প্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণ করে নীলাচলে ফিরলে প্রতাপরুদ্র প্রথম তাঁর দর্শন পান। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত নয়, কারণ মুরারি গুপ্তের অনুসরণকারী লেখক লোচন দাসও তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখেছেন যে, বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফেরার পরে চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করেন (প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', ২য় সংস্করণ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৮৩-১৮৪)। সুতরাং এক্ষেত্রে মুরারি গুপ্তের সাক্ষ্যকেই সত্য বলে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য।

(৩৭) কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে

জানা যায় যে, মহাপ্রভুর জীবনের শেষ বারো বছরই ছিল তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থার কাল। ঐ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শ্লোক নীচে উদ্ধৃত করছি,

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥

সুতরাং মহাপ্রভুর তিরোভাবের (১৫৩৩ খ্রীঃ) বারো বছর আগে অর্থাৎ ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থা আরম্ভ হয়েছিল।

(৩৮) এই তথ্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত একখানি তাম্রশাসন থেকে আবিষ্কার করেছেন। তাম্রশাসনটির যে ইংরেজী অনুবাদ তিনি দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করছি, "When the Mahamandalesvara Virapratapa Vira Achyuta Deva Maharaja was ruling the kingdom of the world, Chennapa, son of Rayapa Vodeyar, the Mahaprabhu of Sigalnadu granted to our holy guru, Chaitanyadeva, the two villages of the Annigehalli sthala as a guttiage." অচ্যুতদেব ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ১৫৩০ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই দান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "মহাপ্রভু লীলা সম্বরণের তিন বৎসর পূর্বে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।" একথা আদৌ যুক্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে না। মহাপ্রভু এই দু'টি গ্রাম নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন নি, তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তদের আশ্রম, মঠ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের জন্যই নিশ্চয় গ্রাম দু'টি ব্যবহৃত হয়েছিল। কাজেই মহাপ্রভুর এই দান গ্রহণের ব্যাপারে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই, মহাপ্রভুর চরিত্র ও নীতির মহিমাও এর দ্বারা ক্ষুন্ন হয় না।

(৩৯) চৈতন্যদেবের মৃত্যুর তারিখটি কেবলমাত্র লোচনদাস ও জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। লোচনদাস লিখেছেন,

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

ফণিভূষণ দত্ত জ্যোতিষগণনা করে দেখিয়েছেন, আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি রবিবারে পড়েছিল। জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে শুক্লা সপ্তমী তিথিই বলেছেন,

আষাঢ় সপ্তমী শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥

ফণিভূষণ দত্তের জ্যোতিষগণনার ফলে দেখা গেছে ১৪৫৫ শকের শুক্লা আষাঢ় সপ্তমীর তারিখ ৩১শে আষাঢ়। ঐ দিনের ইংরেজী তারিখ ২৯শে জুন, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

॥ সাত ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দ

রাজা সর্বেশ্বর হলেও অমাত্যদের সাহায্য ছাড়া রাজ্য শাসন করতে পারেন না। তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকররা না থাকলে বঙ্গ-সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হত না। তাঁদের সাধনা ও প্রচার চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মকে অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব তাই সুদূরপ্রসারী হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে এই সমস্ত চৈতন্য-পরিকরদের সম্বন্ধে আলোচনা করা তাই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই, যাঁরা চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রূপায়ণ ও প্রচারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি।

অদ্বৈত

চৈতন্যদেবের প্রধান পরিকরদের মধ্যে গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং ও রূপ-সনাতন প্রভৃতি প্রথমে ছিলেন গৃহী, পরে হলেন সন্ন্যাসী। নিত্যানন্দ প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে গৃহী হন। অদ্বৈত চিরদিনই গৃহী থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনদিন সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ না করেও অদ্বৈতই সবচেয়ে বেশি দিন ধরে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের শিখা জ্বালিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব যেমন বৈষ্ণব ধর্মের আকাশে সূর্য, অদ্বৈত তেমনি শুকতারা। চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থাকতেই অদ্বৈত বৈষ্ণব ধর্মের পতাকা উড়িয়েছিলেন এবং প্রভুর তিরোধানের পরেও বহু বছর তিনি সেই পতাকা তুলে ধরেছিলেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের জন্মের আগেকার নবদ্বীপের বর্ণনা দেবার সময় লিখেছেন,

> অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য।
> এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়। ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥

অদ্বৈত শ্রীহট্ট জেলায় লাউড় গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। অদ্বৈতের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে প্রামাণিক চরিত-গ্রন্থগুলি থেকে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতির মধ্যে যেসব কথা পাওয়া যায়, তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ বিশেষজ্ঞরা এই সব বইকে জাল বলে প্রমাণ করেছেন।

অদ্বৈত শুধু সাধক ছিলেন না, কবিও ছিলেন। তাঁর লেখা অন্তত দু'টি পদ বা পদাংশের নিদর্শন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথমটি একটি চৈতন্য-বন্দনামূলক পদ। পদটি (বা তার অংশবিশেষ) 'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি এই,

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দীন-দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর॥

দ্বিতীয়টি একটি "তরজা প্রহেলি"। এই পদটি 'চৈতন্যচরিতামৃত', অন্ত্যলীলা, উনবিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি এই,

বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

এটি অদ্বৈত জগদানন্দের মারফৎ নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-এর মতে অদ্বৈত চৈতন্যদেবের জন্মের ৫২ বছর আগে অর্থাৎ ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন এবং ১২৫ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বলা বাহুল্য এই সব কথার কোন মূল্য নেই। আমরা প্রামাণিক সূত্রের সাহায্যে নতুনভাবে অদ্বৈতের জীবৎকাল স্থির করার চেষ্টা করব।

সন্ন্যাসের অব্যবহিত আগে অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন চৈতন্যদেব নবদ্বীপে লীলা করছিলেন, তখন তিনি একদিন অদ্বৈতকে জ্ঞানবাদ প্রচারের জন্য শাস্তি দিতে শান্তিপুরে আসেন। বৃন্দাবনদাসের মতে সেই সময় অদ্বৈতের পত্নী সীতা চৈতন্যদেবকে বলেছিলেন,

বুঢ়া বিপ্র বুঢ়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ। কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান॥
এত বুঢ়া বামনেরে কি আর করিবা। কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥

৫৫ বছরের কম বয়সী লোককে লোকে "এত বুঢ়া বামন" বলে না। সুতরাং ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈতের বয়স ৫৫।৫৬ বছরের কম ছিল না।

কিন্তু ৫৫।৫৬ বছরের বেশিও ছিল না। কারণ ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতের বয়স মাত্র পাঁচ বছর ছিল। ঐ বছরে চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বাংলায় এসে অদ্বৈতের বাড়ীতে যান। এই প্রসঙ্গের বর্ণনা দেবার সময় বৃন্দাবন দাস অচ্যুত সম্বন্ধে লিখেছেন,

পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর। খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥

এই উক্তির সঙ্গে অচ্যুত সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবতে'র অন্যান্য অংশের উক্তির সামঞ্জস্য আছে ; সুতরাং ১৫১৪—৫=১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে অচ্যুতের জন্ম হয়েছিল সন্দেহ নেই। অচ্যুত অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কারণ—'চৈতন্যচরিতামৃতে' ও অন্যত্র অদ্বৈতপুত্রদের নামের তালিকায় প্রথমেই অচ্যুতের নাম পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতের জন্মের সময় অদ্বৈতের বয়স ৫৫ বছরের বেশি হবার কথা নয়। সুতরাং অদ্বৈত ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। চৈতন্যদেবের জন্মের সময় অদ্বৈতের বয়স ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল বলে মনে হয়।

অদ্বৈত চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেও অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচনার সময়ও অদ্বৈত অতি বৃদ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন ('বৃন্দাবন দাস' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অদ্বৈতের তিরোধানের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাচ্ছি জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'। জয়ানন্দ লিখেছেন,

পৌষ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি হৈলা।
আচার্য্য গোসাঞি বৈকুণ্ঠবিজয় করিলা॥

'জয়ানন্দ' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা দেখাব যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকালের নিম্নতম সীমা ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং অদ্বৈত যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোটামুটিভাবে তাঁর জীবৎকাল ১৪৫৪-১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

হরিদাস

হরিদাস প্রথমে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে হরিভক্তির উদয় হওয়ায় তিনি বৈষ্ণব হন ; চৈতন্যদেব নবদ্বীপে সঙ্কীর্তন সুরু করলে তিনি চৈতন্যদেবের ভক্ত ও পার্ষদ হন। চৈতন্যদেব তীর্থভ্রমণ করে নীলাচলে ফেরবার (১৫১৬ খ্রীঃ) পরে হরিদাসকে নীলাচলে ডেকে পাঠান। হরিদাস নীলাচলে যান ও মৃত্যুকাল অবধি সেখানেই বাস করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়।

হরিদাস মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা, তা বলা যায় না। জয়ানন্দ লিখেছেন যে তাঁর পিতামাতা হিন্দু ছিলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে মনোহর ও উজ্জ্বলা ; অল্প বয়সে পিতামাতাকে হারাবার পরে হরিদাস মুসলমানের ঘরে লালিত-পালিত হন।

'চৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ড একাদশ অধ্যায় ও মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে হরিদাস চৈতন্যদেবের অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেন এবং চৈতন্যদেবের

জন্মের অব্যবহিত আগে হরিনাম করার "অপরাধে" তিনি মুসলিম রাজশক্তির হাতে নির্যাতিত হন।

হরিদাস ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে পরলোকগমন করেন ('জয়ানন্দ' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' লেখা আছে যে মৃত্যুর আগে হরিদাস এত বৃদ্ধ হয়েছিলেন যে প্রতিদিন হরিনাম-জপের সংখ্যা পূরণ করতে পারতেন না। 'চৈতন্যভাগবত'-এর আদিখণ্ড একাদশ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ বার হরিনাম জপ করতেন ("তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ")। তিরোধানের আগে অতি-বার্ধক্যের দরুণ আর তাঁর দিনে তিন লক্ষ বার হরিনাম জপ করার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং ঐ সময়ে তাঁর বয়স ৮০ বছরের উপর ছিল বলে মনে হয়। মোটামুটিভাবে, ১৪৫০ থেকে ১৫৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত হরিদাসের জীবৎকাল ধরা যায়।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর আদিখণ্ড ১১শ অধ্যায় ও জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এর নদীয়াখণ্ড ২৮শ অধ্যায়ের সাক্ষ্য মিলিয়ে নিলে জানা যায় যে, হরিদাসের বাসভূমি ছিল বর্তমান যশোহর জেলার বেনাপোলের কাছে অবস্থিত বুঢ়ন পরগণার ভাটকলাগাছি গ্রামে।

জনৈক হরিদাসের লেখা একটি শ্লোক রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত হয়েছে। এই হরিদাসই ঐ শ্লোকের রচয়িতা হতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রূপ গোস্বামীর সঙ্গে হরিদাসের বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল; রূপ পুরীতে গিয়ে হরিদাসের কাছেই থাকতেন।

হরিদাসের হরিভক্তি ও চরিত্রমাহাত্ম্যের জন্য সকলে তাঁকে "হরিদাস ঠাকুর" বলত। হরিদাসের "ঠাকুর" উপাধি সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন যা বলেছেন, তা একেবারে অমূলক। ডঃ সেন বলেছেন, "বাঙ্গালা দেশে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দে ইহা ('ঠাকুর') ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব মহান্তের গৌরব-সূচক পদবী অথবা বিশেষণরূপে মিলে। যেমন—নরহরিদাস ঠাকুর (বৈদ্য), ঠাকুর নরোত্তম (কায়স্থ), হরিদাস ঠাকুর (মুসল-মান)।" ডঃ সুকুমার সেন বোধ হয় খেয়াল করেন নি যে 'চৈতন্যভাগবতে' ব্রাহ্মণ নিমাই পণ্ডিতকে বহুবার "ঠাকুর" বলা হয়েছে; 'চৈতন্যভাগবত' আদিখণ্ড সপ্তম অধ্যায়ে মুরারি গুপ্ত নিমাইকে "প্রত্যুত্তর দিল কেনে বল ত ঠাকুর" এবং আদিখণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে গন্ধবণিক নিমাইকে বলল, "আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ ত ঠাকুর"। এ ছাড়াও সে যুগের আরও অনেক ব্রাহ্মণকে নানা জায়গায় "ঠাকুর" বলা হয়েছে।

নিত্যানন্দ

চৈতন্যসম্প্রদায়ে চৈতন্যদেবের পরেই নিত্যানন্দের স্থান। নিত্যানন্দের মহিমা ও প্রভাব অলোকসামান্য। কিন্তু নিত্যানন্দের জীবন সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্যই আমাদের অজানা। তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে তাঁর শিষ্য বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত হলেও সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু নিত্যানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট হয় নি। সেগুলি এই :—

(ক) চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে নিত্যানন্দ তাঁর সঙ্গে নীলাচলে যান। কিন্তু কয়েক বছর বাদেই আবার বাংলা দেশে ফিরে আসেন কেন? চরিতগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে শ্রীচৈতন্যদেবই তাঁকে ধর্ম-প্রচারের জন্য বাংলা দেশে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন এমন আকস্মিক যে আমাদের মন চরিতগ্রন্থগুলির কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে না।

(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে প্রামাণিকভাবে জানা যায় যে, নিত্যানন্দ দু'বার বিবাহ করেছিলেন,

> সূর্য্যদাস-নন্দিনী শ্রীবসু জাহ্নবী।
> পাণিগ্রহণ করিল স্বচ্ছন্দ কৌতুকী॥

'ভক্তিরত্নাকরে'ও এই কথা আছে। পরিণত বয়সে নিত্যানন্দের সন্ন্যাসধর্ম পরিত্যাগ* ও কৌমার্যভঙ্গের কারণ কি? কারও কারও মতে শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞাতেই নিত্যানন্দ বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু এই কথার যাথার্থ্যে আমাদের প্রবল সংশয় আছে।

(গ) বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' (অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়) এবং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' (এশিঃ সোসাঃ সং, পৃঃ ২২৪) থেকে জানা যায় যে নিত্যানন্দ নীলাচল থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের পরে সর্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নালঙ্কার পরতেন। বৈষ্ণবদের অনাড়ম্বর নিষ্কিঞ্চন জীবনযাত্রার সঙ্গে এ ব্যাপার একদম খাপ খায় না। নিত্যানন্দের এই রুচি-পরিবর্তনের কারণ কি?

(ঘ) বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের স্ত্রী বসুধা ও জাহ্নবী, পুত্র বীরভদ্র ও রামভদ্র, কন্যা গঙ্গার কোন উল্লেখ করেন নি কেন? তৎকালীন জনসাধারণ নিত্যানন্দের বিবাহ

* আধুনিক কালে কেউ কেউ মনে করেছেন যে নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেও নিজে সন্ন্যাসী হন নি। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দকে স্পষ্ট ভাষায় "তৈর্থিক সন্ন্যাসী" বলেছেন।

সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না বলেই কি? বৃন্দাবন দাসের অনুগামী লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজও নিত্যানন্দের বিবাহ-প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ করেন নি।

(ঙ) বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচনার সময় বাংলা দেশে নিত্যানন্দের প্রবল বিরোধী একদল লোক ছিল (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' দ্রষ্টব্য)। এঁদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা করতেন,

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পালায়॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাইও চৈতন্যদেবকে ভক্তি করতেন, নিত্যানন্দকে করতেন না। নিত্যানন্দের এই প্রবল বিরোধী দল ছিল বলেই 'চৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবনদাসকে বারবার নিত্যানন্দের মহিমাকীর্তন করতে হয়েছে। চৈতন্যদেবের প্রিয়তম সহচর বলে পরিচিত নিত্যানন্দের এরকম বিরোধী দল সৃষ্ট হবার কারণ কী? নিত্যানন্দের নীলাচল থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন, অলঙ্কারধারণ, বিবাহ, পুত্রকন্যার জন্ম—প্রভৃতির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই ত? চরিতগ্রন্থগুলি থেকে এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি বিশিষ্ট চরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে অধিকাংশই নিত্যানন্দের দলের লোকের লেখা। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য; জয়ানন্দ নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের প্রসাদপ্রাপ্ত; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বপ্নে নিত্যানন্দের কৃপা পেয়েছিলেন; প্রেমবিলাস-রচয়িতার নামই নিত্যানন্দদাস, তাছাড়া তিনি নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য। নিত্যানন্দের প্রতিকূলে যেতে পারে, এমন বিষয়গুলিকে এঁরা ইচ্ছা করেই তাঁদের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নি বলে মনে করা যায়।

নিত্যানন্দের নাম, ধাম ও বংশপরিচয় সম্বন্ধে যা জানতে পারা যায় তা এই। নিত্যানন্দের বাড়ী ছিল রাঢ়ের বীরভুম জেলার অন্তর্গত একচাকা গ্রামে*। এঁর পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা', দৈবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা' ও চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' থেকে জানা যায়, হাড়াই পণ্ডিতের প্রকৃত নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। মুকুন্দ বা হাড়াই পণ্ডিতের নিত্যানন্দ ছাড়াও আরও ছেলে ছিল, কারণ বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, "সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়'

* জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখেছেন যে নিত্যানন্দের বাড়ি ছিল "একচাকা খলকপুরে"। 'একচাকা' গ্রামের পাশে অবস্থিত 'বীরচন্দ্রপুর' নামক প্রসিদ্ধ গ্রামটিই প্রাচীন কালে 'খলকপুর' নামে পরিচিত ছিল বলে মনে হয়। পরে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের নামে তার নতুন নামকরণ হয়েছে।

(মধ্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়)। 'ভক্তিরত্নাকরে'র একাদশ তরঙ্গেও নিত্যানন্দের ছোট ভাইয়ের উল্লেখ আছে। লোচনদাস লিখেছেন, নিত্যানন্দের পূর্ব নাম 'কুবের'। এ কথা সত্য বলে মনে হয়। বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দ নিত্যানন্দকে কয়েক জায়গায় 'অনন্ত' বলেছেন! সেখানে তাঁরা নিত্যানন্দকে 'অনন্ত' তত্ত্বরূপে উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখা আছে যে, নিত্যানন্দ বার বছর বয়সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন।

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর॥

এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে, ১২ বছর বয়সে নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করে তীর্থ-পর্যটনে বেরোন এবং তারও ২০ বছর বাদে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। তখন চৈতন্যদেব গয়া থেকে ফিরে নবদ্বীপে লীলা-কীর্তন সুরু করেছেন। কিন্তু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র নদীয়াখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে (এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত Jayānanda's Caitanya-maṅgala, পৃঃ ১৩ দ্রষ্টব্য) লেখা রয়েছে যে নিত্যানন্দ

অষ্টাদশ বৎসরে* ছাড়িল গৃহবাস॥

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের উক্তিকেই অভ্রান্ত বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি লেখেন, "Vṛndāvanadāsa (Ādi Kh., VIII) tells at one place that Nityānanda was twelve years of age when he went out on pilgrimage ; but at another place (Madhya Kh., III) he relates that the Sannyāsin with whom he went, begged his father to allow the son to accompany him as there was no good Brāhmaṇa with him. This implies that the Sannyāsin was in search of a person who would be able to cook his food and perform the priestly duty. Jayānanda says that Nityānanda was eighteen years old when he left his home (Nadīyā Kh., IV. 5). A young man of eighteen would be more suitable for the purposes of the Sannyāsin than a boy of twelve."

* বাংলা রীতি অনুযায়ী সতেরো বছর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই "অষ্টাদশ বৎসর" বয়স সুরু হয়।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার জয়ানন্দের উক্তিকেই এক্ষেত্রে সঠিক বলে মনে করেছেন। তাঁর ধারণার সমর্থক প্রমাণ আমরা সম্প্রতি পেয়েছি। সেই সঙ্গে নিত্যানন্দের জন্মের সঠিক তারিখটিও আমরা জানতে পেরেছি, যা জানা ইতিপূর্বে অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হয় নি।

নিত্যানন্দ মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' আদিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, "নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।" আরও বহু চরিতগ্রন্থে নিত্যানন্দেব এই জন্মতিথির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রজমোহন দাস নামে একজন কবির লেখা 'চৈতন্য-তত্ত্বপ্রদীপ' নামে একটি অপ্রকাশিত চৈতন্যচরিতগ্রন্থের পুঁথি (পুথি নং ১৬৭৩) আছে। বর্তমান গ্রন্থের 'ব্রজমোহন দাস' সংক্রান্ত অধ্যায়ে ঐ গ্রন্থটির বিশদ পরিচয় দিয়েছি। 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ'-এর এক জায়গায় (পুথির ৪৫ ক পৃষ্ঠা) নিত্যানন্দের জন্মতিথিটি বার-সমেত উল্লিখিত হয়েছে (যা আর কোথাও হয় নি) এইভাবে,

নিত্যানন্দ একচাকা খলতপুরতে।
হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে প্রসিদ্ধ জগতে॥
জনম লভিল পদ্মাবতির উদরে।
মাঘে শুক্ল ত্রয়োদশি ভূমিসুতবারে॥

স্বামী কান্নু পিল্লাইয়ের Indian Ephemeries (Vol. V, p. 148) থেকে দেখছি, ১৩৯৪ শকাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি "ভূমিসুতবার" অর্থাৎ মঙ্গলবারে পড়েছিল। ঐ দিন তারিখ ছিল ১২ই জানুয়ারী, ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ তারিখে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করে থাকলে তাঁর জীবনের অষ্টাদশ বর্ষ সুরু হয় ১৪১১ শকাব্দের মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। যদি তিনি অষ্টাদশ বর্ষে গৃহত্যাগ করে থাকেন, এবং "বিংশতি বৎসর" তীর্থ পর্যটন করে চৈতন্যদেবের লীলা-কীর্তনের বছরে নবদ্বীপে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন, তা' হলে তিনি ১৪১১+২০=১৪৩১ শকাব্দে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ১৪৩১ শকাব্দেই (=১৫০৯-১০ খ্রীঃ) চৈতন্যদেব নবদ্বীপে লীলা-কীর্তন করছিলেন।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, নিত্যানন্দের গৃহত্যাগের বয়স সম্বন্ধে জয়ানন্দের উক্তিই সঠিক এবং নিত্যানন্দ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিত্যানন্দ বারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে থাকলে তাঁর জন্ম হয় ১৫০০ শকাব্দের মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে; কিন্তু ঐ বছরে ঐ তিথি মঙ্গলবারে পড়ে নি।

'বৃন্দাবন দাস' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' নিত্যানন্দের তিরোধানের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাসমাপ্তিকালের অধস্তন সীমা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব নিত্যানন্দের তিরোধানের অধস্তন সীমা ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরতে পারি।

নবদ্বীপ ছেড়ে মহাপ্রভু যখন নীলাচলে যান, তখন নিত্যানন্দ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তারপর কোন এক সময়ে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠিয়ে দেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে আসবার পরে রথযাত্রা উপলক্ষে যখন ভক্তেরা নীলাচলে আসেন, তখনই মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর কথা বিশ্বাস করা চলে না। কারণ দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার পরে মহাপ্রভু গৌড়ে যান। গৌড় থেকে নীলাচলে ফেরার পরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠান, একথা বৃন্দাবন দাস বলেছেন (২।১৫)। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য এবং নিত্যানন্দের কাছেই তথ্য সংগ্রহ করে 'চৈতন্যভাগবত' লিখেছেন। কাজেই তাঁর উক্তি কৃষ্ণদাসের চেয়ে প্রামাণিক। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণের বর্ণনা দেন নি, কাজেই নিত্যানন্দের গৌড়ে প্রত্যাবর্তন মহাপ্রভুর বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফেরার পরে ঘটেছিল কি না, তা বৃন্দাবন দাসের লেখা থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত লিখেছেন যে, বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফেরার পরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে ফেরৎ পাঠান (৪।২২)। সুতরাং ১৪৩৭ শক বা ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের অল্প পরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গদাধর পণ্ডিত

নবদ্বীপবাসী মাধব মিশ্রের পুত্র গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের প্রায় আজীবনের বন্ধু। বয়সে তিনি অবশ্য চৈতন্যদেবের চেয়ে কিছু ছোট। জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গলে'র (এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ) নদীয়াখণ্ডের ২৯শ অধ্যায়ে লেখা আছে যে চৈতন্যদেব যখন বালক অথচ উপনয়নপ্রাপ্ত তখন একদিন শচীদেবী শিশু গদাধরকে কোলে করে ঘরে এনেছিলেন। চৈতন্যদেব তখন শচীদেবীকে বলেছিলেন,

(গদাধরের) রক্ষণ পোষণ প্রতিপালন করিহ।
দিন কথো আন্তরে ইহার যজ্ঞসূত্র দিহ॥

জয়ানন্দ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং গদাধর পণ্ডিতের সম্বন্ধে তাঁর এই বিবরণ নির্ভরযোগ্য। উদ্ধৃত শ্লোকটি থেকে বোঝা যায়, চৈতন্যদেবের যখন উপনয়ন

হয়ে গিয়েছে, তখনও গদাধরের উপনয়নের বয়স হয় নি। সুতরাং গদাধর চৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে ৫।৬ বছরের ছোট ছিলেন বলে মনে হয়।

চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে নীলাচলে ফিরলে গদাধর চৈতন্যদেবের কাছে যান এবং বাকী জীবন তিনি নীলাচলেই অতিবাহিত করেন। টোটা-গোপীনাথের মন্দিরে তিনি থাকতেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেও তিনি বহু বছর জীবিত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের 'গুণলেশসূচক' থেকে জানা যায় যে, শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবন যাত্রার কিছুদিন আগে পর্যন্ত গদাধর পণ্ডিত জরাগ্রস্ত অবস্থায় জীবিত ছিলেন—"তত্রস্থং জরতং গদাধরযুতং শ্রীপণ্ডিতং দৃষ্টবান্"। তখন তিনি দৃষ্টিহীন, স্মৃতিহীন ও দুর্বলমতি। এর কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মোটামুটিভাবে গদাধর পণ্ডিতের জীবৎকাল ১৪৯২-১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ ধরতে পারি।

নরহরি সরকার

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য লোচনদাস ভিন্ন অন্য চরিতকাররা তাঁকে এক রকম উপেক্ষা করেছেন। তার কারণ, তিনি অন্য সমস্ত ভক্তদের সাধনপ্রণালী গ্রহণ না করে 'গৌরনাগরবাদে'র প্রবর্তন করেন।

নরহরি একজন উচ্চশ্রেণীর পদকর্তাও ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর পদগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর নরহরি চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। ভক্তিরত্নাকরে স্বয়ং নরহরি চক্রবর্তী একটি পদ ("গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে") "শ্রীনরহরি সরকার ঠকুরস্য গীতমিদম্" বলে উদ্ধৃত করেছেন। সেটি এবং রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' ও দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃতে' উদ্ধৃত 'নরহরি' ভনিতার পদগুলি নরহরি সরকারের লেখা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ব্রজমোহন দাস তাঁর 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ' গ্রন্থে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি, পৃঃ ১১ খ) "শ্রীনরহরিদাসঠাকুরমুখোদিত শ্রীচৈতন্যসহস্রনাম্নি"র উল্লেখ করেছেন ও কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। এই বই পাওয়া যায় নি।

কিংবদন্তী অনুসারে নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখরের নামাঙ্কিত একটি পদে পাওয়া যায়,

> গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে ব্রজরস করিলেন গান।
> হেন নরহরিসঙ্গ পাঞা পঁহু শ্রীগৌরাঙ্গ বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ ॥

এই উক্তি ঠিক হলে বলতে হবে নরহরি ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্ম-

গ্রহণ করেছিলেন। তার বেশী পরে জন্মগ্রহণ করলে নরহরির পক্ষে চৈতন্যদেবের জন্মের আগেই "ব্রজরস" গান করা সম্ভব হয় না। তবে ঐ পদটি প্রামাণিক বলে মনে হয় না।

'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবন থেকে বাংলায় ফেরার কিছুদিন পরে নরহরি সরকার পরলোকগমন করেন। মোটের উপর নরহরি সরকার যে সুদীর্ঘ পরমায়ু পেয়েছিলেন ও অন্ততপক্ষে ১৪৮০ থেকে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রঘুনন্দন

নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনও শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা পেয়েছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে তিনিও একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। অল্প বয়সেই রঘুনন্দন অত্যন্ত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে রঘুনন্দন সম্বন্ধে মহাপ্রভু ও রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দের এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে,

> মুকুন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন। তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥
> কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তার তনয়। নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
> মুকুন্দ কহে—রঘুনন্দন মোর পিতা হয়। আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
> আমাসভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে। অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥
>
> রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে। দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে॥

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতে এই কথোপকথন মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেই অর্থাৎ প্রায় ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল। ঐ সময়ে যে রঘুনন্দন নরহরি ও মুকুন্দের সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তা কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে'ও লেখা আছে (১৩শ সর্গের ১৪৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ঐ সময় রঘুনন্দনের বয়স মাত্র ১৮ বছর ছিল ধরলে তাঁর জন্ম হয় ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসবে রঘুনন্দন উপস্থিত ছিলেন বলে 'ভক্তিরত্নাকরে' লেখা আছে। এখন এই দুই মহোৎসবের সময় নির্ধারণ করতে পারলে রঘুনন্দনের জীবৎকাল মোটামুটিভাবে স্থির করা যাবে। বহু লেখক স্পষ্টাক্ষরে খেতরীর মহোৎসবের তারিখ ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ লিখে আসছেন। এর মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি জগবন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র উপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০৫) এই রহস্যের সমাধান পেলাম।

সেখানে জগবন্ধুবাবু কোনরকম প্রমাণ না দেখিয়ে লিখেছেন, ১৫০৪ শকাব্দের অল্প পরে খেতরীর মহোৎসব হয়, ঠিক ১৫০৪ শক তিনিও লেখেন নি। পরবর্তী লেখকরা এটুকু সাবধানতাও বজায় না রেখে সোজাসুজি ১৫০৪ শক বা ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে খেতরীর মহোৎসবের সময় ধরে আসছেন। ইতিহাস সম্বন্ধে যে আমরা কত অসাবধান, এটি তার দৃষ্টান্ত। কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসবের আনুমানিক তারিখ নির্ধারণ করা খুব কঠিন নয়। শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বীর হাম্বীরকে দীক্ষাদান ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ বা তার পরবর্তী ঘটনা। কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসব তারও পরে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং রঘুনন্দন অন্তত ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। 'ভক্তি-রত্নাকরে'র মতে খেতরীর মহোৎসবের কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। অতএব আনুমানিক ১৪৯৫-১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর জীবৎকাল।

বাসুদেব সার্বভৌম

বাসুদেব সার্বভৌম শুধু চৈতন্যদেবের একজন বিশিষ্ট পরিকর নন, চৈতন্যদেবের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি লেখনীও চালনা করেছিলেন। জয়ানন্দ লিখেছেন যে বাসুদেব সার্বভৌম প্রথম 'চৈতন্য-চরিত্র' প্রচার করেন,

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার। চৈতন্য-চরিত্র আগে করিল প্রচার॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে। সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥

সমস্ত চরিতগ্রন্থে এঁকে "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্বভৌমের স্বরচিত 'অদ্বৈতমকরন্দটীকা' ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে জানা যায় তাঁর সম্পূর্ণ নাম বাসুদেব সার্বভৌম। 'অদ্বৈতমকরন্দটীকা'তে তাঁর পিতার নাম 'নরহরি বিশারদ' বলে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে' 'মহেশ্বর বিশারদ' নাম পাই। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে সার্বভৌমের নিজের কথাই ঠিক।

সার্বভৌম কত দিন জীবিত ছিলেন, তা নিরূপণের এখন চেষ্টা করা যাক্। ৺দীনেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সার্বভৌমের জন্মাব্দ হয় অনুমান ১৪৩০-৩৫ সন মধ্যে।" কিন্তু এই মত স্বীকার করা যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখি,

সার্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি। পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য করি মানি॥

সার্বভৌমের পিতা বিশারদ চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহপাঠী ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ তাঁর "মান্য" ছিলেন। নীলাম্বর ও জগন্নাথ

কারও জন্মাব্দই ১৪৩০ খ্রীঃর আগে নয়, সুতরাং বিশারদের জন্মাব্দও তার পূর্ববর্তী নয়। অতএব বিশারদের পুত্র সার্বভৌম ১৪৫০ খ্রীঃর বেশি আগে জন্মগ্রহণ করেন নি। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচলে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি প্রবীণ পণ্ডিত। সুতরাং তাঁর জন্মাব্দ ১৪৫০ খ্রীঃর বেশি পরবর্তীও নয়।

জয়ানন্দ লিখেছেন, চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত আগে মুসলমান গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করেন। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্বভৌম নবদ্বীপ ছেড়ে নীলাচলে চলে যান। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জয়ানন্দের এই উক্তিকে ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়ানন্দের বর্ণনায় পরস্পর-বিরোধী উক্তি থাকায় তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। জয়ানন্দ লিখেছেন,

বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। সবংশে উৎকল গেল ছাড়ি গৌড় রাজ্য॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ম্ময় রাজা। রত্নসিংহাসনে সার্ব্বভৌমের কৈল পূজা॥

অথচ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের জন্মের ১১ বছর পরে, ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়ানন্দের বর্ণনার মধ্যে এইটুকু মাত্র সত্য যে সার্বভৌম প্রথমে নবদ্বীপে ছিলেন এবং পরে নীলাচলে যান। চরিতামৃতে বিশারদের সঙ্গে নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহাধ্যায়ন প্রসঙ্গ ও "নদীয়া-সম্বন্ধে"র উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়। চৈতন্যদেবের জন্মের সময় সার্বভৌমের বয়স ৩৫,৩৬-এর বেশী ছিল না। অথচ তিনি পণ্ডিত হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবার পরে নীলাচলে গিয়েছিলেন বলেই প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং সার্বভৌম ১৫০০ খ্রীঃর মত সময়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচলে সার্বভৌমের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হয়। তিনি চৈতন্যদেবকে বেদান্তের মতে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করেন। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় সার্বভৌম চৈতন্যদেবের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হন নি, চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েই তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন।

নীলাচলে অবস্থানের সময়েই সার্বভৌম 'অদ্বৈতমকরন্দটীকা' রচনা করেন। এই বই ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে লেখা, কারণ এই বইতে সার্বভৌম গজপতি প্রতাপরুদ্রকে "কর্ণাটেশ্বরকৃষ্ণরায়নৃপতের্গর্ব্বাগ্নিনির্ব্বাপক" বলেছেন। কর্ণাটরাজ কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তার পরে তার সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ হয়।

কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলনের কয়েক বছর পরে সার্বভৌম কাশীতে

গিয়েছিলেন। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রামানন্দ বন রচিত 'কাশীখণ্ডে'র টীকার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, সার্বভৌম শেষ জীবনে কাশীতেই বাস করেছিলেন। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে সার্বভৌম চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেও নীলাচলে ছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য সেখানে গিয়ে তাঁর দর্শন লাভ করেছিলেন। সার্বভৌম ১০০ বছরের বেশী সময় জীবিত ছিলেন বলে দীনেশবাবু যে অনুমান করেছিলেন, তার মূলে যুক্তি পাচ্ছি না।

বাসুদেব সার্বভৌমকে মধ্যযুগের বাংলা সংস্কৃতির 'জংসন স্টেশন' বলা যেতে পারে। একদিকে তিনি যেমন চৈতন্যসম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপাত্র, অপর দিকে তিনি ন্যায় ও বেদান্তদর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। এ ছাড়া বাংলায় ব্যাপক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে চৈতন্যদেব, নৈয়ায়িক রঘুনাথ, স্মার্ত রঘুনন্দন ও তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ একই সঙ্গে সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন। অবশ্য সময়ের বিচারে এই প্রবাদ অমূলক প্রতিপন্ন হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ১৬০০ খ্রীঃর মত সময়ে বর্তমান ছিলেন। কারণ তাঁর 'তন্ত্রসারে'র অধিকাংশ পুথিতে দেবনাথ তর্কপঞ্চাননের 'তন্ত্রকৌমুদী'র (রচনাকাল ১৫৬৪-৬৫ খ্রীঃ) উদ্ধৃতি আছে এবং গৌরীকান্তের 'সদ্যুক্তিমুক্তাবলী' গ্রন্থে (প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১৬৪২ খ্রীঃ) 'তন্ত্রসারে'র উদ্ধৃতি আছে ; আগমবাগীশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামতোষণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রাণতোষিণী' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৩, পৃঃ ১৩-১৬ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমের কাছে আগমবাগীশের পড়া তো দূরের কথা, সার্বভৌমের জীবৎকালে তাঁর জন্ম পর্যন্ত অসম্ভব বলে মনে হয়।

স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর 'জ্যোতিস্তত্ত্বে' ১৪৮৯ শকাব্দের (১৫৬৭-৬৮ খ্রীঃ) উল্লেখ করেছেন, সুতরাং ঐ গ্রন্থ তার পরে সম্পূর্ণ হয়। তাঁর 'মলমাসতত্ত্বে' 'জ্যোতিস্তত্ত্ব' সমেত ২৮টি 'তত্ত্বে'র উল্লেখ আছে, কিন্তু তীর্থযাত্রাতত্ত্ব, দ্বাদশযাত্রাতত্ত্ব, ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব, গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি, রাসযাত্রাপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ নেই। এর থেকে বোঝা যায়, জ্যোতিস্তত্ত্বের পরে মলমাসতত্ত্ব এবং তারপরে শেষোক্ত গ্রন্থগুলি রচিত হয়। অতএব রঘুনন্দন অন্তত ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। রঘুনন্দনের গুরু ছিলেন শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি। শ্রীনাথের আর এক শিষ্যের লেখা ১৪৩৪ শক বা ১৫১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দের পুথি পাওয়া গিয়েছে। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বেশি পরে জন্মগ্রহণ করলে শ্রীনাথের কাছে রঘুনন্দনের পড়া সম্ভব হয় না। অতএব রঘুনন্দনের আনুমানিক জীবৎকাল ১৫০০-১৫৮০ খ্রীঃ ধরতে পারি। বাসুদেব সার্বভৌমের

কাছে রঘুনন্দনের পড়া একেবারে অসম্ভব নয়, যদিও সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু চৈতন্যদেবের সহপাঠী হওয়া রঘুনন্দনের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না।

চৈতন্যদেবও কোনদিন সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ এক জাল 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ভিন্ন কোন চরিতগ্রন্থে এ বিষয়ের ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নেই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র বর্ণনা থেকে মনে হয় নীলাচলে দেখা হবার আগে সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে আদৌ চিনতেন না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখি চৈতন্যদেব বিনয় করে সার্বভৌমকে বলছেন,

আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥

সম্ভবত এই উক্তির উপর নির্ভর করেই সার্বভৌম ও চৈতন্যের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের প্রবাদ গড়ে উঠেছে।

এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র রঘুনাথ শিরোমণিই সম্ভবত সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার নামক জনৈক গ্রন্থকারের লেখা 'অনুমানদীধিতিপ্রতিবিম্বে' সার্বভৌমকে রঘুনাথ শিরোমণির গুরু বলা হয়েছে। রঘুনাথ শিরোমণির সময় সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকেও এই উক্তি সমর্থিত হয়। ১৫৭০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে রচিত রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্বে' রঘুনাথ শিরোমণির 'মলিম্লুচবিবেকে'র উদ্ধৃতি আছে, সুতরাং রঘুনাথ শিরোমণি তার আগেই বর্তমান ছিলেন। রঘুনাথের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি'র কয়েকটি টীকা ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল। ঐ সময়ের মধ্যেই 'দীধিতি'র প্রাচীন পাঠ অনেকাংশে লুপ্ত হয়েছিল এবং বিভিন্ন পাঠান্তরের সৃষ্টি হয়েছিল বলে ঐ সমস্ত টীকা থেকে জানা যায় (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ৯৮-৯৯)। সুতরাং 'অনুমানদীধিতি' ১৫৩০ খ্রীঃ বা তার আগেই রচিত হয়েছিল। ১৫২৫ খ্রীঃর আগে নিশ্চয়ই রচিত হয় নি, কারণ 'দীধিতি'তে কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের একটি 'বিবক্ষা' উদ্ধৃত হয়েছে (ঐ, পৃঃ ১০১)। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ১৫৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সচ্চরিতমীমাংসা' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি নির্ণয়পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীধরের 'কৃত্যকল্পতরু'র পুঁথি নকল করিয়েছিলেন (ঐ, পৃঃ ৬৩-৭২)। সুতরাং তাঁর জন্মাব্দ ও গ্রন্থরচনাকাল যথাক্রমে ১৫০০ ও ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন মতেই হবে না।

অতএব রঘুনাথ শিরোমণি ১৪৭৫ খ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করে প্রায় ৫৫ বছর বয়সে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি' রচনা করেন বলে ধরতে পারি। আর একটি বিষয় থেকে এই সময়নির্ধারণ সমর্থিত হয়। 'রূপসনাতন' নামে জনৈক ঘটক গ্রন্থকারের মতে স্মার্ত গ্রন্থকার 'সাহরী' বংশীয় শূলপাণি রঘুনাথের মাতামহ ('বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ ৮৯)। শূলপাণি মৈথিল গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্রের (জীবৎকাল আঃ ১৪০০-১৪৭৫ খ্রীঃ) সমসাময়িক, কারণ উভয়ে উভয়ের গ্রন্থে পরস্পরের মত উদ্ধৃত করেছেন (I. H Q., 1941 p. 464)। অতএব রঘুনাথের জন্মাব্দ ১৪৭৫ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে ধরাই যুক্তিযুক্ত হয়। সুতরাং সময়ের হিসাবেও তাঁর পক্ষে বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

সনাতন গোস্বামীও বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন। সনাতন তাঁর 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে' সার্বভৌম ও তাঁর ভাই বিদ্যাবাচস্পতি দু'জনকেই "গুরু" বলে বন্দনা করেছেন।

স্বরূপ দামোদর

স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার প্রায় আগাগোড়াই তাঁর সঙ্গী ছিলেন। 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায়, স্বরূপ দামোদরের পূর্বনাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য এবং তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির 'প্রিয় সখা' ছিলেন। পুণ্ডরীক গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রগুরু এবং চৈতন্যদেব তাঁকে "বাপ" বলে সম্বোধন করতেন। সুতরাং মহাপ্রভুর চেয়ে স্বরূপ বয়সে অনেক বড় ছিলেন সন্দেহ নেই। মহাপ্রভুর বিয়োগের পরে তিনি বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং মোটামুটিভাবে ১৪৬৫-১৫৪০ খ্রীঃ তাঁর জীবৎকাল ধরতে পারি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণনা করে একটি 'কড়চা' লিখেছিলেন এবং রঘুনাথ দাস তার বৃত্তি লিখেছিলেন। কৃষ্ণদাস স্বরূপ দামোদরের কড়চার কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। 'রায় রামানন্দ সংবাদ'টি তিনি এই কড়চা অবলম্বনেই বর্ণনা করেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই বিবৃতিকে সত্য বলে মানেন নি। আমরা কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মিথ্যাবাদী বলতে পারি না। কৃষ্ণদাস রঘুনাথ রচিত বৃত্তি থেকে কিছু উদ্ধৃত করেন নি বলে তার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' বর্ণিত 'রায় রামানন্দ সংবাদে'র সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনার

যে মিল দেখা যায়, তার কারণ কবিকর্ণপুরও স্বরূপ দামোদরের কড়চা পড়েছিলেন; তার প্রমাণ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় তিনি স্বরূপ দামোদরের তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। রাধাগোবিন্দ নাথ "সম্ভবতঃ কবিকর্ণপুর স্বরূপ দামোদরের কড়চা দেখেন নাই" বলে যে অনুমান করেছেন, তা যে ঠিক নয়, তা বলাই বাহুল্য। যাহোক কবিকর্ণপুর 'রায় রামানন্দ সংবাদ' বর্ণনায় স্বরূপ দামোদরের বর্ণনার উপরেও কিছু যোগ করেছেন এবং কৃষ্ণদাস তার থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত'র কয়েকটি শ্লোকের উপরে 'তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াম্' লেখা আছে। কিন্তু পুথিতে তা না লেখা থাকায় কেউ কেউ শ্লোকগুলিকে স্বরূপ দামোদরের লেখা বলে স্বীকার করতে চান না। কোন কোন সংস্করণে আবার শ্লোকগুলির উপরে "তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামী কড়চায়াম্" লেখা আছে। শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব স্বরূপ দামোদরেরই নির্ণীত বলে প্রমাণিত হয়েছে, সুতরাং সেগুলি স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকেই উদ্ধৃত বলে মনে হয়। 'ভক্তিরত্নাকরে'ও স্বরূপ দামোদরের কড়চার একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।

রূপ-সনাতন

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলতে আমরা যাকে জানি, তার স্রষ্টা চৈতন্যদেব, কিন্তু রূপকার রূপ-সনাতন। চৈতন্যদেবের অন্য কোন কোন পরিকর স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছিলেন। নরহরি গৌরনাগরবাদ এবং কবিকর্ণপুর গৌরপারম্যবাদ প্রচার করেছিলেন। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' চৈতন্যদেবকে দিয়ে যোগ উপদেশ করিয়েছেন। উড়িয়া ভক্তেরা অন্য প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু রূপ-সনাতনেরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে। তাঁদের ভাষ্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভাষ্যের মর্যাদা পেয়েছে। এই ভাষ্যের মূলে চৈতন্যদেবের প্রভাব থাকলেও তা অনেকখানি রূপ-সনাতনেরই সৃষ্টি।

জীব গোস্বামীর 'লঘু বৈষ্ণবতোষণী' থেকে জানা যায়, রূপ-সনাতনের পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল কর্ণাটকে। তাঁদের প্রপিতামহ পদ্মনাভ হিন্দু গৌড়েশ্বর দনুজমর্দন বা গণেশের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি নবহট্টকে (অর্থাৎ কলকাতার নিকটবর্তী 'নৈহাটি'তে)* বসতি স্থাপন করেন। রূপ-সনাতনের পিতা কুমারদেব পূর্ববঙ্গে চলে যান ('ভক্তিরত্নাকরে'র মতে পূর্ববঙ্গের বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে যান) কুমারদেবের তিন ছেলেরই নাম আমরা জানি—রূপ, সনাতন ও বল্লভ বা অনুপম। আর এক

* এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমার লেখা 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' (২য় সং, পৃঃ ১৪২-৪৩) দ্রষ্টব্য।

ছেলের উল্লেখ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পাই। তাতে দেখি হোসেন শাহ "সাকর মল্লিক" উপাধিধারী সনাতনকে বলছেন,

তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার ॥
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।

রূপ-সনাতনের জীবৎকাল সম্বন্ধে এবার আলোচনা করব। চৈতন্যদেব যখন নীলাচল থেকে বাংলায় আসেন, সেই সময় অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন ও রূপ উভয়েই ছিলেন সুলতান হোসেন শাহের 'দবীর খাস' বা প্রধান সেক্রেটারী।* ঐ সময় রূপের বয়স মাত্র ত্রিশ বছর ছিল এবং সনাতন তাঁর চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড় ছিলেন ধরলে রূপের জন্মাব্দ হয় ১৪৮৪ খ্রীঃ এবং সনাতনের ১৪৮২ খ্রীঃ। এরপর তাঁদের জন্মাব্দ নামবে না। এর বেশি আগেও যাবে না, কারণ তাঁরা দুজনেই ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও জীবিত ছিলেন। সনাতনের 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী' ১৪৭৬ শকাব্দ বা ১৫৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং রূপ সনাতনের পরে পরলোকগমন করেছিলেন।

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্য যখন বৃন্দাবনে প্রথম যান, রূপ-সনাতন তার আগে পরলোকগমন করেছিলেন ('শ্রীনিবাস আচার্য' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত একটি সংস্কৃতে লেখা পাতড়া থেকে রূপসনাতন সম্বন্ধে কিছু নতুন খবর পাওয়া যায়। পাতড়ার নিবন্ধটির রচনাকাল ১৬২০ শক ও ১০০৪ সন (মল্লাব্দ) অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ এবং পাতড়াটির লিপিকাল ১৬২৯ শক ও ১০১৩ সন (মল্লাব্দ)† অর্থাৎ ১৭০৭-০৮ খ্রীঃ। ডঃ সুকুমার সেন ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ তারিখে বর্ধমান সাহিত্য সভার অধিবেশনে এটির পরিচয় দেন। পাতড়াটিতে লেখা আছে যে রূপ-সনাতন-বল্লভের আরও দু'জন বড় ভাই ছিলেন এবং তাঁরা

* এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমার লেখা 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' বইয়ের ১ম সংস্করণ (১৯৬২), পৃঃ ২৬৬-৭১ অথবা ২য় সংস্করণ (১৯৬৬), পৃঃ ৩৬৫-৭০ দ্রষ্টব্য। ডঃ নরেশচন্দ্র জানা তাঁর 'বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী' (১৯৭০) বইয়ে (পৃঃ ৩২-৩৯) এ সম্বন্ধে আমার সমস্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি ঐ বইয়ের গ্রন্থপঞ্জীতে (পৃঃ ৩০৭) 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' বইয়ের নামও উল্লেখ করেছেন।

† এই লিপিকাল আমি ২৬।১।১৯৫৭ তারিখে পুথিতে স্পষ্ট করে লেখা দেখেছিলাম, পরে পাতড়াটির প্রকাশিত ফটোতে (ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৪র্থ সংস্করণের ১৪ নং চিত্রের ডান দিকের নীচের কোণ দ্রষ্টব্য) তাকে অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে (এর উদ্দেশ্য, পাতড়াটিকে আরও প্রাচীন বলে দেখানো); কিন্তু ক্যামেরার কাছে এই অপচেষ্টা ধরা পড়ে গিয়েছে।

পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' হোসেন শাহের উক্তি এই উক্তির সমর্থক।

জীব গোস্বামী

জীব গোস্বামীর পিতার নাম বল্লভ। তিনি গৌড়ের সুলতানের কর্মচারী ছিলেন এবং গৌড়েশ্বরের কাছে 'অনুপম মল্লিক' উপাধি লাভ করেন; 'চৈতন্যচরিতামৃতে' লেখা আছে, "অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।" বল্লভ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন পেয়েছিলেন। তার অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং জীব ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'গোপালচম্পূ' সম্পূর্ণ করেন, অতএব অন্তত ঐ বছর অবধি তিনি জীবিত ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন সূত্রের উক্তি বিশ্বাস করলে বলতে হয়, জীব অন্তত ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে চৈতন্যদেব যখন রামকেলিতে আসেন, তখন জীব তাঁর দর্শন পান—"শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।" এ ঘটনা ঘটে ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় জীবের বয়স মাত্র ৪ বছর ছিল ধরলে তাঁর জন্মাব্দ হয় ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ। এদিকে বর্ধমান সাহিত্য সভার যে পাতড়াটির আগে উল্লেখ করেছি, তাতে লেখা আছে জীব ১৫৩২ শকে অর্থাৎ ১৬১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ঐ পাতড়াটিতে আর একটি নতুন কথা লেখা আছে যে জীব বিবাহের রাত্রে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান।

গোপাল ভট্ট

গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অন্যতম। অনেক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে প্রামাণিকভাবে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। 'অনুরাগবল্লী' ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেই সময় গোপাল ভট্টর পিতার গৃহে চাতুর্মাস্য যাপন করেন। গোপাল তখন বালক, তিনিও প্রভুর সেবা করেন। চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত লিখেছেন, দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভু ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চাতুর্মাস্য যাপন করেন এবং তাঁর বালক পুত্র গোপাল প্রভুর কৃপা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই গোপালই যে পরবর্তীকালে 'গোপাল ভট্ট' নামে পরিচিত হন, তা মুরারি গুপ্ত বলেন নি। প্রকৃতপক্ষে 'গোপাল ভট্টে'র পিতার নাম কি, তা অনিশ্চিত (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডঃ সুশীলকুমার দের লেখা 'নানা নিবন্ধ' বইয়ের 'গোপাল-ভট্ট' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। যাহোক, গোপাল ভট্টের বাল্যকালে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, এই বিবরণ সঠিক হলে ১৫০০ থেকে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গোপাল

ভট্টের জন্ম ধরতে হবে, কারণ মহাপ্রভু ১৫১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যান। গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাস আচার্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি অন্তত ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রঘুনাথ দাস

রঘুনাথ দাসের শেষ জীবনের সহচর কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে, রঘুনাথ দাস চৈতন্যদেবের নীলাচল থেকে গৌড়ে আগমনের সময় অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করেন, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে গৃহ ত্যাগ করে নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হন এবং ষোল বছর মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করেন—"ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।" মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের মৃত্যু ঘটলে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। গৃহত্যাগের আগে তাঁর বিবাহ ও পুত্রকন্যার জন্ম হয়েছিল। সুতরাং রঘুনাথের জন্ম ও মৃত্যুর সন আনুমানিক ১৪৯৫ খ্রীঃ ও ১৫৮৫ খ্রীঃ ধরতে পারি।

রঘুনাথ ভট্ট

'চৈতন্যচরিতামৃতে' লেখা আছে, মহাপ্রভু যখন কাশীতে যান তখন অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে তপন মিশ্রের বালক পুত্র রঘুনাথ প্রভুর সেবা করেন। এই রঘুনাথই রঘুনাথ ভট্ট। এঁর জন্ম ১৫০৫ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল ধরতে পারি। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবন গমনের (১৫৬২ খ্রীঃ) আগে পরলোক গমন করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' রঘুনাথ ভট্টের মৃত্যুর উল্লেখ আছে, তবে কোন্ সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন আভাস দেওয়া হয়নি।

॥ আট ॥

মুরারি গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে তাঁর বিশিষ্টতম ভক্তদের একজন হয়েছিলেন। মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। বৃন্দাবন দাস স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন, যে-সমস্ত চৈতন্য-ভক্ত চৈতন্যদেবের আগেই জন্মেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত অন্যতম। চৈতন্যদেব যখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে মুরারি, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি সহপাঠীকে "ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া" বিরক্ত করতেন, তখন "শিশুজ্ঞানে কেহো কিছু না বোলে হাসিয়া"। মুরারি মহাপ্রভুর চেয়ে ৬।৭ বছরের বড় ছিলেন এবং ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে ধরতে পারি।

মুরারি গুপ্ত শুধু ভক্ত হিসাবে নন, কবি হিসাবেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি কতকগুলি উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে "সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও" পদটি অত্যন্ত বিখ্যাত। শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্তের ৪র্থ পর্বে (১৯৩৩) কমললতাকে দিয়ে পদটি গাইয়েছেন ও ব্যাখ্যা করিয়েছেন। সুতরাং পদটিকে "পূর্বগামী পদাবলী রসিকেরা……উপেক্ষা করিয়াছিলেন" বলে ডঃ সুকুমার সেন যে মন্তব্য করেছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। আলোচ্য পদটি 'পদকল্পতরু'তে সঙ্কলিত হয়েছে। 'পদকল্পতরু'তে ধৃত আর একটি পদকেও ("কি ছার পিরীতি কৈলা") ডঃ সুকুমার সেন মুরারি গুপ্তের লেখা বলে মনে করেন, কিন্তু পদটির ভনিতায় আছে "গুপ্ত কহে"—'মুরারি' নাম সেখানে নেই। সেই জন্য এটিকে মুরারি গুপ্তের রচনা বলে গ্রহণ করা যায় না। চৈতন্যচরিতগ্রন্থ রচনার আগেই যে মুরারি গুপ্ত গান লিখতেন, তা তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'-এর দ্বিতীয় প্রক্রম চতুর্থ সর্গ ২৩-২৪ সংখ্যক শ্লোক থেকে জানা যায়।

মুরারি গুপ্তের অমর কীর্তি তাঁর সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতম্'। এটিই প্রাচীনতম চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ এবং প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা বলে প্রামাণিকতার দিক্ দিয়েও অদ্বিতীয়।

পরবর্তী চৈতন্যচরিতকারেরা সকলেই এই বইটির কাছে ঋণী। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকটি মুরারি গুপ্তের বই থেকে নেওয়া; এ ছাড়া এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত মুরারি গুপ্তের রামাষ্টকের পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকও

বৃন্দাবন দাস উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর গ্রন্থের আরও অনেক অংশ মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদ বলে মনে হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যাদি প্রধানত তিনটি বই থেকে পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম মুরারি গুপ্তের এই গ্রন্থ।

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারি গুপ্তের গ্রন্থকে 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' বলেছেন। অনেকের মতে 'কড়চা' শব্দের দ্বারা সাময়িক লিপি জাতীয় রচনা বোঝায়। অথচ এই গ্রন্থ আমরা বর্তমানে যে আকারে পাচ্ছি, তা আলঙ্কারিক রীতিতে রচিত একটি মহাকাব্য। বইটি চারটি প্রক্রমে বিভক্ত। প্রথম প্রক্রমে ১৬টি, দ্বিতীয় প্রক্রমে ১৮টি, তৃতীয় প্রক্রমে ১৮টি এবং চতুর্থ প্রক্রমে ২৬টি অধ্যায় আছে। প্রথম প্রক্রমের প্রথম অধ্যায়ে দেখি, চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত শ্রীবাসের অনুরোধে মুরারি চৈতন্যচরিত বর্ণনা করছেন। প্রথম প্রক্রমের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত চৈতন্যচরিতের বক্তা মুরারি এবং শ্রোতা দামোদর পণ্ডিত। দামোদর চৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং মুরারি তার সবিস্তারে উত্তর দেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বইকে 'কড়চা' বলেছেন বলেই বইটি মূলে সাময়িক লিপি জাতীয় রচনা ছিল, একথা যেন কেউ না ভাবেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবনী মাত্রকেই "কড়চা" বলেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "আর আর কড়চা-কর্ত্তা (অর্থাৎ চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ-রচয়িতা) রহে দূর দেশে।"

মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এখন কিন্তু এর কোন পুথি পাওয়া যায় না। তাহলেও এর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে' মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ থেকে প্রক্রম ও অধ্যায়ের উল্লেখ সমেত ১০টি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলি এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কবি-কর্ণপুর 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে' মুরারির কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন, মহাকাব্যের ১ম থেকে ১৬শ পর্যন্ত সর্গের সঙ্গে মুরারির নামে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রায় হুবহু মিল আছে। লোচন দাসও মুরারির ঋণ স্বীকার করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থে মুরারির গ্রন্থের বহু অংশের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যায়। মুরারির গ্রন্থ যে দামোদর ও মুরারির প্রশ্নোত্তরের ছলে লেখা, তা লোচন দাস 'চৈতন্যমঙ্গলে' বলেছেন,

দামোদর পণ্ডিত সর্ব্ব পুছিল তাহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোকবন্ধে কৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত।
দামোদর সংবাদ—মুরারি মুখোদিত॥

এই কথা লোচন দাস তাঁর গ্রন্থের নানা জায়গাতে বলেছেন। এক জায়গায়,

মুরারি গুপ্ত বেজা প্রভুতত্ব জানে।
দামোদর পণ্ডিত পুছিলা তাঁর স্থানে॥

বলে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

লোচন দাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ডে লিখেছেন,

মুরারি দেখিয়া প্রভু বোলে পুনর্ব্বার।
পঢ়হ আপন শ্লোক শুনিব তোমার॥
এ বোল শুনিঞা সেই মুরারি চতুর।
পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ শুনয়ে ঠাকুর॥

এর পর তিনি 'রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশমুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তম্' ইত্যাদি একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটি মুরারির গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রক্রম সপ্তম সর্গে পাওয়া যায়।*

"গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় কবিকর্ণপূর লিখেছেন,

মুরারিগুপ্তচরণৈশ্চৈতন্যচরিতামৃতে।
উক্তো মুনিসুতঃ প্রাতস্তুলসীপত্রমাহরন্॥
অধৌতমভিশপ্তঃ স পিত্রা যবনতাং গতঃ।
স এব হরিদাসঃ সন্ জাতঃ পরমভক্তিমান্॥

মুরারি গুপ্তের গ্রন্থে সত্যই এই কথা আছে—প্রথম প্রক্রমের চতুর্থ সর্গের নবম থেকে দ্বাদশ ছত্রে।

মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের একেবারে শেষে এই রচনাকালসূচক শ্লোকটি ছিল,

চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চবিংশতিবৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

এর অর্থ করা হয়েছিল '১৪২৫ শকাব্দে (১৫০৩ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে এই গ্রন্থ শেষ হয়।' বলা বাহুল্য এই ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব, কারণ ঐ সময়

* ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "অধিকতর সম্ভাব্য হইতেছে এই যে, (মুরারি গুপ্তের কড়চায়) ছাপা বইটিতে যে শেষ সংস্করণ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা লোচনের গ্রন্থের অনুসরণেই।" ডঃ সেন বলতে চান যে লোচনের গ্রন্থের শেষাংশ লোচনের মৌলিক রচনা; কোন লোক তাকে অনুসরণ করে সংস্কৃত ভাষায় মুরারি গুপ্তের মুদ্রিত গ্রন্থের শেষাংশ লিখে দিয়েছে। কিন্তু লোচন তাঁর গ্রন্থের শেষ অংশ রচনার সময়ও মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ডঃ সুকুমার সেনের মত একেবারেই অচল।

মহাপ্রভুর বয়স মাত্র ১৮ বছর ছিল এবং তাঁর মহাপুরুষ-লক্ষণও কিছুই তখন বিকশিত হয়নি। তিনি 'চৈতন্য' নাম নেবার সাত বছর আগে "চৈতন্যচরিত" লেখা হওয়া অসম্ভব। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৮ম বর্ষে ২৬৮ পৃষ্ঠায় এবং প্রকাশিত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এই শ্লোকটি যেভাবে ছাপা হয়েছে, তাতে 'পঞ্চবিংশতি'র জায়গায় 'পঞ্চত্রিংশতি' পাঠ দেখা যায়। তার ফলে অনেকে মনে করেছেন যে, ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে) বইটির রচনা শেষ হয়। কিন্তু বইটিতে মহাপ্রভুর জীবনের ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী ঘটনাও অনেক বর্ণিত হয়েছে, তাঁর গম্ভীরালীলার বর্ণনা আছে, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পর্যন্ত উল্লেখ আছে। তাহলে কি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বর্ণনাটুকুই অকৃত্রিম, তার পরবর্তী ঘটনার সবই প্রক্ষিপ্ত? ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার কিন্তু এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন না। তার কারণ, এই বই-এর মহাপ্রভুর বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পর বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি লোচন দাস প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণ করে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন।

দুটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, গ্রন্থশেষের শ্লোকটির মধ্যে 'শকাব্দ' কথাটি কোথাও উল্লিখিত হয় নি। এ থেকে শ্লোকটির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ জাগে। কারণ মুরারি গুপ্তের মত পণ্ডিত লোক গ্রন্থরচনাকাল নির্দেশের সময় এর উল্লেখ করবেন না, এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ 'পঞ্চবিংশতি' অশুদ্ধ রূপ— শুদ্ধ রূপ হবে 'পঞ্চবিংশ'। কিন্তু 'পঞ্চবিংশ বৎসরে' 'অথবা 'পঞ্চবিংশ শক বৎসরে' লিখলে ছন্দোপতন হয়।

অতএব শ্লোকটি কোন সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের প্রক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। আমাদের ধারণা যে ঠিক্, তা এই শ্লোকটির আগের আটটি শ্লোক থেকেও বোঝা যাবে।

এই আটটি শ্লোকে মুরারি গুপ্তের যেভাবে প্রশস্তি করা হয়েছে, নিজের সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোক সেরকম লিখতে পারেন না, বিনয়ী বৈষ্ণব মুরারি তো দূরের কথা। গ্রন্থ রচিত হওয়ার বহু পরে মুরারি গুপ্তের কোন একজন ভক্ত এই শ্লোকগুলি জুড়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রথম আটটিতে তিনি মুরারি গুপ্তের মহিমা জ্ঞাপন করেছেন এবং শেষ শ্লোকটিতে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী গ্রন্থের রচনাকাল জানিয়েছেন। তাঁর ইতিহাস ও সংস্কৃত দুই বিষয়েই অল্প জ্ঞান থাকার জন্য শ্লোকটিতে দু'দিক দিয়েই মারাত্মক ভুল থেকে গেছে।

রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি যদি প্রক্ষিপ্ত হয় তা' হলে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ কখন রচিত

হয়েছিল? বইটির প্রথম প্রক্রম দ্বিতীয় সর্গে চৈতন্যদেবের তিরোধানের উল্লেখ আছে,

তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠৈস্থঃ প্রসাধিতঃ।
জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহর্দ্ধিমৎ॥

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে' কবিকর্ণপূর এই গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন ও গ্রন্থকারের প্রতি উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ১৫৩৩ থেকে সুরু করে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। রচনাকালবাচক শ্লোকটি এবং তার আগের আটটি শ্লোক যেমন প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, তেমনি মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের অন্য অনেক অংশও প্রক্ষিপ্ত হতে পারে। কিছু কিছু অংশ যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থের বেশ কয়েক স্থানে নিত্যানন্দের সুদীর্ঘ ও উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি আছে, নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবন দাসের পক্ষে বা চৈতন্যপরবর্তী কোন লেখকের পক্ষে এই জাতীয় নিত্যানন্দপ্রশস্তি রচনা করা অবশ্যই স্বাভাবিক, কিন্তু চৈতন্যদেবের সহপাঠী মুরারি গুপ্তের পক্ষে ততটা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তাই, এই অংশগুলিও প্রক্ষিপ্ত বলে আমাদের বিশ্বাস। তারপর আলোচ্য গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রম সপ্তদশ সর্গে চৈতন্যভক্তদের নামের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে মুরারির নামও আছে এবং মুরারিকে "বৈদ্যসিংহমুরারিকঃ" বলা হয়েছে। মুরারি গুপ্তের পক্ষে নিজেকে "বৈদ্যসিংহ" বলা সম্ভব নয়; সুতরাং এই তালিকাটিও সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রক্ষিপ্ত—তাতে কোন সন্দেহ নেই। তালিকাটি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ যে আকারে প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে তাতে যে অনেক রূপান্তর সাধিত হয়েছে, তা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের গবেষণা থেকে বুঝতে পারা যায়। বিমানবাবু দেখিয়েছেন যে, নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে' মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের তৃতীয় প্রক্রম থেকে যে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, তা ঐ গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় প্রক্রম সপ্তম সর্গে পাওয়া যায় এবং ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রক্রম পঞ্চম সর্গ থেকে যে শ্লোক 'ভক্তিরত্নাকরে' উদ্ধৃত হয়েছে, তা বর্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় প্রক্রম দশম সর্গে পাওয়া যায় ('শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৭৭)।

অতএব, মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের যে সব অংশের উদ্ধৃতি বা প্রতিধ্বনি বা অনুবাদ 'ভক্তিরত্নাকর', 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' (কবিকর্ণপূর বিরচিত), 'চৈতন্যমঙ্গল' (লোচন দাস বিরচিত) প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেগুলিকেই প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায়। বাদবাকি অংশের মধ্যে কতটা খাঁটি আর কতটা প্রক্ষিপ্ত, তা বলা সম্ভব নয়। প্রথম প্রক্রম দ্বিতীয় সর্গের চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কিত শ্লোকটিও প্রক্ষিপ্ত হতে পারে।*

সুতরাং মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের রচনাকালের উর্ধ্বসীমা ১৫৩৩ না ধরে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ ধরা উচিত। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের যে মাসে বৃন্দাবন ও আরও কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ভ্রমণের বিবরণ ও প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরবর্তী প্রসঙ্গ লোচন দাস তাঁর গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের (চতুর্থ প্রক্রম, প্রথম থেকে ষোড়শ সর্গ ও একবিংশ সর্গ) বর্ণনার হুবহু মিল আছে, লোচন দাসও মুরারি গুপ্তের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। অতএব মুরারি গুপ্তের মূল গ্রন্থে যে অন্তত ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চৈতন্যজীবনী বর্ণিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ১৫১৬ থেকে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে স্থির করা গেল।

মুরারি গুপ্ত কত দিন জীবিত ছিলেন তা বলা যায় না, তবে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের মধ্যখণ্ড বিংশ অধ্যায়ের একটি অংশ পড়ে মনে হয় যে, বৃন্দাবন দাস কখনও মুরারিকে চোখে দেখেন নি, নিত্যানন্দের কাছে তাঁর কথা শুনেছিলেন এবং ঐ অংশটি রচিত হওয়ার সময়ে মুরারি গুপ্ত জীবিত ছিলেন না। অংশটি এই,

> মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
> চলিলা আপন ঘরে হরষিত হৈয়া॥
> হেন মতে মুরারি গুপ্তের অনুভাব।
> আমি কি বলিব ব্যাপ্ত তাঁহার প্রভাব॥
> নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
> কিছু কিছু শুনিলাঙ সভার মহত্ত্ব॥

এর থেকে মনে হয়, মুরারি গুপ্ত ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পরলোকগমন করেছিলেন; এর পরে তিনি জীবিত থাকলে বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হত এবং

* বর্তমান গ্রন্থের 'চৈতন্যদেব' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ থেকে যে সব "প্রমাণ" উল্লেখ করেছি, তাদের প্রত্যেকটিই অন্য সূত্র দ্বারা সমর্থিত, সুতরাং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

'চৈতন্যভাগবতে' সেই সাক্ষাৎ পরিচয়ের প্রভাবও পড়ত। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' লেখা আছে যে পাছে চৈতন্যদেব তাঁর আগেই মারা যান—এই ভেবে মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখলেই আত্মহত্যা করবেন বলে স্থির করেছিলেন ; চৈতন্যদেব তাঁর এই সঙ্কল্পের কথা জানতে পেরে অনেক বুঝিয়ে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করান। এরকম একজন ভক্ত যে চৈতন্যদেবের বিরহযন্ত্রণা বেশিদিন সহ্য করতে পেরেছিলেন, তা মনে হয় না। এ দিক্ দিয়েও মুরারি ১৫৪০ খ্রীঃ-র মধ্যে পরলোকগমন করেছিলেন —এই ধারণা সমর্থিত হয়।

॥ নয় ॥

কবিকর্ণপূর

চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দদাস সেন 'কবিকর্ণপূর' উপাধিতেই সকলের কাছে পরিচিত। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তিনি সংস্কৃত ভাষায় তিনখানি বই লিখেছিলেন। এই তিনখানি বই-এর নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'।

এদের মধ্যে 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে'র রচনাকাল সম্বন্ধে কোন সমস্যা নেই। বইয়ের শেষে কবি লিখেছেন—

বেদাঃ রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতিপ্রসিদ্ধে।
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি ॥
বারে সুধাকিরণনাম্ন্যসিতদ্বিতীয়া-
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য ॥

এর থেকে বোঝা যায় ১৪৬৪ শকাব্দের আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে এই বই সমাপ্ত হয়েছিল।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'র শেষেও অনুরূপ রচনাকালনির্দেশক শ্লোক পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই,

শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরোহরির্ধরণিমণ্ডলে আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলা-
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ ॥*

এর থেকে জানা যায় ১৪৯৪ শক=১৫৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' রচিত হয়। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এই তারিখকে নাটকের রচনাকাল বলে মানতে অনিচ্ছুক। এই নাটক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই রচিত হয়েছিল বলে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। [বা. সা. ই. ১। পূ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩২২ দ্রষ্টব্য]†

---

* শ্লোকটির শেষ চরণ থেকে মনে হয়, কবিকর্ণপূর নাটকটি মুখে মুখে বলেছিলেন, অন্য লোক তা শুনে লিপিবদ্ধ করেছিল।

† ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারও এক সময় এই মতের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি মতের পরিবর্তন করে ১৪৯৪ শকাব্দকেই 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে'র রচনাসমাপ্তিকাল বলে গ্রহণ করেছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০১-১০২ দ্রষ্টব্য)।

তিনি বলেন, "নাটকটি প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে লেখা হইয়াছিল এই কথা প্রস্তাবনায় আছে।...সুতরাং প্রতাপরুদ্রের জীবৎকালেই (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) রচনা আরম্ভ হইয়াছিল।"

কিন্তু নাটকখানি যে ১৫৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই সমাপ্ত হয়েছিল, তা গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিশ্লেষণ করে ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ দেখিয়েছেন। নাটকের শেষে একটি শ্লোক আছে,

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং।
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া॥
এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যৈকশেষং গতে।
কো জানাতু শৃণোতু ক স্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাং॥

এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করে ৺তর্কবাগীশ লিখেছেন, "শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যৈকশেষং গতে' এই কথাও লক্ষ্য করা...কর্তব্য। কবি-কর্ণপূর উক্ত স্থলে দুঃখসূচক 'শিব শিব' শব্দের প্রয়োগ করিয়া কি বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও বুঝা আবশ্যক। কবিকর্ণপূরের ঐ কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে. নাটক সমাপ্তিকালে শ্রীচৈতন্যদেবের 'প্রিয়মণ্ডল' অর্থাৎ রাজা প্রতাপরুদ্র ও বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি উৎকলীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ও অন্যান্য গৌড়ীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কেহ জীবিত ছিলেন না। তাঁহারা তখন স্মৃতি মাত্র শেষ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই কবিকর্ণপুর দুঃখ প্রকাশ করিয়া উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন—'তৎপ্রিয়মণ্ডলে স্মৃত্যৈকশেষং গতে কো জানাতু শৃণোতু কঃ।' অথাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্তগণ তখন সেই শরীরে বিদ্যমান্ না থাকায় এই লীলা-কথা কে বুঝিবেন? কে শুনিবেন? 'তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্।' অতএব এই লীলা-কথার দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেব প্রীত হউন।"

সুতরাং যতদূর মনে হয়, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'র রচনা প্রতাপরুদ্রের জীবৎকালে অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই সুরু হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে মাঝখানে রচনায় ছেদ পড়ে। অনেক দিন পরে—১৫৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূর নাটকটি শেষ করেন—যখন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সকলেই পরলোকগমন করেছেন। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের গবেষণা (Our Heritage IV-I, 1956, pp. 1-19) থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাটকটির অধিকাংশই পরিণত বয়সের রচনা।

কবিকর্ণপূরের অপর গ্রন্থ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পরিকরদের তত্ত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' এই বইটি থেকে শ্লোক

উদ্ধৃত হয়েছে। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র অধিকাংশ পুথিতে বইটির রচনাকাল পাওয়া যায় "শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে"* অর্থাৎ ১৪৯৮ শক (=১৫৭৬-৭৭ খ্রীঃ)। এই পাঠই সঙ্গত। একখানি পুথিতে "শাকে রসারসমিতে মনুনৈব যুক্তে" অর্থাৎ ১৪৬৭ শক (=১৫৪৫-৪৬ খ্রীঃ) রচনাকাল পাওয়া যায়। এই তারিখ "গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা'র রচনাকাল হতে পারে না। কারণ, 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে 'চৈতন্যভাগবত'কার বৃন্দাবন দাসকে 'বেদব্যাস' বলা হয়েছে। কিন্তু ১৫৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচিত হয়েছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। যদি হয়েও থাকে, তা'হলেও গ্রন্থরচনার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ বৃন্দাবন দাস 'বেদব্যাস' আখ্যা পেয়ে গেলেন বলে মনে করা যায় না। 'চৈতন্যভাগবত' রচনার অন্তত একপুরুষ পরে এবং বৃন্দাবন দাসের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচিত হয়েছিল বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং ১৫৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দই বইটির রচনাকাল।

এই বইগুলি এবং কৃষ্ণলীলা ও বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংস্কৃত বই ছাড়া কবিকর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় পদও লিখেছিলেন। সম্ভবত বাংলা ভাষাতেও লিখেছিলেন। 'পরমানন্দ' ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলি তাঁর লেখা বলেই মনে হয়।

কবিকর্ণপূরের জন্ম কোন্ সময়ে হয়েছিল তা একটি বিতর্কমূলক বিষয়। কবি-কর্ণপূরেরা তিন ভাই—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দদাস। চৈতন্যদাসের নাম থেকে মনে হয় মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও 'চৈতন্য' নাম গ্রহণের পরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তারও পরে রামদাস এবং তারও পরে কবিকর্ণপুর পরমানন্দদাসের জন্ম হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে যে কবিকর্ণপূরের জন্মের আগে তাঁর পিতা শিবানন্দ সেন নীলাচলে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করলেন। প্রভু শিবানন্দকে বললেন,

এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার॥

'পুরীদাস'† মানে পরমানন্দ পুরীর দাস। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'র দশমাঙ্কেও দেখি শিবানন্দের সঙ্গে তাঁর ছোট ছেলে আসছেন শুনে মহাপ্রভু পরমানন্দ,

---

* ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "এখানে অঙ্কের বামগতি ধরিবার আবশ্যকতা নাই" (বা, সা, ই, ১।পূঃ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩২৩)। ডঃ সেন এই ফতোয়া কেন জারী করলেন, বুঝতে পারলাম না। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"ই তো চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ডঃ সেনের ফতোয়াকে মানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

† "পুরীদাস" নামের তাৎপর্য সম্বন্ধে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহোদয় যা লিখেছেন ('শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান' ২য় সং, পৃঃ ৬০১)—তা যে ঠিক নয়, তা উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে।

পুরীকে বললেন, "স্বামিন্! তব দাসঃ।" তাই শিবানন্দের ছোট ছেলে "প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস।"

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, সাত বছর বয়সে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুকে একটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়ে চমৎকৃত করেছিলেন। কিন্তু ঐ ঘটনার সাল জানা যায় না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে কবিকর্ণপুর ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা'হলে 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' রচনার সময় তাঁর বয়স হয় মাত্র ১৮ বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে'র পুথির লিপিকর লিখেছেন, মহাকাব্য রচনার সময় কবিকর্ণপূরের বয়স মাত্র ষোল বছর ছিল। কিন্তু এই দুই মতের কোনটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে' যে কবিত্ব, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখা যায়, তা ২৪।২৫ বছরের আগে সম্ভব বলে মনে হয় না। অন্ততপক্ষে এই কাব্য যে ১৬ বা ১৮ বছরের বালকের রচনা নয়, তা নিঃসংশয়েই বলা যায়। অপরিণতবয়স্ক এক বালককে রাজা প্রতাপরুদ্র 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' রচনার আদেশ দিতে পারেন বলেও মনে হয় না। পূর্বোক্ত দুই মত অনুসারে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর সময়ে কবিকর্ণপূরের বয়স ১৭ বছরের বেশি হয় না। তারপর, ঐ দুই মত অনুসারে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সময় কবিকর্ণপূরের বয়স হয় ৯ বা ৭ বছর। কিন্তু ঐ সময় কবিকর্ণপূরের বয়স অত কম ছিল না। কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে'র চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ সর্গে মহাপ্রভুর ও ভক্তদের উপস্থিতিতে নীলাচলে রথযাত্রার যে বিবরণ কবিকর্ণপূর দিয়েছেন, তা যে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ সর্গের একাদশ শ্লোকে কবি স্পষ্টই বলেছেন, তিনি ভক্তদের প্রথম রথযাত্রা দর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন না, অন্য এক বছরের বর্ণনা দিচ্ছেন। প্রথমবারের রথযাত্রার সময় তাঁর জন্ম হয় নি বলে তিনি অন্য এক বছরের রথযাত্রা, যা নিজের চোখে তিনি দেখেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার মধ্যে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় যেরকম সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, ৭ বা ৯ বছর বয়সের সময়কার স্মৃতি থেকে লিখলে তেমন সম্ভব হত বলে মনে হয় না। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে রূপ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন। ঐ সময়ে কবিকর্ণপূরের বয়স নিশ্চয়ই ২২।২৩ বছরের কম ছিল না। এই ক'টি কারণ থেকে আমার মনে হয়, আনুমানিক ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূরের জন্ম হয়েছিল।

কবিকর্ণপূর তাঁর পিতা শিবানন্দ সেনের কাছে চৈতন্য-জীবনী শুনে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' রচনার সময় যে শিবানন্দ জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ গ্রন্থের শেষে কবি লিখেছেন,

ইহ পরমকৃপালোর্গৌরচন্দ্রস্য কোঽপি
প্রণয়রসশরীরঃ শ্রীশিবানন্দসেনঃ।
ভুবি নিবসতি তস্যাপত্যমেকং কনীয়-
স্তৎকৃতপরমমৌগ্ধ্যাচ্চিত্রমেতং প্রবন্ধম্॥

[এই পৃথিবীতে পরম কৃপালু গৌরচন্দ্রের কোন এক প্রণয়রসশরীর (প্রিয়পাত্র) শিবানন্দ সেন বাস করেন, তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র পরম মুগ্ধতায় এই চিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছে।]

॥ দশ ॥

রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য

এদেশে ভাগবতপুরাণের জনপ্রিয়তা রামায়ণ বা মহাভারতের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে বাংলা ভাষায় বহু কাব্য লেখা হয়েছে। তার মধ্যে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রাচীনতম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা ভাষায় ভাগবতপুরাণের অনুবাদ খুব বেশী হয় নি। যে ক'খানি অনুবাদগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে রঘু পণ্ডিত নামে পরিচিত রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্যের অনুবাদই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এই রঘুনাথ পণ্ডিতের নিবাস ছিল বরাহনগরে। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' নাম দিয়ে ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত আকারে এবং শেষ তিন স্কন্ধের পূর্ণাঙ্গ আকারে অনুবাদ করেন। রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত। কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় লেখা আছে, "নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥" যদুনাথ দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃত'তে আছে, "বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্রকম্। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী।।" ('শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ২য় সং. পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৬৬)

রঘুনাথ নিজে বলেছেন যে তিনি "পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুত গদাধর"-এর শিষ্য ছিলেন। যদুনাথ প্রভৃতির লেখা গদাধরের শাখানির্ণয়েও রঘুনাথের নাম আছে। চৈতন্যদেবের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। সন্ন্যাসের পরে যখন চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বাংলায় আসেন, তখন তিনি বরাহনগরে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে তাঁর ভাগবত পাঠ শোনেন এবং তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দেন। একথা আমরা বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' পাই,

> তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
> সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পঢ়িতে॥

> প্রভু বোলে ভাগবত এমত পঢ়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
> এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য। ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য॥

এই ঘটনা ঘটেছিল ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

'চৈতন্যভাগবতে' উল্লিখিত "বিপ্র"—যাঁকে চৈতন্যদেব "ভাগবতাচার্য" উপাধি

দিয়েছিলেন, তিনি যে রঘুনাথ পণ্ডিতই তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কারণ কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ও যদুনাথ দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃত'-তে চৈতন্যদেবের প্রিয়পাত্র একজন মাত্র "ভাগবতাচার্যে"রই উল্লেখ পাওয়া যায়—তিনি রঘুনাথ পণ্ডিত। চৈতন্যদেবের কাছে রঘুনাথ মূল ভাগবত পড়েছিলেন ; ভাগবতের বাংলা অনুবাদ তিনি নিশ্চয়ই তখনও করেন নি—করলে 'চৈতন্যভাগবতে' তার উল্লেখ থাকত। মহাপ্রভুর আদেশ অনুযায়ী তিনি ভাগবত নিয়েই জীবন কাটিয়েছিলেন এবং শুধু "ভাগবত" পাঠ করে সন্তুষ্ট থাকেন নি, বাংলায় 'ভাগবত' অনুবাদও করেছিলেন। সুতরাং ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বছর পরে রঘুনাথ পণ্ডিতের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' রচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

॥ এগার ॥

কবিশেখর

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস-সমস্যার পরেই বোধ হয় সবচেয়ে জটিল কবিশেখর-সমস্যা। কবিশেখরের নামাঙ্কিত রচনাগুলি এক লোকের লেখা কিনা, 'কবিশেখর' উপাধিধারী কবির বা কবিদের নাম এবং উপাধি কী ছিল, তিনি বা তাঁরা কোন্ সময়ের লোক—এসব প্রশ্নের প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই এ পর্যন্ত তীব্র বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু সর্ববাদিসম্মত কোন সমাধানে পৌছোনো সম্ভব হয় নি। বর্তমান আলোচনায় আমরা এই দুরূহ সমস্যার জট ছাড়াবার চেষ্টা করব।

'পদকল্পতরু' প্রভৃতি পদসঙ্কলনগ্রন্থে 'কবিশেখর', 'শেখর' ও রায়শেখর' ভনিতায় বহু উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যায়। এই তিন ভনিতার পদেই ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব আচার্য শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনকে বন্দনা করা হয়েছে; সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণয়ে' রঘুনন্দনের শাখায় 'কবিশেখর রায়' নামে একজন গ্রন্থকার ও পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়,

> আর এক শাখা হয় কবিশেখর রায়।
> যাঁর গ্রন্থ পদ অনেক বিদিত সভায়॥

সুতরাং শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের 'কবিশেখর' উপাধিধারী একজন শিষ্য ছিলেন এবং তিনি 'শেখর' ও 'রায়শেখর' ভনিতাতেও পদ লিখতেন—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

রামগোপাল দাস বলেছেন যে কবিশেখর রায় অনেক গ্রন্থ ও পদ লিখেছিলেন; তিনি তাঁর 'রসকল্পবল্লী'তে 'কবিশেখর'-ভনিতাযুক্ত অনেক পদ উদ্ধৃত করেছেন। এ ছাড়া 'গোপালবিজয়' নামক একটি কাব্য থেকেও তিনি কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। 'গোপালবিজয়' কাব্য কবিশেখরের লেখা। এর অনেক পুথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। এই কাব্য ১৯৬৬ সালে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

'গোপালবিজয়' থেকে দেখা যায়, এই কবির প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। এই কাব্যের সূচনায় কবি এই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন,

> তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত। তবে কৈল গোপালের কীর্তন-অমৃত॥
> গোপীনাথবিজয় নাটক কৈল আর। তমু গোপবেশে মন না পুরে আমার॥
> তবে সে পাঁচালী করি গোপালবিজয়ে। বৈষ্ণবচরণেরেণু করিয়া হৃদয়ে॥

সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন। শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন।
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হীরাবতি। কৃষ্ণ যার প্রাণ সার কুল শীল জাতি ॥

কারও কারও মতে গোপালবিজয় পূর্বোক্ত পদকর্তা রায়শেখর-কবিশেখরের রচনা নয়, অন্য এক কবিশেখরের রচনা।* কিন্তু এ মত সমর্থন করা যায় না। কারণ 'গোপাল-বিজয়ে' খুব অল্প হলেও, শেখর ও রায়শেখর ভনিতা পাওয়া যায়। যেমন,

শেখর যে কহে গোপালবিজয়ে শুনিতে আতি রসাল।

—বা. সা. ই. ১।১, পৃঃ ৪০৫, পা. টী.

মন্দ সুবর্ণে কভু জোট নাহি রহে। রায়শেখর তাহা দেখিল কথা কহে ॥

—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬১ নং পুথি, ৮৫ পত্র

তাছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে, রামগোপাল দাস কবিশেখর রায়কে বহুগ্রন্থকার বলেছেন। 'গোপালবিজয়' কাব্য এবং 'গোপালবিজয়ে' উল্লিখিত 'গোপালের কীর্ত্তন-অমৃত' ও 'গোপীনাথবিজয় নাটক' যদি কবিশেখর রায়ের রচনা না হয়, তা হলে তাঁর মাত্র একখানি গ্রন্থ থাকে—'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'। সে ক্ষেত্রে তিনি বহুগ্রন্থপ্রণেতা বলে গণ্য হতে পারেন না। অতএব 'কবিশেখর রায়' বলতে রামগোপাল দাস যে 'গোপালবিজয়'-এর রচয়িতাকেই বুঝিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'দণ্ডাত্মিকা-পদাবলী' নামক গ্রন্থে পদপরম্পরার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বর্ণিত হয়েছে। এতে 'কবিশেখর', 'শেখর' ও 'রায়শেখর'—তিন ভনিতাই পাওয়া যায়। 'দণ্ডাত্মিকা-পদাবলী' ও 'গোপালবিজয়' যে একই কবির লেখা, তার বহু প্রমাণ আছে। উভয় গ্রন্থের ভনিতার ধরনে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'গোপালবিজয়' এবং বৃন্দাবন থেকে প্রকাশিত 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' (১৯০২) থেকে কয়েকটি মাত্র ভনিতা উদ্ধৃত করে এই সাদৃশ্য দেখাচ্ছি।

গোপালবিজয় :—

(১) গোপালবিজয় নর শুন একমনে। কহে কবিশেখর অমৃত বরিষণে ॥

* এঁদের অন্যতম যুক্তি এই যে, 'গোপালবিজয়'-রচয়িতার প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, আর একটি সংস্কৃত শাখানির্ণয়ে ও রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণযে' পদকর্তা কবিশেখরের নাম "কবিশেখর রায়" লেখা রয়েছে। এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, '(কবিশেখর বা রায়শেখর ভনিতাযুক্ত পদে) কবি ভুলে একবারও কোথাও নিজের আসল নাম ভনিতায় ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং একশ ব দেড়শ বছর পরেকার পদাবলী-সংগ্রহকার যে ভনিতার নামকেই আসল বলিয়া ধরিয়া লইবেন তাহাই স্বাভাবিক।" ঠিক এই কারণেই পূর্বোক্ত দু'টি 'শাখানির্ণয়ে' আলোচ্য কবির নাম "কবিশেখর রায়" লেখা হয়েছে।

(২) কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি। হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাষাবলী॥
(৩) দানপ্রবন্ধকথা শুন সর্ব্বজনে। কহে কবিশেখর অমৃত বরিষণে॥
(৪) কহে কবিশেখর সরসবচনে। হাসিতে নাচিতে পারে নন্দের নন্দনে॥

দণ্ডাত্মিকা-পদাবলী :—

(১) অলকা তিলক দেই চমকি নেহারি। কহে কবিশেখর জাও বলিহারি॥
(২) কহ কবিশেখর রাই না করিহ ডর। গোপতে ভুঞ্জিবে সুখ কি জানিবে নর॥
(৩) কহে কবিশেখর শুন সখীগণ। জয়পরাজয় দেখ হইয়া মহাজন॥
(৪) কহে কবিশেখর করি অনুমানে। এতিথনে দুহুঁজনে করলি সিনানে॥

কবিশেখর-ভনিতাযুক্ত একটি পদে আছে, "বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর কবিশেখর ইহ রস পায়॥" এর সঙ্গে গোপালবিজয়ের "বৃন্দাবন ভরি রসের বাদলে তাহে প্রেমতরঙ্গেতে অধিক উথলে॥" উক্তির চমৎকার মিল আছে।

গোপালবিজয়ের একটি শ্লোক "জত জত আরতিকে ডাকে গোপীনাথে। ততেক লজ্জাএ গোপী রহে হেট মাথে॥" এর সঙ্গে কবিশেখরের একটি পদের দু'টি চরণ—"যব-পহু কহলহি লহু লহু বাত। তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ"—এর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। কবিশেখরের ভনিতাযুক্ত 'নায়কশিক্ষা' বিষয়ক পদের ভাষা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'গোপাল-বিজয়ে' কৃষ্ণের প্রতি কামকলার উক্তির অদ্ভুত মিল দেখা যায়। [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রায়শেখরের পদাবলী' (১৯৫৫), পদসংখ্যা ১৯০ এবং বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'গোপালবিজয়' (১৯৬৬), পৃ, ২২২-২২৩ দ্রষ্টব্য।]

'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' ও গোপালবিজয়ে'র রচনাকাল সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকেও এই দুই কাব্য এক লোকের রচনা বলে মনে হয়। 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে রচিত হয় নি, কারণ এর একটি পদে পর্তুগীজ শব্দজাত 'আতা' ও 'আনাবস' শব্দ পাওয়া যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রায়শেখরের পদাবলী', ১৯৫৫, পৃঃ ৩১৭, পদসংখ্যা ২০৬ দ্রষ্টব্য)। এর রচয়িতা শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য, সুতরাং এই গ্রন্থ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের বেশি পরে রচিত হতে পারে না। 'গোপালবিজয়ে'র রচনাকাল নিয়ে আরও স্পষ্ট সূত্র পাওয়া যায়। একদিকে গোপালবিজয়ের 'গোপী-অনুগতি' ভাব, অপরদিকে "বৈষ্ণবচরণরেণু করিয়া হৃদয়ে," "কৃষ্ণ যার প্রাণ সার কুল শীল জাতি," "নন্দের নন্দনে বিনি কান্দনে না পাই,"

"হের শুন রাধা আদি পরমবল্লভা" প্রভৃতি উক্তি থেকে বোঝা যায় এই কাব্য চৈতন্যপরবর্তী সময়ের রচনা। এই গ্রন্থেও পর্তুগীজ থেকে আগত শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন "বেসালি" (Vasilha) [বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'গোপালবিজয়', পৃঃ ৬২ দ্রষ্টব্য]। সুতরাং এই কাব্য কোনমতেই ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগেকার রচনা হতে পারে না। তেমনি বিভিন্ন প্রাচীন পুথির লিপিকাল থেকে জানা যায় এই কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পরবর্তী সময়ের রচনা নয়। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬০ নং পুথি। এর লিপিকাল "সকাব্দাঃ॥ ১৫৯৫"। কিন্তু এতে আদর্শ পুথির লিপিকালটিও পাওয়া যায়—"শ্রীকবিশেখরমুখপদ্ম-বিনির্গত শ্রীগোপালবিজয় সম্পূর্ণ শাকে গজাব্ধি সর (শর) চন্দ্রমিতে মুকুন্দ জষঃ (যশঃ) প্রদেন শ্রীনরোত্তমনন্দীলিখিত পুস্তক গোপালবিজয়সিষ্ট (শিষ্ট) জনবন্দনায় ॥" 'শাকে গজাব্ধি শরচন্দ্র' অর্থাৎ ১৫৪৮ শক = ১৬২৬-২৭ খ্রীঃ।* অপর একটি পুথি সম্বন্ধে ৺শিবরতন মিত্র লিখেছেন "লেখকের 'রতন লাইব্রেরী'তেও এই গ্রন্থের (গোপালবিজয়ের) একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। …এই পুঁথিটির হস্তলিপি তারিখ ১৫৩৫ শকাব্দা (= ১৬১৩-১৪ খ্রীঃ)।" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক, পৃঃ ৫৬) সুতরাং সময়ের বিচারেও 'গোপালবিজয়' 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'র রচয়িতা রঘুনন্দনের শিষ্য কবিশেখরের রচনা বলেই প্রতীত হয়।†

এই সমস্ত কারণে আমরা 'গোপালবিজয়' রায়শেখর-কবিশেখরের রচনা বলেই সিদ্ধান্ত করছি। 'গোপালবিজয়ে'র উপক্রমে উল্লিখিত 'গোপালের কীর্তন-অমৃত' এবং

* কেউ কেউ বলেছেন 'শাকে গজাব্ধি শরচন্দ্র' = ১৫৭৮ হবে। কিন্তু প্রাচীনকালে 'অব্ধি' বা 'সমুদ্র'র যে কোন প্রতিশব্দ, সর্বত্র ৪ অর্থেই প্রযুক্ত হত। বাংলা দেশে লেখা কোন কোন বাংলা কাব্যের রচনাকালবাচক শ্লোকে ৭ অর্থে 'সমুদ্র' বা তার প্রতিশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 'গোপালবিজয়'-এর আলোচ্য পুষ্পিকা সংস্কৃত ভাষায় লেখা, সেই জন্য এখানে 'অব্ধি' শব্দ ৪ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বলে ধরাই যুক্তিসঙ্গত।

† 'গোপালবিজয়ে' চৈতন্যদেবের নাম উল্লিখিত হয় নি, অতএব এই কাব্য চৈতন্যপূর্ববর্তী কালে রচিত হয়েছিল—এ রকম অদ্ভুত কথা জনৈক লেখক বলেছেন। কিন্তু চৈতন্যপূর্ববর্তী কালে রচিত কোন গ্রন্থে পর্তুগীজ শব্দ থাকতে পারে না, এ কথাটা তিনি ভেবে দেখেন নি। তা ছাড়া, চৈতন্যপরবর্তী ও চৈতন্য-ভক্ত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থকারই যে তাঁদের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের নাম করেন নি, এ কথাও সম্ভবত তাঁর জানা নেই।

'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' অভিন্ন বলে মনে হয়। 'গোপালবিজয়' ও 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' কোন গ্রন্থেই রঘুনন্দনের উল্লেখ পাওয়া যায় না, এটি একটি লক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু গুরুর নাম উল্লেখ না করার দৃষ্টান্ত বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়।

এবার আর একটি বিষয়ের আলোচনা করছি। পূর্বোক্ত সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব গ্রন্থকার রামগোপাল দাস রঘুনন্দনের 'শাখানির্ণয়ে' লিখেছেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী', পৃঃ ২১৩-১৪ দ্রষ্টব্য),

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাসী। যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি ॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়। প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ় ॥

... ...

ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি। যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি॥

আবার এই রামগোপালদাসই তাঁর 'রসকল্পবল্লী'তে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, পৃঃ ১৬৭) লিখেছেন

যশরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী ॥

রামগোপাল দাস কর্তৃক উল্লিখিত কবিরঞ্জন 'কবিতাগীতকার' ছিলেন। 'কবিরঞ্জন' ভনিতায় অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি নিঃসন্দেহে এঁরই লেখা। এই কবিরঞ্জন ও পদকর্তা কবিশেখর যে অভিন্ন হতে পারেন, তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থেকে মনে হয়।

(১) কবিশেখর ও কবিরঞ্জন উভয়েরই ভনিতায় একটি চৈতন্যবিষয়ক পদ পাওয়া যায়; পদটির আরম্ভ—"শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ"।

(২) রামগোপাল দাস কবিরঞ্জন সম্বন্ধে লিখেছেন, "ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।" চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন-বর্ণনামূলক কয়েকটি পদ থেকেও বোঝা যায়, কবিরঞ্জন 'বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত হতেন (সা.প.প., ১৩৩৭, পৃঃ ৪০-৪৭ দ্রষ্টব্য)। কবিশেখরেরও নামান্তর বা উপাধি ছিল 'বিদ্যাপতি', কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর মৈথিল গ্রন্থকার লোচন তাঁর 'রাগতরঙ্গিণী' তে 'কবিশেখর'-ভনিতাযুক্ত একটি পদ উদ্ধৃত করে তার নীচে লিখেছেন, "ইতি বিদ্যাপতেঃ"। ডঃ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন, একই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত পরস্পরের পরিপূরক দু'টি পদের (নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি' পদসংখ্যা ৫৩৩ ও ৫৩৪) একটিতে 'কবিশেখর' ভনিতা এবং অপরটিতে 'বিদ্যাপতি' ভনিতা পাওয়া যায়। ('বিদ্যাপতি-শতক' এর ভূমিকা, পৃঃ।৵০ দ্রষ্টব্য)

(৩) রামগোপাল দাস লিখেছেন যে কবিরঞ্জন 'রাজসেবী' ছিলেন। কবিশেখরও 'রাজসেবী' ছিলেন, কারণ তাঁর-ভনিতা-সংবলিত ('রাগতরঙ্গিণী' তে সঙ্কলিত) পূর্বোক্ত পদে নসরৎ শাহের নাম আছে (পরে দ্রষ্টব্য)। * 'বিদ্যাপতি'-ভনিতাযুক্ত কয়েকটি পদেও হোসেন শাহ ও 'নসীরা শাহ' অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের নাম আছে।

(৪) উপরে 'রাগতরঙ্গিণী' তে সঙ্কলিত 'কবিশেখর'-ভনিতাযুক্ত যে পদটির আমরা উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন গ্রন্থে ও পুঁথিতে তার বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। কোন পাঠে 'কবিশেখর', কোন পাঠে 'কবিরঞ্জন', আবার কোন পাঠে 'বিদ্যাপতি' ভনিতা পাওয়া যায়। নীচে পদটির কয়েকটি পাঠ উদ্ধৃত করলাম।

(ক) 'রাগতরঙ্গিণী'তে (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৪-৬৫) পদটির এই পাঠ পাওয়া যায় (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'র ৯৩২ সংখ্যক পদেও এই পাঠ গৃহীত হয়েছে),

আনন লোচন বচনে বোলএ হঁসি।
অমিঅ বরিস জনি সরদ পুনিমা সসি॥
অপরুব রূপ রমনিআঁ।
জাইতে দেখলি গজরাজ গমনিআঁ॥
কাজলে রঞ্জিত ধবল নয়ন বর।
ভমর মিলল জনি অরুণ কমল দল॥
ভান ভেল মোহ মাঝ খীনি ধনি।
কুচ সিরিফল ভরে ভাঁগি জাতি জনি॥

* ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী আমার এই উক্তির সমালোচনা করে লিখেছেন, "দুইজন কবিই যদি রাজসেবী হন, তাহাতে তাঁহাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব কেন ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা বুঝা যায় না" (বিদ্যাপতি-সমীক্ষা, পৃঃ ২৫)। কিন্তু রাজসেবী কবিরঞ্জন ও রাজসেবী কবিশেখরের পৃথক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। তাই তাঁদের ঐক্য সংক্রান্ত পরোক্ষ প্রমাণগুলিকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।

কবিশেখর ভন অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ শাহ ভজলি কমলমুখি ॥ *

(খ) সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী সম্পাদিত 'কীর্তন-পদাবলী' তে (পৃঃ ১৫৯) এই পাঠ পাওয়া যায় (এর আকর অজ্ঞাত হলেও পাঠটি মূল্যবান্),

নমুয়া-বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুনিম শশী ॥
অপরুপ রূপ রমণি-মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজগমনি ধনি ॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনি।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি ॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর ॥
কবিরঞ্জন ভণে অশেষ অনুমানি।
রাএ নসরৎ সাহ ভুলল কমলা বাণী ॥

(গ) 'পদকল্পতরু' তে (পদসংখ্যা ১৯৭) পদটির এই পাঠ পাওয়া যায়,

নমুঙা বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূণিম শশী ॥
অপরূপ রূপ রমণি-মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজগমনি ধনি ॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনি।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি ॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর-গর অন্তর ॥

* লোচন পদটিকে কবিশেখরের ভনিতাযুক্ত অবস্থায় সংকলন করেও পদটিকে বিদ্যাপতির রচনা ("ইতি বিদ্যাপতেঃ") বলে নির্দিষ্ট করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, পদটির ভনিতার পাঠান্তরে যে বিদ্যাপতির নাম পাওয়া যায়, তা লোচন জানতেন। কিন্তু এর থেকেও প্রমাণিত হয় না যে পদটি মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা, কারণ মৈথিল বিদ্যাপতির পদ যেমন বাংলায় এসেছে, তেমনি বাঙালী বিদ্যাপতির পদও অনায়াসেই মিথিলায় গিয়ে থাকতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩১৩ নং পুথিতে পদটির * আর একটি পাঠ পাওয়া গিয়েছিল। এই পাঠ এ' পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি, তবে ডঃ শহীদুল্লাহ্-এর ভনিতাটি প্রকাশ করেছেন (সা. প. প. ১৩৬০, পৃঃ ৫০, পাদটীকা দ্রঃ)। সেটি এই,

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমল বাণী ॥

একই পদের বিভিন্ন পাঠে 'কবিশেখর, 'কবিরঞ্জন' ও 'বিদ্যাপতি' ভনিতা পাওয়া যাওয়াতে প্রমাণ হচ্ছে যে এই তিনটি নাম একই লোকের। এই 'বিদ্যাপতি' মৈথিল হতে পারেন না, কারণ শেষ তিনটি পাঠে বাংলা ভাষার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, অনেক গবেষক একটি পদের বিভিন্ন পাঠ পেলে সব সময়েই মনে করেন যে গায়েন ও লিপিকরদের হস্তক্ষেপের ফলে পাঠের বিভিন্নতা সৃষ্ট হয়েছে; কিন্তু কবি নিজেও যে বিভিন্ন সময়ে একই পদকে বিভিন্ন রূপ দিতে পারেন, তা এঁদের মাথায় ঢোকে না। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তিনি তাঁর অনেক গানের বারবার পরিবর্তন সাধন করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছেন। মধ্যযুগে লেখা ছাপা হত না বলে কবিদের একটি পদের মূল রূপকে সারাজীবন একভাবে

---

* অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য' গ্রন্থের ২৪ সংখ্যক পদটি আলোচ্য পদেরই একটি পাঠান্তর। সেটি এই,

অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি
চলি ত পেখল গজ-রাজ-গমনি ধনি ধনি।
কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন ভালে
ভোমরা ভুলল বিমল কমল দলে ॥
গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাঝাখানি।
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি ॥
সুন্দরী চান্দ মুখে বচন বোলসি হাসি
অমিয়া বরিখে যৈসে শারদ পুর্ণিমা শশী ॥
শেখ কবীরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে
সুলতান নাসির সাহা ভুলিছে কমলবনে ॥

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভনিতায় উল্লিখিত কবির নাম 'শেখ কবীর' 'কবিশেখর'-এর বিকৃত রূপ। যতদূর মনে হয়, ভনিতায় প্রথমে 'কবিশেখর' 'কবিরশেখ'-এ পরিবর্তিত হয়েছে এবং আবার পরে 'শেখ কবির (কবীর)'-এ পরিণত হয়েছে।

রাখবার সুযোগ ও অনুপ্রেরণা এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কবিশেখর বা কবিরঞ্জন বা বাঙালী বিদ্যাপতি একটি পদকেই নানা সময় নানা রূপ দিয়েছেন এবং এক একবার তাঁর এক একটি উপাধিকে ভনিতায় বসিয়ে দিয়েছেন। যে সুলতানের পৃষ্ঠপোষণ তিনি পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি দু'টি পাঠে "রাএ নসরৎ (নসরদ) শাহ" বলেছেন এবং একটি পাঠে "সুলতান শাহ নসীর" বলেছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, এই সুলতান দিল্লী বা আর কোন জায়গার সুলতান * নন, ইনি বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ)। ঐ কবি যে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের সমসাময়িক ছিলেন, তা অন্য প্রমাণ থেকেও বলা যায়। রামগোপাল দাস তাঁর 'রসকল্পবল্লী'তে লিখেছেন,

যশরাজ খান দামোদর মহাকবি। কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী॥

এর থেকে জানা যায়, যশরাজ খান, দামোদর ও কবিরঞ্জন তিন জনেই রাজদরবারে কাজ করতেন। যশরাজ খানের "এক পয়োধর চন্দন লেপিত" পদের ভনিতায় "শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ" এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) দরবারে কাজ করতেন বলে মনে হয়। দামোদর গোবিন্দদাসের মাতামহ, সুতরাং তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক এবং তিনিও সম্ভবত হোসেন শাহেরই কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং উদ্ধৃত তালিকায় উল্লিখিত তৃতীয় কবি কবিরঞ্জনও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক ও হোসেন শাহী বংশের সুলতানদের অধীনস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। এই ধারনার সমর্থন পাচ্ছি 'বিদ্যাপতি' ভনিতাযুক্ত কয়েকটি পদের ভনিতা থেকে। ভনিতাগুলি নীচে উদ্ধৃত করছি,

(১) সাহ হুসেন অনুমানে।
পঞ্চগৌড়েশ্বর জানে॥
চিরজীবী হউ পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

(২) সে যে নশিরা শাহ সে জানে।
যারে হানল মদন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

* 'রাগতরঙ্গিণী'তে সঙ্কলিত পূর্বোক্ত 'আনন লোনুঅ বচনে বোলএ হঁসি' পদটিকে যাঁরা মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা বলে মনে করেন, তাঁরা এর ভনিতায় উল্লিখিত 'নসরৎ শাহ'কে দিল্লীর অপদার্থ সুলতান নসরৎ শাহ (১৩৯৫-৯৯ খ্রীঃ) বলে মনে করেন। এই মত আমরা উপরে খণ্ডন করেছি।

(৩) বেকতও চোরি গুপুত কয় কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি (যুগপতি) চিয়ে জীবে জীংথু গ্যাসদীন সুরতান ॥*

এই কয়েকটি ভনিতাকে অনেকে মৈথিল বিদ্যাপতির বলে মনে করেন। তাঁদের মতে এই ভনিতাগুলিতে উল্লিখিত 'গ্যাসদীন সুরতান' বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০ খ্রীঃ) বা দিল্লীর সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন তোগলক (১৩৯৩ খ্রীঃ); 'শাহ নসীর' ও 'নশিরা শাহ' বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ (? ১৪৩৬-১৪৫৯ খ্রীঃ), এবং 'সাহ হুসেন' জৌনপুরের সুলতান হোসেন (হুসেন) শাহ (সিংহাসনে আরোহণ ১৪৫৮ খ্রীঃ)। কিন্তু এই মতের ভিত্তি দৃঢ় নয়। মৈথিল বিদ্যাপতি তাঁর পদের ভনিতায় ভিন্ন দেশের সুলতানদের প্রশস্তি করবেন কেন, তার কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। পদগুলি বাঙালী বিদ্যাপতি বা কবিরঞ্জনেরই রচনা এবং উদ্ধৃত ভনিতাগুলিতে উল্লিখিত 'সাহ হুসেন' বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন (হুসেন) শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী), 'নশিরা শাহ', 'শাহ নসীর' ও 'নসরৎ শাহ' তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ এবং 'গ্যাসদীন সুরতান' হোসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহমূদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীঃ)।

সুতরাং আমরা এখন বলতে পারি, রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন বা কবিশেখর বা বাঙালী বিদ্যাপতি হোসেন শাহী বংশের সুলতানদের অধীনে কাজ করতেন।

এই কবি কিন্তু পূর্বোক্ত রায়শেখর-কবিশেখরের সঙ্গে অভিন্ন নন; কারণ যে কবি হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন, তিনিই বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দ প্রবেশ করার পরেও সাহিত্যসাধনা চালিয়ে গিয়েছেন বলে ভাবা যায় না। তা ছাড়া

* এটি লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে ধৃত এবং খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'র ৯ নং পদের ভনিতা।

(১) নং ও (২) নং ভনিতা যে পদ দু'টিতে পাওয়া যায়—সে দু'টি পদ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র একটি প্রাচীন পুথিতে (লিপিকাল ১৬৮৬ শকাব্দ ও ১১৭১ সন অর্থাৎ ১৭৬৪-৬৫ খ্রীঃ) পরপর উদ্ধৃত হয়েছে (সাধনা, ১৩০০, পৃঃ ২৬৯-২৭৫ দ্রঃ)। এরা মূলত একই পদ, এদের ভাষাগত পার্থক্য সামান্য, তবে দুটি পদের চরণগুলির ক্রম ভিন্ন ধরণের। যতদূর মনে হয়, কবি হোসেন শাহের রাজত্বকালে ভনিতায় হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করে মূল পদটি লেখেন এবং নসরৎ শাহের রাজত্বকালে সেই পদটির ভাষা ও চরণবিন্যাসরীতির কিছু পরিবর্তন করে ভনিতায় 'নশিরা শাহ' অর্থাৎ নসরৎ শাহের নাম বসান। শ্রীকর নন্দীও এই একই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন বলে আমরা ইতিপূর্বে অনুমান করেছি (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৯, পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

রায়শেখর-কবিশেখরের প্রকৃত নাম ছিল দৈবকীনন্দন সিংহ, আর এই কবিরঞ্জন-কবিশেখরের প্রকৃত নাম যে 'রঞ্জন' ছিল তা 'রামগোপাল দাসের' 'শাখানির্ণয়'-এ এই কবির উল্লেখ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত এই সংস্কৃত শ্লোকটি থেকে প্রমাণিত হয়,

গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্‌বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবিকালিদাসঃ।
রূপেষু নির্ভৎসিতপঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্বকলানিধানঃ॥

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী', পৃঃ ২১৮ দ্রষ্টব্য)

সুতরাং আমরা আলোচনা করে দু'জন কবির সন্ধান পেলাম। দু'জনেরই 'কবিশেখর' উপাধি ছিল, দু'জনেই পদের ভনিতায় ঐ উপাধি ব্যবহার করেছেন এবং দু'জনেই শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য। কিন্তু দু'জন স্বতন্ত্র কবি। এঁদের মধ্যে একজনের প্রকৃত নাম রঞ্জন; কবিত্বের জন্য তিনি 'কবি রঞ্জন' নামে পরিচিত ছিলেন; 'কবিশেখর'-ও এঁর উপাধি ছিল; পদ রচনায় দক্ষতার জন্য ইনি "ছোট বিদ্যাপতি" বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; তাই 'বিদ্যাপতি' ভনিতাতেও ইনি পদ রচনা করতেন। ইনি ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইনি গৌড়-সুলতানের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল ধরে হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ ও গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ প্রভৃতি সুলতানের অধীনে চাকরী করেন। এঁদের রাজত্বকালে তিনি অনেক পদও রচনা করেন। ইনি পরে রঘুনন্দনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রঘুনন্দন এঁর সমবয়সী বা বয়সে ছোট ছিলেন বলে মনে হয়। মোটের উপর ইনি যে রঘুনন্দনের গোড়ার দিক্‌কার শিষ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অপর কবির প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। এঁরও 'কবিশেখর' উপাধি ছিল এবং ইনি 'কবিশেখর', 'শেখর' ও 'রায়শেখর' ভনিতাতেও পদ লিখতেন। ইনি রঘুনন্দনের শেষ দিক্‌কার শিষ্য; রঘুনন্দনের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। ইনি 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী', 'গোপালের কীর্ত্তন-অমৃত' (এ দু'টি এক বই বলে মনে হয়), 'গোপীনাথবিজয় নাটক', 'গোপালবিজয় কাব্য' ও বহু বিচ্ছিন্ন বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। ইনি যখন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দ চালু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ইনি ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে পদ ও গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

ইতিপূর্বে আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬০ নং পুথির 'শাকে গজাব্ধিশরচন্দ্র' (১৫৪৮ শক=১৬২৬-২৭ খ্রীঃ) তারিখযুক্ত যে "আদর্শ পুথি"র উল্লেখ করেছি—সেটি কবিশেখরের সমসাময়িক পুথি বলে মনে করি। "শ্রীকবিশেখরমুখপদ্মনির্গত শ্রীগোপালবিজয় সম্পূর্ণ শাকে গজাব্ধিশরচন্দ্রমিতে মুকুন্দযশঃপ্রদেন শ্রীনরোত্তম-নন্দীলিখিত"—এর সোজা মানে কবিশেখরের মুখপদ্মের কথা শুনে (অর্থাৎ তাঁর dictation অনুযায়ী) নরোত্তম নন্দী ১৫৪৮ শকাব্দে পুথিটি লিখলেন। শিবরতন মিত্র 'গোপালবিজয়'-এর ১৫৩৫ শকাব্দের (১৬১৩-১৪ খ্রীঃ) যে পুথিটির উল্লেখ করেছেন, সেটি সম্ভবত আর একটি সমসাময়িক পুথি, তবে শিবরতন মিত্র ঐ পুথির তারিখ ঠিকমত পড়তে পেরেছিলেন কিনা, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'গোপালবিজয়'-এর রচনাকালই ১৫৪৮ শকাব্দ বলে আমাদের ধারণা।

অতএব দৈবকীনন্দন সিংহ ওরফে কবিশেখর আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং অন্তত ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

রঞ্জন-কবিশেখরের পদের সঙ্গে দৈবকীনন্দন-কবিশেখরের পদ এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেগুলি পৃথক করা অত্যন্ত দুরূহ। 'কবিরঞ্জন' ভনিতাযুক্ত পদগুলি ও 'বিদ্যাপতি'-ভনিতাযুক্ত পদগুলি (মৈথিল বিদ্যাপতির পদ বা জাল পদ না হলে) রঞ্জন-কবিশেখরের লেখা। তেম্‌নি, 'শেখর' ও 'রায়শেখর' ভনিতাযুক্ত পদগুলি দৈবকীনন্দন-কবিশেখরের লেখা। কিন্তু 'কবিশেখর' ভনিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে এ দের দু'জনেরই লেখা রয়েছে এবং কোন্ পদটি কার রচনা, তা বলা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

এই দুই কবিকে রামগোপাল দাস দুই স্বতন্ত্র উপায়ে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। প্রথম জনের আসল নামের সঙ্গে 'কবি' বিশেষণ যোগ করে তিনি 'কবিরঞ্জন' লিখেছেন এবং দ্বিতীয় জনের প্রকৃত নাম উল্লেখ না করে তিনি তাঁর 'কবিশেখর রায়' উপাধি উল্লেখ করে পরিচয় দিয়েছেন। তার ফলে দুই কবির নাম ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণয়' ও 'রসকল্পবল্লী' কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছাপা হয় নি—হলে বিভ্রান্তি এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হত না। রামগোপাল দাস যে সংস্কৃত গ্রন্থটি থেকে "গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্‌বিলাসঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—সেটি একটি মূল্যবান সূত্র। গ্রন্থটি পাওয়া গেলে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক নতুন আলোক পাত হতে পারে।

॥ বার ॥

'কালিকামঙ্গল'-এর প্রথম তিন কবি

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন "এই দেশ বিশেষভাবে কালীমাতার অধিকারভুক্ত" বলেছেন। 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে এই কালীমাতার মহিমা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাব্য হওয়া সত্ত্বেও 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের সংখ্যা অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যের তুলনায় অনেক কম। আরও আশ্চর্যের বিষয়, 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনী প্রধান স্থান অধিকার করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজশেখর সূরী, বররুচি প্রভৃতি লেখকেরা বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, তার সঙ্গে কালীদেবীর কোন সম্পর্ক নেই। বাংলার 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে বলা হয়েছে যে সুন্দরের উপাস্যা দেবী কালী এবং তিনি সুন্দরকে প্রাণদণ্ড থেকে রক্ষা করেছিলেন। এইভাবে কালীর মাহাত্ম্যের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের প্রেম-কাহিনী এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছে।

'কালিকামঙ্গল' কাব্যের প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ। এঁর কাব্যের একটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে এবং সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ "নসির সাহা" অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র যুবরাজ "পেরোজ সাহা" অর্থাৎ ফিরোজ শাহের আদেশে এই কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের কয়েক জায়গায় ফিরোজ শাহকে রাজা বলা হয়েছে, কিন্তু তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে "ফিরোজ শাহ পিতার রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২ খৃঃ) দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকে দিয়ে কালিকামঙ্গল রচনা শুরু করিয়েছিলেন এবং তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পর কাব্যরচনা সমাপ্ত হয়।" কারণ শ্রীধরের কাব্যে অধিকাংশ স্থানেই ফিরোজকে "যুবরাজ" বলা হয়েছে, এক জায়গায় "রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজন" বলে অব্যবহিত পরেই "ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ" বলা হয়েছে। "রাজা" উপাধির প্রয়োগ করা হয়েছে শুধু স্তুতি করার উদ্দেশ্যে।

আর একজন প্রাচীন 'কালিকামঙ্গল'-রচয়িতা সাবিরিদ খান বা সা বরিদ খান। এঁরও কাব্যের খণ্ডিত একটি পুথি পাওয়া গিয়েছে এবং সেটি 'সাহিত্য পত্রিকা'র পূর্বোক্ত সংখ্যাতেই মুদ্রিত হয়েছে। এই কাব্যের ভাষা বেশ প্রাচীন, তবে এর অধিকাংশ

স্থানেই দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের ভাষার সঙ্গে আক্ষরিক মিল দেখা যায়। এর থেকে বোঝা যায়, সাবিরিদ খান দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের কিছু পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং শ্রীধরের কাব্যকে অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন। দ্বিজ শ্রীধর সাবিরিদ খানকে অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন বলেও কেউ কেউ তর্ক তুলতে পারেন। কিন্তু এই তর্ক নিষ্ফল। কারণ দ্বিজ শ্রীধর হিন্দু কবি, সুতরাং কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কাব্য রচনার প্রথম প্রেরণা পাবার কথা তাঁরই, সাবিরিদ খানের নয়। তারপর ইতিপূর্বে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল; দ্বিজ শ্রীধরই তার পরিচয় পেতে পারেন, সাবিরিদ খান নয়; সে যুগে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে সংস্কৃত চর্চার রেওয়াজ ছিল না। অতএব দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকেই 'কালিকামঙ্গল'-এর আদি রচয়িতা এবং সাবিরিদ খানকে অনুকারী বলে স্বীকার করতে হয়। সাবিরিদ খানের ভনিতাযুক্ত 'রসুলবিজয়' এবং 'মোহাম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী' (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত নাম) কাব্যেরও খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়েছে।

এক সাবিরিদ খানের লেখা চট্টগ্রামের কুলীন বংশাবলীর একটি 'পদবন্ধ' পাওয়া গিয়েছে; বিভিন্ন পরোক্ষ প্রমাণ থেকে মনে হয় এই সাবিরিদ খানই বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা। ডঃ আহমদ শরীফ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে "১৫১৭ খৃষ্টাব্দের পরে এবং ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনও সময়ে এই ছড়া রচিত হয়েছিল।" ডঃ শরীফের এই সিদ্ধান্ত এবং সাবিরিদ খানের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে দ্বিজ শ্রীধরের কাব্যের প্রভাব—এই দুই বিষয় থেকে ধরা যায় যে, সাবিরিদ খান ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেছিলেন। তবে সাবিরিদ খান যে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক হতে পারেন না, তাও জোর করে বলা যায় না। সাবিরিদ খানের ভনিতাযুক্ত 'রসুল-বিজয়' যদি এই সাবিরিদ খানের লেখা হয়, তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই রসুলবিষয়ক বাংলা কাব্যের আদি রচয়িতা সৈয়দ সুলতানের (পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য) পরবর্তী কবি।

পরবর্তী 'কালিকামঙ্গল'-রচয়িতার নাম গোবিন্দদাস। এঁর 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের একটি পুথি পাওয়া গিয়েছে, তবে সেটি সম্পূর্ণ। দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান এবং গোবিন্দদাস তিন জনেরই 'কালিকামঙ্গল'-এর পুথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত এঁরা সকলেই চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন। তান্ত্রিক সাধকদের প্রধান কেন্দ্র রাঢ় দেশ থেকে বহু দূরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের প্রথম সূচনা হল—এটি সত্যই বিস্ময়ের বিষয়।

গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল'-এর পুথির (এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি, নং A-21) শেষে এই রচনাকাল-নির্দেশক শ্লোক পাওয়া যায়,

মুনি মক্ষর বাণ শশী সকল পরিমিত।
এই কালে রচিল কালীকা চণ্ডীর গীত ॥

মুনি = ৭ ; কেউ কেউ মক্ষর = অক্ষর = ব্রহ্ম = ১ ধরেন, কিন্তু এই গণনা কষ্টকল্পনার পর্যায়ে পড়ে। মক্ষর = পক্ষ ধরাই যুক্তিযুক্ত ; তা ধরলে ছন্দও ঠিক থাকে ; 'অক্ষর' ধরলে শ্লোকটির ছন্দোপতন ঘটে। পক্ষ = ২। বাণ = ৫, শশী = ১। 'সকল' 'শক' শব্দের বিকৃত রূপ। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাব্যটির রচনাকাল ১৫২৭ শকাব্দ বা ১৬০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

॥ তের ॥

গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমানন্দ গুপ্ত ও গোপাল বসু

জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখেছেন,

> গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
> সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি॥
> সংক্ষেপে করিলে অতি পরমানন্দ গুপ্ত।
> গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
> গোপাল বসু করিলেন গীতভপ্রবন্ধে।
> চৈতন্যমঙ্গল তারা চামর বিছন্দে॥

গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমানন্দ গুপ্ত এবং গোপাল বসু—তিন জনেই চৈতন্যচরিত অবলম্বনে "গীত" অর্থাৎ কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জয়ানন্দের উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে। এঁদের কারও বই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এঁরা তিন জনেই জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার আগে বই লিখেছিলেন। সুতরাং এঁদের গ্রন্থরচনাকালের অধস্তন সীমা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এঁরা সকলেই যে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

এঁদের মধ্যে গৌরীদাস পণ্ডিত সুপরিচিত ব্যক্তি। ইনি নিত্যানন্দের শ্বশুর সূর্যদাস সরখেলের ছোট ভাই। এঁর নিবাস ছিল অম্বিকা কালনায়। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর মতে এঁর আদি বাড়ি ছিল বর্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত শালিগ্রামে।

গোপাল বসু সম্বন্ধে এতদিন আমাদের কিছুই জানা ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি আমি ব্রজমোহন দাসের 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৭৩ নং পুথি, পৃঃ ৬ ক) এই ছত্র দু'টি পেয়েছি,

> রামানন্দ বসু জন্ম কুলিনগ্রামেতে।
> গোপাল বসুর জন্ম হইল তথাতে॥

সুতরাং গোপাল বসু মালাধর বসুর গ্রাম কুলীনগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। রামানন্দ বসু মালাধর বসুর বংশধর। গোপাল বসুও কি তা'ই? অন্ততপক্ষে মালাধর বসুর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল বলে মনে করলে অসঙ্গত হবে না।

পরমানন্দ গুপ্তের পরিচয় বা দেশ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছু জানা যায় নি।

॥ চৌদ্দ ॥

বৃন্দাবন দাস

বৃন্দাবন দাস সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় চৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে'র কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য এই গ্রন্থ বাঙালীর এক অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য। প্রথমত, এত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ আর একটিও পাওয়া যায় না, যার প্রায় ষোল আনা অংশই বিশুদ্ধ ও অবিকৃত আকারে আমাদের হাতে পৌঁছেছে; এপর্যন্ত 'চৈতন্যভাগবতে'র শত শত পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে পাঠভেদ খুবই অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয়ত, এইটিই সর্বপ্রথম বাংলা গ্রন্থ, যাতে দেবদেবী বা পৌরাণিক চরিত্রের বদলে একজন মানুষের জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ (যেমন ডঃ সুকুমার সেন) বাঙালী কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দেখেছেন; তাঁদের এই মত অবশ্য আমরা সমর্থন করতে পারি না। বৃন্দাবন দাস ও তাঁর অনুবর্তী চরিতকারর। চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান বলেই জানতেন। কাজেই যে মনোভাব নিয়ে বাঙালী কবিরা শ্রীকৃষ্ণ, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, তার সঙ্গে এই সব চরিতকারদের মনোভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য আমি দেখি না। মানুষ শ্রীচৈতন্যের জীবনকে যে এঁরা বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা করেছেন, তার কারণ এঁদের বাস্তবনিষ্ঠতা নয়, ভগবানের অন্যান্য লীলার মত নরলীলাকেও অবিকলভাবে চিত্রিত করবার অভিলাষ।

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এর মধ্যে তদানীন্তন সমাজের বিশদ ও অবিকল প্রতিফলন। সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে এত অজস্র তথ্য এর পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে যে একবার চোখ বুলোলেও বহু বিষয় জানা যায়। ছোটখাট দু'একটি উক্তির মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন দাস কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা ভাবতে অবাক লাগে। এর একটি দৃষ্টান্ত দিই। 'চৈতন্যভাগবত' মধ্যখণ্ডের ২৩শ ও ২৪শ অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, "অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে গদাধর। সে পাপিষ্ঠ নহে কভু অদ্বৈতকিঙ্কর॥" এর থেকে আমরা জানতে পারি, সে সময় চৈতন্যদেবের অনুবর্তী বৈষ্ণবসম্প্রদায় নানা দলে বিভক্ত হয়েছিল; অদ্বৈতের একদল ভক্ত গদাধরের নিন্দা করতেন এবং তাতে অদ্বৈতের প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছিল না।

বৃন্দাবন দাস স্পষ্টভাবে 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল জানান নি। সুতরাং বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে আমরা এই বইয়ের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

শ্রীচৈতন্যদেব গয়া থেকে ফেরার পরে যে সময় নবদ্বীপে লীলাকীর্তনাদি করছিলেন, তখন অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের জননী নারায়ণী তাঁর কৃপা লাভ করেন। বৃন্দাবন দাস নিজে বলেছেন যে নারায়ণীর বয়স ঐ সময় ছিল চার বছর* ("চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত") সুতরাং ১৫০৫ বা ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণীর জন্ম হয়। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর জন্ম ধরলে ও নারায়ণীর মাত্র ১৩ বছর বয়সের সময় বৃন্দাবন দাসের জন্ম ধরলে, তাঁর জন্মকাল হয় ১৫১৮ খ্রীঃ। আর বৃন্দাবনদাস মাত্র ২০ বছর বয়সে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছিলেন ধরলেও 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল হয় ১৫৩৮খ্রীঃ। এইটিই 'চৈতন্যভাগবত'-এর রচনাকালের উধ্বতম সীমা।

কেউ কেউ মনে করেন মহাপ্রভুর জীবৎকালেই 'চৈতন্যভাগবত' সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর মৃত্যুর সময়ে বৃন্দাবনদাসের বয়স কোন মতেই ১৫ বছরের বেশি হয় না। তাছাড়া বৃন্দাবন দাস গ্রন্থের সুরুতে চৈতন্য লীলার সূত্র বর্ণন প্রসঙ্গে লিখেছেন যে মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে যান। সেখান থেকে নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন,

শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়। ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায়॥

ভ্রমণপর্ব শেষ হলে,

শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন। অহর্নিশ করিলেন হরি সঙ্কীর্ত্তন॥

শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর। নীলাচলে বাস অষ্টাদশ সম্বৎসর॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে, সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু ছ' বছর তীর্থভ্রমণ করে ১৮ বছর নীলাচলে বাস করেন এবং তার পর লীলাসংবরণ করেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্টভাবে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত না হলেও পরোক্ষভাবে হয়েছে। [এই বিষয়টির দিকে আমরাই সর্বপ্রথম 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' (১৯৫৮) গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৭-৭৮) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।]

শুধু তাই নয়, 'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি, চৈতন্যদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলছেন,

যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সঙ্গোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর॥

* চার বছর মানে বাংলা রীতি অনুযায়ী জীবনের চতুর্থ বর্ষ। নারায়ণী যদি ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা'হলে তাঁর চতুর্থ বর্ষের শেষ দিক্ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে পড়বে; যদি ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা'হলে চতুর্থ বর্ষের প্রথম দিক্ ১৫০৯-এ পড়বে।

যতেক দিবস মুঞি থাকোঁ পৃথিবীতে।
তাবত নিষেধ কৈলুঁ কাহারে কহিতে॥

অথচ বৃন্দাবন দাস সার্বভৌমের অভিজ্ঞতার—সার্বভৌম চৈতন্যদেবের যে প্রকাশ দেখেছিলেন—তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, ইতিমধ্যে চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে গিয়েছে এবং সার্বভৌমও তাঁর অভিজ্ঞতার কথা সকলের কাছে প্রচার করেছেন।

উপরে উল্লিখিত তিনটি কারণের জন্য চৈতন্যদেবের জীবৎকালে 'চৈতন্যভাগবত' রচিত হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না।

চৈতন্যভাগবত রচিত হবার সময়ে নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। 'চৈতন্যভাগবতে'র কয়েকটি উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, নিত্যানন্দ ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন না। উক্তিগুলি নীচে উদ্ধৃত করছি।

(১) জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও* তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয়॥ (আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়)

(২) জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি॥ (অন্ত্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়)

(৩) নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার॥
হেন দিন হইব কি চৈতন্য নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ সঙ্গে একঠাঁই॥ (মধ্যখণ্ড, দ্বাবিংশ অধ্যায়)

যাহোক্, 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল নির্ণয়ের পক্ষে এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ ঠিক্ কোন্ সময়ে নিত্যানন্দ পরলোকগমন করেন, তা জানা নেই।

'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকালের ঊর্ধ্বতম সীমা আমরা নির্ধারণ করলাম। অধস্তম সীমা নির্ধারণ করা যায় জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র রচনাকাল থেকে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে,

* "দিলাও নিলাও"-এর অর্থ—'তুমি দিলে, আবার নিয়েও নিলে'।

আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি। বৃন্দাবন দাস প্রচারিলা সর্ব্বোপরি ॥*

এখানে "সর্বোপরি" কথাটি লক্ষ্য করবার মত। চৈতন্যভাগবত রচনার পর অন্তত ১০ বছর অতিবাহিত না হলে এইভাবে অপর কবির সশ্রদ্ধ উল্লেখ লাভ তার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। 'চৈতন্যভাগবতে' নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু জয়ানন্দ 'বীরভদ্র গোসাঞিির প্রসাদমালা পাঞা" গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর থেকে মনে করা যেতে পারে, চৈতন্যভাগবত রচনার সময় বীরভদ্র বালক ছিলেন, কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থরচনার সময় তিনি পূর্ণবয়স্ক। এই হিসাবে দুই গ্রন্থের রচনার মধ্যে অন্তত ১০ বছর ব্যবধান না ধরে উপায় নেই।

এ সম্বন্ধে আরও দু'টি প্রমাণ আছে। প্রথমত, 'চৈতন্যভাগবত'-এর মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায় রচনার সময়ে অদ্বৈত জীবিত ছিলেন ; এর প্রমাণ ঐ অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাসের এই উক্তি,

> এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
> বোলায় 'অদ্বৈতভক্ত'—চৈতন্য নিন্দিয়া॥
> না বোলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
> না ধরে বৈষ্ণববাক্য মরে ভাল মনে॥
> ... ...
> চৈতন্য স্মরণ করি আচার্য্য গোসাঞি (অদ্বৈত)।
> নিরবধি কান্দে আর কিছু স্মৃতি নাঞি॥

* শুধু এই উল্লেখ থেকে নয়, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেও প্রামাণিত হয় যে, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ঐ বইয়ের আগেই রচিত হয়েছিল এবং জয়ানন্দ 'চৈতন্যভাগবত' পড়েছিলেন। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে'র প্রথম আটটি খণ্ডে চৈতন্যদেবের জীবনচরিত বর্ণনা করে সর্বশেষ উত্তরখণ্ডে চৈতন্যজীবনীর সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করেছেন ; এই সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে তিনি এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি মুরারি গুপ্ত বা কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে অথবা জয়ানন্দের গ্রন্থের প্রথম আট খণ্ডে আদৌ উল্লিখিত হয় নি কেবল 'চৈতন্যভাগবতে' তাদের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়—যেমন তৈর্থিক ব্রাহ্মণের কাহিনী, জগদীশ-হিরণ্যর ঘরে শিশু নিমাইয়ের নৈবেদ্য খাওয়া, চৈতন্যদেবের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করা, শ্রীবাসের গৃহে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ ও সাতপ্রহরিয়া ভাবাবেশ, শ্রীবাসের মৃত পুত্রকে দিয়ে কথা বলানো, নিত্যানন্দের সঙ্গে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে যাওয়া, নারায়ণীকে দিয়ে কৃষ্ণনাম করানো প্রভৃতি।

অদ্বৈত এর পরেও জীবিত ছিলেন। তার প্রমাণ অন্ত্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ের এই উক্তি,

একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন—তেন চৈতন্য অদ্বৈত ॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়।
জগতের ত্রাণ লাগি কৃপালুহৃদয় ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবারে শক্তি যার।
জানিহ ঈশ্বরসঙ্গে ভেদ নাহি তার ॥

কিন্তু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' যখন লেখা হয়, তার বেশ কিছুকাল আগেই অদ্বৈত পরলোকগমন করেছেন। সুতরাং এ' দিক দিয়েও বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র রচনাকালের অন্তত দশ বছর ব্যবধান ধরা যুক্তিযুক্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, 'চৈতন্যভাগবতে' নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র গোস্বামীর কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত বীরভদ্র ঐ সময়ে কোন গুরুত্ব অর্জন করেন নি, তাই বৃন্দাবন দাস তাঁর উল্লেখ করেন নি। কিন্তু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার সময় বীরভদ্র পূর্ণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত; জয়ানন্দ "বীরভদ্র গোস্বামীর প্রসাদমালা পাঞা' 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন। সুতরাং বৃন্দাবন দাস ও জয়ানন্দের গ্রন্থ রচনার মধ্যে অন্তত দশ বছর কাল ব্যবধান ধরা ঐ দিক দিয়েও অযৌক্তিক হয় না।

জয়ানন্দ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা দেখাব যে তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর রচনাকালের নিম্নতম সীমা ১৫৬০ খ্রীঃ। সুতরাং 'চৈতন্যভাগবত'-এর রচনাকালের নিম্নতম সীমা ১৫৫০ খ্রীঃ। অতএব ১৫৩৮ থেকে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। ঐ সময় তাঁর বয়স ২০ থেকে ৩২-এর মধ্যে ছিল। 'চৈতন্যভাগবত' যে যুবকের রচনা, তা বইটির বর্ণনা থেকেও বোঝা যায়।

'চৈতন্যভাগবতে'র আকস্মিক পরিসমাপ্তি থেকে মনে হয় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নি। অম্বিকানাথ ব্রহ্মচারী "চৈতন্যভাগবতের অবশিষ্ট অধ্যায়ত্রয়" নাম দিয়ে যা প্রকাশ করেছিলেন, তা যে বৃন্দাবনদাসের লেখা নয়, তা বিশেষজ্ঞেরা প্রমাণ করেছেন। অম্বিকানাথ এক পুথিতে চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল নির্দেশক এই শ্লোকটি দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন,

চৌদ্দশত সাতানব্বই শকের গণন। নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হইল সমাপন॥

কিন্তু ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে বৃন্দাবন দাসকে 'বেদব্যাস' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'চৈতন্যভাগবত' রচনার জন্যই বৃন্দাবন দাস বেদব্যাসের মর্যাদা লাভ করেছেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যদি 'চৈতন্যভাগবত' রচিত হয়, তাহলে বলতে হবে 'চৈতন্য ভাগবত' লেখা হতে না হতেই বৃন্দাবন দাস 'বেদব্যাস' আখ্যা লাভ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনা ছাড়া বৃন্দাবন দাসের এই উপাধি লাভের আর কোন কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী কর্তৃক উদ্ধৃত রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি যে 'চৈতন্যভাগবতে'র শেষে থাকতে পারে না, তা সহজেই বোঝা যায়। চৈতন্যভাগবত অসমাপ্ত গ্রন্থ, সুতরাং বৃন্দাবন দাস 'গ্রন্থ হৈল সমাপন' লিখতে পারেন না; অম্বিকাচরণ প্রকাশিত 'চৈতন্যভাগবতে'র অতিরিক্ত তিনটি অধ্যায়ের মত তাঁর আবিষ্কৃত রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটিও অন্য লোকের কল্পনার সৃষ্টি, বৃন্দাবন দাসের রচনা নয়;

বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে জানা যায় যে—তিনি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর * পুত্র ছিলেন। নিত্যানন্দ ছিলেন বৃন্দাবন দাসের গুরু, বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের কাছে ভাগবতও পড়েছিলেন, তিনি লিখেছেন,

নিত্যানন্দ ঠাকুরের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত॥

বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের আজ্ঞাতেই চৈতন্যজীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু 'চৈতন্যভাগবত'-এর রচনা সুরু হবার আগেই সম্ভবত নিত্যানন্দ পরলোকগমন করেছিলেন, কারণ এই গ্রন্থের আদিখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিত্যানন্দের তিরোধানের স্পষ্ট উল্লেখ আছে (আগে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে আর কোন তথ্য জানা যায় না। তবে তিনি যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তা 'চৈতন্যভাগবত'-এ প্রদত্ত গানগুলির শীর্ষকে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থেকে বোঝা যায়।

মুরারি গুপ্তের কড়চার মুদ্রিত সংস্করণে চার বছর বয়সী নারায়ণীর (বৃন্দাবন দাসের মা) বর্ণনা দেবার সময়ে নারায়ণীকে "অভর্তৃকা" (বিধবা) বলা হয়েছে। উদ্ধবদাস নামে একজন পদকর্তা নারায়ণীকে "শৈশবে বিধবা" বলেছেন। এর থেকে

* বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত 'চৈতন্য-পরিকর' বইয়ের লেখক বৃন্দাবন দাসের মা নারায়ণীর সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে জয়ানন্দ-বর্ণিত চৈতন্যদেবের ধাত্রীমাতা নারায়ণীকে টেনে এনেছেন —এ অত্যন্ত হাস্যকর।

কোন কোন গবেষক অনুমান করেছেন, বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর বৈধব্য অবস্থায় জাত অবৈধ পুত্র। বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ তাঁদের অনুমানকে সমর্থন করে। অবশ্য মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি প্রক্ষিপ্ত হতে পারে এবং অর্বাচীন উদ্ধবদাসের লেখা পদ ও প্রবাদের সাক্ষ্য সত্য না হতেও পারে। কাজেই এ' সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে, এ কথাও ঠিক যে, বৃন্দাবন দাস তাঁর পিতার নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি।

বৃন্দাবন দাসের লেখা চৈতন্যজীবনীর মূল নাম কী ছিল, তা বলা কঠিন। বৃন্দাবন দাস নিজে এর কোন নাম উল্লেখ করেন নি। পরবর্তী চরিতকারদের মধ্যে জয়ানন্দ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে বলেছেন "আদিখণ্ড-মধ্যখণ্ড-অন্ত্যখণ্ড"; লোচনদাস বলেছেন "ভাগবত" ("জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে") এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন "চৈতন্যমঙ্গল"। সম্ভবত বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থের কোন নাম দিয়ে যান নি; বৈষ্ণবদের মধ্যে যখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বৃন্দাবন দাস পূর্বজন্মে বেদব্যাস ছিলেন—তখন তাঁরা লোচন দাসের উক্তির উপর ভিত্তি করে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের "চৈতন্যভাগবত" নাম রাখেন।

বৃন্দাবন দাসের নিবাস কোথায় ছিল, সে প্রশ্ন রহস্যাবৃত। দেনুড়ে তাঁর শ্রীপাট আছে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামগোপাল দাস তাঁর 'পাটনির্ণয়' গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের "পাট" হিসাবে 'হালিসহর'-এর নাম করেছেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী', পৃঃ ২০০ দ্রঃ)। তিনি লিখেছেন,

যশোড়াতে জগদীশ নর্ত্তন পদবী ॥
তাহা হৈতে হালিসহর দিন দুই হয়।
শ্রীবৃন্দাবন দাস নারায়ণীর তনয় ॥

ব্রজমোহন দাসের 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে'র 'সর্ব্বপাটনির্ণয়' নামক অধ্যায়ে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৭৩ নং পুথি, পৃঃ ৫ ক) লেখা আছে যে বৃন্দাবন দাসের মা নারায়ণীর "পাট' ছিল 'আনবাটি' নামে কোন এক স্থানে,

নারায়ণী আনবাটি ঘোষণা যাহার।
বৃন্দাবনদাস হন যাহার কুমার ॥

এই কথা কতখানি সত্য এবং 'আনবাটি' কোথায়—তা আপাতত বলা সম্ভব নয়।

বৃন্দাবন দাসের বাসভূমি হালিসহরে ছিল—এই কথাই সত্য বলে আমাদের মনে হয়। কারণ, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে শ্রীবাস পণ্ডিত সপরিবারে নবদ্বীপ ছেড়ে

কুমারহট্টে চলে যান এবং সেখানেই বাকী জীবন কাটান। শ্রীবাস কুমারহট্টে যাওয়ার কয়েক বছর পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর পুত্র বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং তিনি কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কুমারহট্টের পাশে অবস্থিত হালিসহরে * জীবন অতিবাহিত করেছিলেন—এই ব্যাপারই স্বাভাবিক।

---

* এখন হালিসহর ও কুমারহট্ট অবিচ্ছিন্ন এলাকা হয়ে পড়লেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে তা ছিল রামগোপাল দাস কুমারহট্টের নাম পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন—

ত্রিবেণীর পার হয় কাচড়াপাড়া গ্রাম।
কৃষ্ণরাম ঠাকুর যাহা অতি অনুপাম॥
তাহার নিকটে হয় কুমারহট্ট গ্রাম।
পণ্ডিতের সেবা গৌরাঙ্গ অতি অনুপাম।

।। পনের ।।

জয়ানন্দ

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ষোড়শ-শতাব্দীতে রচিত হলেও সর্বসাধারণের মধ্যে তেমন প্রচার লাভ করে নি। এক যদুনাথ দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃত' ছাড়া আর কোন প্রাচীন গ্রন্থে জয়ানন্দের নাম পাওয়া যায় না।

জয়ানন্দের গ্রন্থের এই বিরল প্রচারের প্রধান কারণ, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের রচিত চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির সঙ্গে জয়ানন্দের উক্তির অনেক ক্ষেত্রে অমিল দেখা যায়। কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে যে জয়ানন্দই ভুল করেছেন, বিনা প্রমাণে এমন কথা বলা চলে না। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক তথ্য একমাত্র জয়ানন্দই সঠিকভাবে পরিবেশন করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চৈতন্যদেবের জন্মের রাত্রিতে যে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল সে কথা অনেক চরিতকারই লিখেছেন. কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ সর্বগ্রাস না আংশিক, সে কথা আর কেউ বলেন নি। একমাত্র জয়ানন্দই বলেছেন,

> প্রথমে প্রভুর জন্ম কর্ম্ম সুপ্রকাশ।
> ফাল্গুন মাসে রাহু চন্দ্রে সর্ব্বগ্রাস ।।

এখন জ্যোতিষ-গণনার ফলে নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, ঐ দিন সর্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল (৮ই মার্চ, ১৯৫৫ তারিখের 'যুগান্তর'এ প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকুণ্ডলী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। লোচন দাস তাঁর 'চৈতন্য-মঙ্গলে' লিখেছেন যে, আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথি রবিবারে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়েছিল ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন ১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৩ খ্রীঃ) মহাপ্রভু পরলোক-গমন করেছিলেন। জ্যোতিষ-গণনার ফলে জানা যায় ঐ আষাঢ় মাসের দু'টি সপ্তমী তিথির মধ্যে শুক্লা সপ্তমী তিথি রবিবারে পড়েছিল। জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে এবং অভ্রান্তভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মহাপ্রভুর তিরোধান "আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা"তে ঘটেছিল। জয়ানন্দ মহাপ্রভুর ভ্রমণপথের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাও নানা সূত্র থেকে সমর্থিত হয়। অন্যান্য চরিতকাররা যেখানে হরিদাসের নিবাস 'বূঢ়নে' বলেছেন. জয়ানন্দ সেখানে 'ভাটকলাগাছি' গ্রামের নাম করে এ সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর সংবাদ দিয়েছেন—'বূঢ়ন' একটি পরগণার নাম এবং 'ভাটকলাগাছি' ঐ পরগণার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম। জয়ানন্দ হরিদাস ঠাকুরের মৃত্যুতিথিটি যেভাবে নির্দেশ করেছেন, তা'ও

তাঁর তথ্য-সচেতনতার পরিচয় দেয়। অন্যান্য চরিতগ্রন্থে লেখা রয়েছে যে হরিদাস চৈতন্যদেবের তিরোধানের আগে পরলোকগমন করেছিলেন, কিন্তু কত আগে—তা তাঁরা বলেন নি। কিন্তু জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে চৈতন্যদেবের মৃত্যুতিথির (১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি) অব্যবহিত পূর্ববর্তী ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে ("ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশীর উদয়।") হরিদাস পরলোকগমন করেছিলেন (এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল', পৃঃ ২৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য)। এর থেকে হরিদাসের মৃত্যু তারিখ পাওয়া যায়—২ই মার্চ, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ (Pillai, Indian Ephemeries, Vol V, p. 268)। এ তারিখ গ্রহণযোগ্য।

জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল জানান নি। সুতরাং আমাদের আনুষঙ্গিক প্রমাণ থেকে এর রচনাকাল নির্ণয় করতে হবে।

জয়ানন্দ লিখেছেন যে চৈতন্যদেব যখন নীলাচল থেকে স্থলপথে গৌড়ে আসেন, তখন তিনি জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের ঘরে এক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। জয়ানন্দ তখন শিশু, কোন কোন পুঁথির পাঠ অনুসারে তাঁর মা তাঁকে কোলে নিয়ে রান্না করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য শিশু জয়ানন্দকে আশীর্বাদ করেন এবং তাঁর পূর্বতন কুৎসিত নাম 'গুহিঞা' পালটে 'জয়ানন্দ' নাম রাখেন। জয়ানন্দের এই বিবরণের মূল বিষয়টির যাথার্থ্যে বিশেষ কোন সংশয় কেউ প্রকাশ করেন নি, কেবল চৈতন্যদেবের নীলাচল থেকে গৌড়ে আসার সময়ে উল্লিখিত ঘটনা ঘটেছিল কিনা, সে-সম্বন্ধে কোন কোন গবেষক সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, "শ্রীচৈতন্যের জলপথে গৌড়ে আসাই অধিক সম্ভব।...সেই জন্য মনে হয় গৌড়ে আসার সময় অপেক্ষা গৌড় হইতে ফেরার সময় শ্রীচৈতন্যের আমাইপুরা (জয়ানন্দের গ্রাম) যাওয়া অধিকতর সম্ভব।" এই মত খুবই যুক্তিসঙ্গত। ডঃ সুকুমার সেনও এখন এই মত পোষণ করছেন (বা. সা. ই., ১।পূঃ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৭০ দ্রঃ)। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতের সমর্থক অকাট্য প্রমাণ আমরা নীচে দিচ্ছি।

চৈতন্যদেব ১৪৩৬ শকাব্দের বিজয়া-দশমীর অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে উড়িষ্যা থেকে বাংলায় আসেন এবং ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষার আগমনের ঠিক আগে উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন (বর্তমান গ্রন্থের 'শ্রীচৈতন্যদেব' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বিজয়খণ্ডের নিম্নোদ্ধৃত অংশে স্পষ্টই লেখা আছে যে, চৈতন্যদেব জয়ানন্দের বাড়িতে এসেছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ বর্ষার ঠিক আগে,

জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে উত্তপ্ত সিকতা পথে
তরুতলে করিল শয়ন ॥

বৰ্দ্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
মাঝিপুরা তার নাম।
তাহে সে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব্বশিষ্য
তার ঘরে করিল বিশ্রাম ॥

সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে চৈতন্যদেব বাংলা থেকে নীলাচলে ফিরে যাবার সময়ে জয়ানন্দের বাড়িতে এসেছিলেন এবং জয়ানন্দকে আশীর্বাদ করে নতুন নাম দিয়েছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের যে মাসে জয়ানন্দ এত ছোট ছিলেন যে তাঁর ভাল নাম * তখনও রাখা হয় নি এবং কোন কোন পুথির পাঠ অনুসারে ঐ সময়ে তাঁর মার তাঁকে কোলে নিয়ে রাঁধবার দরকার হয়েছিল। ঐ সময়ে তাঁর বয়স তিন বছরের বেশি কখনই ছিল না। অতএব ১৫১২ থেকে ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জয়ানন্দের জন্ম হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার সময়ে জয়ানন্দের জ্যাঠা জীবিত ছিলেন; জয়ানন্দ যেভাবে তাঁর উল্লেখ করেছেন, তার থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়—

খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্প ভক্তি।
মহা পাষণ্ড তবো ধরে মহা শক্তি ॥

কোন মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে কেউ এই জাতীয় অশ্রদ্ধাসূচক উক্তি ও বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে না।

জয়ানন্দের উক্তির ভাষা ও ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর গ্রন্থরচনার সময়ে তাঁর জ্যাঠা মৃত তো ননই, অতিবৃদ্ধও নন। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে জয়ানন্দের পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানের শিশুমৃত্যু হওয়ার পরে জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং জয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর পিতার বয়সের ব্যবধান ছিল ন্যূনপক্ষে ২৫ বছর, জ্যাঠার সঙ্গে জয়ানন্দের বয়সের ব্যবধান আরও বেশি। জয়ানন্দের জ্যাঠা জয়ানন্দের চেয়ে কমপক্ষে ২৭।২৮ বছরের বড় ছিলেন ধরলে তাঁর জন্ম-সময় ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পড়বে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচনার সময়ে জ্যাঠার বয়স অধিকপক্ষে ৭৫ বছর ছিল ধরলে চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল হয় ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ। এইটিই জয়ানন্দের গ্রন্থরচনাকালের নিম্নতম সীমা।

১৫৬০কে নিম্নতম সীমা ধরার অনুকূলে আর একটি যুক্তি এই যে—জয়ানন্দের

* বলা বাহুল্য "গুহিঞা" ডাক নাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

গ্রন্থে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থাদির কোন প্রভাব নেই এবং জয়ানন্দ যে এই সমস্ত গ্রন্থের নাম শুনেছিলেন, তারও কোন নিদর্শন নেই। অথচ, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের কল্যাণে ১৫৬০ খ্রীঃর পরে ঐ সব গ্রন্থ বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে রচিত হয় নি। বৃন্দাবন দাসের ও জয়ানন্দের গ্রন্থরচনাকালের মধ্যে যে অন্তত ১০ বছরের ব্যবধান ছিল, তা 'বৃন্দাবন দাস' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি। সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকালের ঊর্ধ্বতম সীমা ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

অতএব জয়ানন্দ ১৫৪৮ থেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' নিজের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দিয়েছেন। বৈরাগ্য-খণ্ডের শেষে তিনি বলেছেন যে, তিনি 'বন্দ্যঘটি' (বাঁড়ুজ্যে) বংশের সন্তান। তাঁর পিতামাতার নাম যথাক্রমে সুবুদ্ধি মিশ্র ও রোদনী। সুবুদ্ধি মিশ্র "মিশ্র গোসাঞি"* নামেও অভিহিত হতেন। রোদনী নিত্যানন্দের শিষ্যা বা সেবিকা ছিলেন, কারণ জয়ানন্দ তাঁকে "নিত্যানন্দের দাসী" বলেছেন। জয়ানন্দ তাঁর কয়েকজন খুড়ো ও জ্যাঠার নামও এখানে উল্লেখ করেছেন; এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বাণীনাথ মিশ্র, ইনি পরপর ছ'রাত্রি উপবাস করতে পারতেন—কৃত্তিবাসের অনুজ মৃত্যুঞ্জয়ের মত; বাণীনাথের পুত্র ও ভ্রাতা ছিলেন যথাক্রমে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহানন্দ বিদ্যাভূষণ ও অকালমৃত ইন্দ্রিয়ানন্দ (?) কবীন্দ্র; জয়ানন্দের জ্যাঠা বৈষ্ণব মিশ্র সমস্ত তীর্থ দর্শন করেছিলেন এবং ছোট খুড়ো রামানন্দ মিশ্র একজন ভাগবত ছিলেন বলে জয়ানন্দ জানিয়েছেন; কিন্তু এঁদের আবার চৈতন্যদেবের উপর ভক্তির অভাব ছিল। জয়ানন্দদের পরিবারের বেশির ভাগ লোকই ছিলেন "রঘুনাথ-উপাসক", কেবল জয়ানন্দই ছিলেন "চৈতন্য-ভাবক"।

বিজয়খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে জয়ানন্দ তাঁদের বাড়িতে চৈতন্যদেবের পদার্পণের কথা লিখেছেন। এই অধ্যায় থেকেই জানা যায় যে, জয়ানন্দের গ্রামের নাম ছিল আঞিপুরা (এশিয়াটিক সোসাইটির পুথির পাঠ) বা আমাইপুরা (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ)। এই গ্রাম বর্ধমানের খুব কাছেই অবস্থিত ছিল। এই অধ্যায়ে

* এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দু'এক জায়গায় ছাপার ভুলে "মিশ্র গোসাঞি"র জায়গায় "মিত্র গোসাঞি" মুদ্রিত হয়েছে।

জয়ানন্দ লিখেছেন যে তাঁর পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র ছিলেন চৈতন্যদেবের পূর্ব-শিষ্য ("তাহে সে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য"); এর সঙ্গত ব্যাখ্যা—সুবুদ্ধি মিশ্র চৈতন্যদেবের কাছে পড়েছিলেন; এই ব্যাখ্যা যে ঠিক তার প্রমাণ জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র আদিখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলি থেকে পাওয়া যায়,

জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি।
পরম ভাগবত উপমা দিতে নাঞি॥
পূর্ব্বে গোসাঞির শিষ্য পুস্তক লিখনে।
আপনে চিন্তিএ পড়ে যত শিষ্যগণে॥

(জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' যেখানে নাম না করে শুধু 'গোসাঞি' লিখেছেন, সেখানে চৈতন্যদেবকে বুঝিয়েছেন।)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা ১০ম অধ্যায়ে চৈতন্য-শাখা বর্ণনায় এক সুবুদ্ধি মিশ্রের নাম করেছেন। সম্ভবত ইনিই জয়ানন্দের পিতা।

আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে জয়ানন্দ লিখেছেন যে তিনি মাতামহের আবাসে বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। এই অধ্যায় থেকেই জানা যায় যে, জয়ানন্দ বাংলার তিনজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচার্যের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন চৈতন্যদেবের বন্ধু ও ভক্ত গদাধর পণ্ডিত; ইনি জয়ানন্দকে চৈতন্য-জীবনী লিখতে আদেশ দেন। দ্বিতীয়জন নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্য অভিরাম গোস্বামী—তাঁর কাছে জয়ানন্দ "বল" পেয়েছিলেন। তৃতীয়জন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী, তাঁর "প্রসাদমালা" পেয়েছিলেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দ তাঁর অধিকাংশ ভনিতাতে গদাধরের নাম উল্লেখ করেছেন এবং নদীয়াখণ্ডের একটি অধ্যায়ে গদাধর পণ্ডিতের প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন ও তাঁর প্রশস্তি কীর্তন করেছেন; যদুনাথ দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃতে' গদাধর পণ্ডিতের শাখায় জয়ানন্দের নাম পাওয়া যায়; এই সমস্ত বিষয় থেকে মনে হয়, গদাধর পণ্ডিত ছিলেন জয়ানন্দের দীক্ষাগুরু।

জয়ানন্দ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ ঐ তিন অঞ্চলের পথ-ঘাটের খুব বিস্তৃত ও নিখুঁত বর্ণনা তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। জয়ানন্দ গয়া ও পুরীর মন্দির ও পূত স্থানগুলির বিশদ ও সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন, এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি ঐ দুই তীর্থক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে সম্ভবত তিনি যান নি, কারণ বৈরাগ্যখণ্ডে ধ্রুবের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার

সময় তিনি লিখেছেন যে যমুনার তীরে বংশীবটের পাশে একটি পর্বত আছে ; কিন্তু বংশীবটের নিকটতম "পর্বত" গোবর্ধন বংশীবট থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত ; বৃন্দাবনে গেলে জয়ানন্দ এরকম লিখতেন না।

জয়ানন্দ সম্বন্ধে বিশদতর সংবাদ যাঁরা জানতে চান, তাঁরা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র নতুন সংস্করণ (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও বর্তমান লেখক কর্তৃক সম্পাদিত) দেখতে পারেন।

॥ ষোল ॥

লোচন দাস

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলকে মৌলিক গ্রন্থ বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ এর প্রায় বারো আনা অংশই মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ। লোচন দাসের সংযোজিত অংশগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সন্দেহের অতীত নয়।

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলের আনুমানিক রচনাকাল স্থির করা খুব কঠিন নয়। তাঁর গুরু ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরহরি সরকার। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নরহরি সরকার জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর শিষ্য লোচন দাসের জন্ম ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নিশ্চয়ই হয় নি। সুতরাং তাঁর গ্রন্থরচনাকালও অনুমান করা যায়। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল রচনার সময় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কেননা চৈতন্যমঙ্গলে আছে,

বৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে। জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে ॥

সুতরাং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত রচনার পরে অন্তত এক পুরুষ অতিক্রান্ত হবার পর লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত ১৫৩৮ থেকে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি। সুতরাং লোচনদাসের গ্রন্থের রচনাকালের উর্ধ্বতম সীমা হয় ১৫৬০ খ্রীঃ।

দু'টি বিষয় থেকে এই উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ সমর্থিত হয়। প্রথমত, লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে ধৃত জনৈক "দাক্ষিণাত্যকবি"র শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'পদ্যাবলী' সঙ্কলিত হয়; বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামী কর্তৃক 'পদ্যাবলী' সঙ্কলিত হবার পরে তা বাংলা দেশে লোচনদাসের কাছে পৌছোবার আগে নিশ্চয়ই অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস সম্পর্কিত অংশটি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য মাধব নামক উড়িয়া গ্রন্থকারের লেখা 'চৈতন্যবিলাস' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত বলে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ২৭৫-২৮৪ দ্রঃ)। এই মত গ্রহণযোগ্য বলে আমরা মনে করি। একজন

উড়িয়া গ্রন্থকারের উড়িয়া ভাষায় রচিত বই বাংলা দেশে প্রচারিত হতে সময় লাগত। মাধবের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনের ১৫১৬ সালে বৃন্দাবন দর্শন করে নীলাচলে প্রত্যাগমন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ বই যদি চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায়ও রচিত হয়ে থাকে, তা' হলেও তা ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগে বাঙালী গ্রন্থকার লোচনের হাতে পৌঁছেছিল বলে মনে করা যায় না।

লোচনের গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতম সীমা যে ১৫৭৬ খ্রীঃ, তা' ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন; তিনি লিখেছেন, "১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থে (কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য়) শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের তত্ত্ব বা পূর্ব্বলীলার নাম লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু লোচন যখন চৈতন্যমঙ্গল লেখেন, তখন ঐরূপভাবে তত্ত্ব নির্ণীত হইলেও, উহা অন্তরঙ্গজনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। সেইজন্য লোচন বলিয়াছেন—

> আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে জানি।
> অবতার-নির্ণয়-কথা কেমনে বাখানি ॥
> মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে।
> তাহা কহিবারে নারি সঙ্কোচ পরাণে ॥—সূত্রখণ্ড, পৃঃ ৩০

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর লোচন 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখিতে বসিলে এত সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।" (শ্রীচৈ. চ. উ., ২য় সং, পৃঃ ২৫১)

অতএব ১৫৬০ থেকে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

লোচন দাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের শেষে প্রদত্ত আত্মবিবরণ থেকে পাওয়া যায়। সেগুলি সংক্ষেপে এই। তিনি জাতিতে বৈদ্য। তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের নিবাস বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কোগ্রাম (এই গ্রাম আধুনিক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকেরও বাসভূমি)। তাঁর পিতা, মাতা, মাতামহ ও মাতামহীর নাম যথাক্রমে কমলাকর দাস, সদানন্দী, পুরুষোত্তম গুপ্ত ও অভয়া দাসী। লোচনের বাল্যকালে তেমন লেখাপড়ায় মন ছিল না, মাতামহ মারধোর করে তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। লোচন দাসের "প্রেমভক্তিদাতা গুরু" ছিলেন নরহরি দাস। রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণয়ে' (রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী) লেখা আছে যে—লোচন "গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন ॥" (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী', পৃঃ ২০৭ দ্রঃ)।

লোচনের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ নয়নানন্দের শিষ্য উদ্ধব দাসের লেখা 'ব্রজমঙ্গলে'র মতে লোচন নিত্যানন্দের আদেশে বিবাহ করেছিলেন; তাঁর স্ত্রীর নাম কাঞ্চন এবং তিনি গুরুর আদেশে বন কাটিয়ে কঙ্কণনগরে বাস করেছিলেন। কিন্তু গুরুর অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি কীভাবে ফিরিঙ্গির (পর্তুগীজদের) কাছে বিক্রীত হলেন ও কেমন করে মুক্ত হলেন, সেই রোমাঞ্চকর ইতিহাস জানবার কোন উপায় নেই।

লোচন দাসের পুরো নাম বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কোথাও পাই ত্রিলোচন দাস, কোথাও সুলোচন দাস আবার কোথাও লোচনানন্দ দাস। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

'সঙ্কীর্তনামৃতে' ধৃত লোচনের ভনিতাযুক্ত একটি পদে পাওয়া যায় যে, লোচন নরহরি ও রঘুনন্দনের তিরোধানের পরও অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদেও জীবিত ছিলেন (শ্রীচৈ. চ উ., ২য় সং. পৃঃ ২৭৩)। পদটি অকৃত্রিম ও তার সাক্ষ্য সত্য বলেই আমাদের মনে হয়।

॥ সতের ॥

চূড়ামণি দাস

চূড়ামণি দাসের লেখা চৈতন্যচরিতগ্রন্থ কিছুদিন আগে পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। ১৩০২ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজে এই গ্রন্থের পরিচয় দান করেন (বিশ্বকোষ. ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৩৮৫) এবং বিশ্বকোষে 'চৈতন্যচন্দ্র' শীর্ষক আলোচনায় (বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৪০৫-৪৬৩) এই বই থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃতও করেন। তাঁর পরে দীনেশচন্দ্র সেন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নানা উপলক্ষে চূড়ামণিদাসের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। পরে ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) এবং ১৩৬০ সালের বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে* এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি অবলম্বনে এই গ্রন্থের পরিচয় দেন এবং দেখান যে, এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'গৌরাঙ্গবিজয়'। কয়েক বছর আগে (১৯৫৭) তাঁর সম্পাদনায় বইটি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

চূড়ামণি দাস লিখেছেন যে মহাপ্রভুর জন্মের খবর শুনে বৌদ্ধরাও আনন্দিত হয়েছিলেন। এর থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু অনুমান করেন যে, চৈতন্যভক্ত হলেও চূড়ামণিদাস প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। চূড়ামণি দাসের গুরু ছিলেন নিত্যানন্দের প্রিয়পাত্র ধনঞ্জয়

* এই প্রবন্ধে ডঃ সুকুমার সেন চূড়ামণিদাসের গ্রন্থকে "একটি অশ্রুতপূর্ব অজ্ঞাত অভিনব চৈতন্যচরিতকাব্য" কেন বলেছেন জানি না। নগেন্দ্রনাথ বসু তো বহু আগেই 'বিশ্বকোষে' এর পরিচয় দিয়ে গেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৮৯৬) ভূমিকায় লেখেন, "পুস্তক আকারে বৃহৎ হইল, এইজন্য তিনশত বৎসর পূর্ব্বের কবি অনন্তরাম মৈত্রের পুত্র জীবন মৈত্র রচিত পদ্মাপুরাণ, বিপ্রদাস কবি কৃত মনসামঙ্গল, চূড়ামণি দাস কৃত চৈতন্যচরিত্র এবং দ্বিজ দুর্গাদাস প্রণীত মুক্তালতাবলী প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিতে পারিলাম না।" 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে দীনেশবাবু এক জায়গায় চূড়ামণি দাসের গ্রন্থের নাম করেছেন (৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৬ দ্রঃ)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার সাহিত্য পরিষতের সভাপতির অভিভাষণে বলেন, "চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লইয়া যে সকল বই লেখা হয়, তাহাতে বৌদ্ধদের বাঙ্গালায় থাকার কথা নাই।...কেবল চূড়ামণিদাস বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করায় বৌদ্ধেরা খুব আনন্দিত হইয়াছিল।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬, পৃঃ ২০ দ্রঃ)। এঁদের লেখা না পড়েই ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "চূড়ামণি দাসের কোনো চৈতন্যচরিতের নামও কখনো শুনিনি।"

পণ্ডিত ; একথা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই জানা যায়। তিনি ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও নিত্যানন্দের কাছে তাঁর গ্রন্থের উপকরণ পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন।

চূড়ামণি দাসের গ্রন্থ অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। চূড়ামণি দাসের মতে বাল্যকাল থেকেই চৈতন্যদেবের অলৌকিক মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই সময়েই নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান ; তারপর, মাধবেন্দ্র পুরী চর্মচক্ষে কৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন ও তাঁরই অনুরোধে কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই জাতীয় অনৈসর্গিক ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত চূড়ামণিদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। চূড়ামণি-দাস বহু ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভুল খবরও দিয়েছেন। যেমন "চূড়ামণিদাস বলেন যে চৈতন্যের জন্মনক্ষত্র রোহিণী ও জন্মরাশি বৃষ—এই কারণে গণক রাশি অনুসারে ইহার নাম বিশ্বম্ভর রাখিয়াছিল। কিন্তু একথা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক, চৈতন্য রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহা হইলে সেই দিন কখনই চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারিত না।" (বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৪১১)।

চূড়ামণি দাসের গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা খুব দুরূহ নয়। চূড়ামণি দাস নিত্যানন্দের কৃপা পেয়েছিলেন। নিত্যানন্দ গদাধর ও ধনঞ্জয় পণ্ডিতকে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলতেন, তার কিছু কিছু চূড়ামণি স্বকর্ণে শুনেছিলেন ("কহিছে নিতাই গদাধর ধনঞ্জয়ে। সংসর্গে শুনিঞা আছোঁ কহিল নিশ্চয়ে॥") সুতরাং নিত্যানন্দের মৃত্যুর (যা ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল) আগেই চূড়ামণি দাস পূর্ণবয়স্ক। চূড়ামণি-দাস গ্রন্থ রচনা করতে সুরু করেন নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে (সুস্বপ্ন কহিয়াছে নিত্যানন্দ রাএ। চূড়ামণি দাস কহে এই ভরোসাএ॥)। এর থেকে বোঝা যায়, নিত্যানন্দের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থের রচনা আরম্ভ হয় নি। এদিকে, ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই যিনি পূর্ণবয়স্ক, তাঁর জীবৎকালকে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের বেশি পরে নিয়ে যাওয়া যায় না। অতএব ১৫৫০ থেকে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চূড়ামণি দাস 'গৌরাঙ্গবিজয়' রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

চূড়ামণি দাস শুধু চরিতগ্রন্থরচয়িতা নন, পদকর্তাও। তার লেখা একটি পদ 'পদ-কল্পতরু'তে সঙ্কলিত হয়েছে।

॥ আঠার ॥

শ্রীনিবাস আচার্য

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যাঁদের চেষ্টায় বাংলা দেশে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, শ্রীনিবাস আচার্যের স্থান তাঁদের পুরোভাগে। মহাপ্রভুর জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে যার প্রথম স্ফূরণ, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের লেখনীতে যার পূর্ণ রূপায়ণ, সেই ধর্মকে তার আদি উৎসভূমির লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন শ্রীনিবাস আচার্য। অন্য কেউ এ কাজ এত সার্থকভাবে করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এই অনন্যসাধারণ মহাপুরুষের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অল্প। তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সময়ও সর্ববাদিসম্মতভাবে নিরূপণ করা হয় নি। এখন আমরা এ সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করব।

শ্রীনিবাস আচার্যের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান্ ও প্রামাণিক সংবাদ মেলে তাঁর, একজন শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের লেখা 'শ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশসূচক' পুস্তিকায় ও আর একজন শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের লেখা দু'টি শ্লোকে। পরে আমরা এদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করব।

পরবর্তী কালে লেখা কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে 'প্রেমবিলাস'। এর লেখক নিত্যানন্দ দাস লিখেছেন যে তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর আজ্ঞায় এই বই লিখেছেন। সমসাময়িক গ্রন্থকার গুরুচরণ দাসের 'প্রেমামৃতে' এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কোন কোন পুথিতে নাকি বইটির রচনাকাল দেওয়া আছে ১৫২২ শক=১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু বইটি বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে শেষ ছয়টি "বিলাস" বা অধ্যায় নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত। বাকি অংশেও অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান আছে।

গুরুচরণ দাসের 'প্রেমামৃতে'ও শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী দেওয়া আছে। কিন্তু এই বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে, সম্পূর্ণ বইটি এখনও ছাপা হয় নি।

আর একটি বই হচ্ছে যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ'। এর রচনাকাল নাকি ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ। বইটির অকৃত্রিমতা (অন্তত সর্বাংশে) সন্দেহের বিষয়।

এছাড়া মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী'তে শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বইটির লেখক শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যপুত্রের শিষ্য। রচনাকাল ১৭৫৩

সংবৎ ও ১৬১৮ শকাব্দের চৈত্রমাস=১৬৯৭ খ্রীঃ। বইটির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের প্রায় ১০০ বছর পরে রচিত বলে এর সাক্ষ্যকে গ্রহণ করবার আগে যাচাই করে নিতে হবে।

তারপর, নরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে', বিশেষত 'ভক্তিরত্নাকরে' শ্রীনিবাস আচার্যের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। নরহরি 'শ্রীনিবাসচরিত্র' নামে আর একটি বই লিখেছিলেন; 'ভক্তিরত্নাকরে' তার উল্লেখ আছে, কিন্তু বইটি পাওয়া যায় নি। নরহরি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্যের পুত্র। বিশ্বনাথ ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের টীকা রচনা করেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' 'অনুরাগবল্লী'র উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে। সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকরে'র রচনাকাল ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ধরা যায়। 'নরোত্তমবিলাস' তার পরের রচনা।

নরহরির ঐতিহাসিক চেতনা ও তথ্যপ্রমাণনিষ্ঠা সেযুগের পক্ষে বিস্ময়কর। যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন, প্রায় ক্ষেত্রেই তার স্বপক্ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, তিনি জীব গোস্বামী ও বীরভদ্র গোস্বামীর কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। আধুনিকপূর্ব যুগে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর মেলে না বললেই হয়। এরকম লোক শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, সমসাময়িক না হলেও তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

'ভক্তিরত্নাকর' অবলম্বনে আমরা নীচে শ্রীনিবাস আচার্যের একটি জীবনী সঙ্কলন করলাম।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কয়েক বছর পরে শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম হয়। তাঁর পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় চৈতন্যদাস। বাল্যকালে শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরহরি সরকার ঠাকুরের দেখা হয়। শৈশব থেকেই শ্রীনিবাস শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। অল্প বয়সে পিতাকে হারিয়ে শ্রীনিবাস অধিকতর গৌরভক্ত হয়ে ওঠেন। চৈতন্যকে স্বচক্ষে দেখবার ইচ্ছা আর তিনি দমন করতে পারেন না, রওনা হন নীলাচলের দিকে। তখন তিনি নিতান্তই কিশোরবয়স্ক :—

কৈশোর বয়স অতি সুন্দর শরীর। যে দেখে বারেক সে হইতে নারে স্থির ॥

(ভক্তিরত্নাকর, তৃতীয় তরঙ্গ)

কিন্তু রাস্তার মাঝখানে তিনি শুনলেন মহাপ্রভু দেহ রক্ষা করেছেন। শুনে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তখন তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত করে নীলাচলে

যেতে বললেন। শ্রীনিবাস নীলাচলে গেলেন এবং সেখানে গদাধর পণ্ডিত, বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর দেখা হল।

শ্রীনিবাস আবার বাংলা দেশে ফিরে এসে নানা স্থান ভ্রমণ করেন। নবদ্বীপে গিয়ে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে দেখা করলেন। এইভাবে গমনাগমনের মধ্য দিয়ে কিছুদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে গদাধর পণ্ডিত, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতির অদর্শন ঘটেছিল। শ্রীনিবাস নানা তীর্থ পর্যটন করে মথুরায় এসে পৌছালেন। এখানে এসে শুনলেন কাশীশ্বর গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, সনাতন, রূপ প্রভৃতি পরলোকগমন করেছেন; গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস ও জীব তখনও বর্তমান আছেন। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়ে গোপালভট্টের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, তিনি জীব গোস্বামীরও দর্শন পেলেন। এখানে নরোত্তম দাস এবং শ্যামানন্দ দাসের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হল। শ্রীনিবাস কয়েক বছর বৃন্দাবনে বাস করে জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে আচার্য পদবী লাভ করলেন।

তারপর বৃন্দাবনের গোস্বামীরা শ্রীনিবাসকে বললেন বাংলায় ফিরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে। শ্রীনিবাস বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দকে সাথী করে রওনা হলেন বাংলার দিকে। কিছুদিন পরে তাঁরা বাংলায় এসে পৌছোলেন, কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমায় পৌছোবার পরে রাজা বীর হাম্বীরের লোকেরা তাঁদের উপর চড়াও হয়ে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ লুট করে নিয়ে গেল। শ্রীনিবাস তখন বীর হাম্বীরের সভায় গেলেন। বীর হাম্বীর দস্যু হলেও ধর্মের প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল। তাঁর সভায় ভাগবত পাঠ হত। শ্রীনিবাস সেখানে উপস্থিত হয়ে ভ্রমরগীতা পাঠ করে রাজাকে মুগ্ধ করলেন। রাজার তখন মন পরিবর্তিত হল, তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থ ফিরিয়ে দিলেন, এবং দস্যুবৃত্তি একেবারে ত্যাগ করলেন। শ্রীনিবাস তখন সারা বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস আর কুমার থাকলেন না, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করলেন। প্রথমে যাজিগ্রামের গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদীকে এবং তারপরে গোপালপুরের রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা গৌরাঙ্গপ্রিয়াকে তিনি বিবাহ করেন। এই দুই বিবাহের ফলে তাঁর কয়েকটি পুত্রকন্যার জন্ম হয়।

উপরে যে বিবরণ সঙ্কলিত হল, তাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তার বিভিন্ন ঘটনার সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খ্রীঃ) সময় শ্রীনিবাস

কিশোরবয়স্ক। ঐ সময় তাঁর বয়স ১৩।১৪ বছরের মত ছিল ধরলে ১৫১৯।১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম বলা যেতে পারে।*

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও গদাধর পণ্ডিতের মৃত্যুর পরে শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনের দিকে রওনা হন, বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে পেঁছে তিনি খবর পান যে রঘুনাথ ভট্ট, সনাতন ও রূপ পরলোকগমন করেছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য যে ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তা আমরা এই অধ্যায়ের শেষে আলোচনা করে দেখিয়েছি। বৃন্দাবনে যাওয়ার পর শ্রীনিবাস তিন চার বছর বৃন্দাবনে বাস করে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। এই হিসাবে শ্রীনিবাস ১৫৬৬ বা ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ফিরেছিলেন ধরা যায়। তারপর গ্রন্থ লুঠ, গ্রন্থ উদ্ধার, বীর হাম্বীরের উদ্ধার, শ্রীনিবাসের বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা ঘটে। অবশ্য 'ভক্তিরত্নাকরে' ঘটনাগুলি যে ক্রমে উল্লিখিত হয়েছে, সেই ক্রমেই যে তারা ঘটেনি—সে কথা শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য কর্ণপুর কবিরাজের লেখা 'শ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশসূচক' থেকে জানা যায় (পরে দ্রষ্টব্য)। মোটের উপর, শ্রীনিবাস আচার্যের বিবাহ যে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে সংঘটিত হয় নি—তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্যের বয়স হয় ৫০।৫৫ বছর। ঐ বয়সে দু'টি বিবাহ করা এবং তার পরে কয়েকটি সন্তানের জনক হওয়া মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। শ্রীনিবাসের পিতাও যে খুব বেশি বয়সে পুত্রের জনক হয়েছিলেন, সে কথা 'ভক্তিরত্নাকর'-এই লেখা আছে। তা ছাড়া শ্রীনিবাসের দুই স্ত্রী ছিলেন বলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর কয়েকটি সন্তান লাভ সম্ভব।

* ড' নবীগোপাল গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বইয়ে (পৃঃ ১৯) শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মের সময় সম্বন্ধে আমার মত খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন, "১৫১৯।১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের জন্ম হইতে পারে না। বিশেষতঃ ১৫ বছরের কমে তো দূরের কথা, ১৫ বছর বয়সের লোকের পক্ষেও সেকালে একাকী হাঁটা-পথে কোন দূরদেশে যাওয়া একরূপ অসম্ভবই ছিল।" ডঃ গোস্বামী সিদ্ধান্ত করেছেন, "১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্তী সময়ে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন।" এতে আমার মত কীভাবে খণ্ডিত হ'ল, তা বুঝতে পারছি না। ১৫১৯।২০ খ্রীষ্টাব্দ তো ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের "নিকটবর্তী" সময়ই! ১৫ বছরের ছেলের পক্ষে দূর দেশের পথে একা হাঁটা যতখানি সম্ভব, ১৩।১৪ বছরের ছেলের পক্ষেও ততখানি সম্ভব। শ্রীনিবাস আসলে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। এ কথা সকলেই জানেন যে কিশোর বয়সের ছেলেরাই (১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের) বাড়ি থেকে সব চেয়ে বেশি পালায়। তবে শ্রীনিবাস পালিয়েছিলেন চৈতন্যদেবকে দেখবার জন্য, আর এযুগের কিশোররা পালায় সিনেমায় নামার উদ্দেশ্য নিয়ে বা বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে।

কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার এই কালনির্ণয় কেউ কেউ মানতে চান না। তাঁরা যে সব আপত্তি তুলেছেন, সেগুলি আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা, তার বিচার করা যাক।

রাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয়ের মতে রূপ-সনাতন অন্তত ১৫৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং শ্রীনিবাস তার পরে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে যে তাঁহারা ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে ; ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট আকবরশাহ যে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা।" কিন্তু ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রূপ-সনাতনের সঙ্গে আকবরের সাক্ষাৎকার মোটেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা নয়, এমন কি কিংবদন্তীও নয়, বিংশ শতাব্দীর কোন কোন লোকের কল্পনা। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ও ডঃ নরেশচন্দ্র জানা আলোচনা করেছেন ('বিচিত্রা', শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃঃ ৫১-৫২ এবং 'বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী', পৃঃ ৬৫-৬৬ দ্রঃ)।

আপত্তির দ্বিতীয় কারণ, বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে প্রতিবাদীদের স্বকপোল-কল্পিত ধারণা। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে বীর হাম্বীর যে বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন, তা তাঁরা স্বীকার করতে চান না। সুতরাং বীর হাম্বীর কোন্ সময়ে রাজত্ব করেছিলেন, সেই প্রশ্নটি সাবধানে বিচার করে দেখা দরকার।

আবুল ফজল রচিত 'আকবর-নামা' থেকে জানা যায় যে, আকবরের রাজত্বের ৩৫শ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে হাম্বীর মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে কতলু খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন। মীর্জা নাথানের লেখা 'বহারিস্তান-ই-গায়বি' নামক সমসাময়িক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, প্রায় ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীর মোগল সেনাপতি ইসলাম খাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং প্রায় ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, যার জন্য তাঁকে দমন করতে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। অতএব বীর হাম্বীর অন্ততপক্ষে ১৫৯০ থেকে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে রাজত্ব করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে যিনি কৎলু খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে বিপন্ন জগৎসিংহকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি যে ঐ সময়ে অত্যন্ত সমরকুশল ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দীর্ঘদিনের রাজত্ব ও যুদ্ধপরিচালনায় অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি এই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বলে ভাবা স্বাভাবিক। একই লোকের পক্ষে ৪২ বছর রাজত্ব করা মোটেই অসম্ভব নয়। ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। এই দিক দিয়ে, ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে বা

তারও আগে থেকে বীর হাম্বীর রাজত্ব করেছিলেন বলে আমরা যে সিদ্ধান্ত করেছি, তা কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না।

রাধাগোবিন্দ নাথ নিজের সুবিধামত ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীরের বয়স ২৫।২৬ বছর ধরেছেন এবং তাই থেকে হিসাব করে ১৫৭২ থেকে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম হয়েছিল বলে মনে করেছেন। কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকরের' মত গ্রন্থের উক্তিকে উড়িয়ে দেবার আগে সাবধান হয়ে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করা উচিত। নাথ মহোদয় তা করেননি বলে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্য যে চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত করছি।

'ভক্তিরত্নাকরে' লেখকের স্বকপোলকল্পিত কথা বিশেষ নেই। যা কিছু তিনি লিখেছেন, তার পক্ষে তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, কিশোর শ্রীনিবাস চৈতন্যদেবকে দেখবার জন্য নীলাচলে যাচ্ছিলেন, পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সংবাদ পেলেন,

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন। কতদূরে শুনিল চৈতন্য-সংগোপন ॥

তারপর,

প্রভু-ইচ্ছামতে হইল নিদ্রা আকর্ষণ। স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র দিলেন দর্শন ॥

শ্রীনিবাস-মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিল। প্রেমাবেশে প্রভু অতিশয় আশ্বাসিল ॥

এই পর্যন্ত লিখে 'ভক্তিরত্নাকর-রচয়িতা' তাঁর উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন,

"তথাহি শ্রীনৃসিংহকবিরাজকৃত নবপদ্যে ॥

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুর্মূর্চ্ছ ভগবান্ দৃষ্টাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্ ॥

(শ্রীপুরুষোত্তমধামে গমন করতে ইচ্ছুক শ্রীনিবাস কৃপানিধি প্রভু চৈতন্যের তিরোধানবার্তা লোকমুখে শুনে অতি দুঃখে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হতে লাগলেন। অনন্তর ভগবান্ ভক্তের দুঃখ দর্শনে নিজের দয়া জানাবার জন্য স্বপ্নে অনেক আশ্বাসবাক্য বললেন।)

নৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের অত্যন্ত বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীনিবাস আচার্যের অনেক শাখা-বর্ণন গ্রন্থে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়,

শ্রীরামচন্দ্রগোবিন্দকর্ণপূরনৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৌ ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদানবিচক্ষণাঃ ॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র. গোবিন্দ, কর্ণপূর, নৃসিংহ, ভগবান, বল্লবীদাস, গোপীরমণ ও গোকুল —এই আট কবিরাজ।

ভক্তিরত্নাকরের দশম তরঙ্গের এক জায়গায় শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদের নামের এক বিস্তৃত তালিকা দেওয়া আছে : সেখানেও স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে,

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো। যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো ॥

এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি সংস্কৃত শাখানির্ণয়ের পুথি (G-5638 নং) আছে। পুথির লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দী, রচনাকাল শ্রীনিবাস আচার্যের সমসাময়িক বলে মনে হয়। এতেও শ্রীনিবাসের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের নাম পাই,

কর্ণপূরো নৃসিংহঃ শ্রীভগবান্ কবিনৃপতিঃ।
বল্লবিদাসকবিরাজৌ শ্রীগোপীরমণগোকুলৌ ॥

'কবিরাজ' এবং 'কবিনৃপতি' একই কথা। গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁর 'সঙ্গীতমাধব' নাটকে নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন,

"সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যো স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগাসীদভিন্নঃ।"

সুতরাং নৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। অতএব শ্রীনিবাসের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে তাঁর কথা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য। তিনি যখন বলেছেন যে শ্রীনিবাস আচার্য চৈতন্যদেবের জীবৎকালে জন্মেছিলেন এবং নীলাচলে যাবার পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-সংবাদ শুনেছিলেন, তখন আর এ বিষয়ে কোন কথাই উঠতে পারে না।

শ্রীনিবাস আচার্যের আর একজন শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের লেখা 'শ্রীনিবাসাচার্য্য-গুণলেশসূচক'-এর দু'টি শ্লোক থেকেও এই বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। এই দু'টি শ্লোক নরহরি চক্রবর্তীর 'নরোত্তমবিলাসে'ও পাওয়া যায়। শ্লোক দু'টি এই,

আবির্ভূয় কুলে দ্বিজেন্দ্রভবনে রাঢ়ীয়-ঘণ্টেশ্বরো
নানাশাস্ত্র-সুবিজ্ঞ নির্মলধিয়া বাল্যে বিজেতা দ্বিশম্।
নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুত-পদং শ্রুত্বা ত্যজন্ সর্ব্বকং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথি শ্রুতচৈতন্য-সঙ্গোপনং
মূর্চ্ছাভূয় কচান্ ধুনন্ স্বশিরসো ঘাতং দদদ্ধিক্কৃতম্।
তৎপদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্ নীলাচলং যঃ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥

যিনি রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বরি-কুলে ব্রাহ্মণবর্য্য কোন মহাশয়ের গৃহে আবির্ভূত, বিবিধ শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ, নির্মল বুদ্ধিবলে বাল্যেও দিগ্বিজয়ী হয়েছিলেন—শচীনন্দন নীলাচলে প্রকট আছেন শুনে সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন, আমার সেই করুণানিধি শ্রীনিবাস প্রভুর জয় হোক্।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যেতে যেতে পথে চৈতন্যদেবের সঙ্গোপনের কথা শুনে যিনি ভাগ্যকে শত শত ধিক্কার দিয়ে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে করাঘাত করতে করতে মূর্ছিত হয়েছিলেন এবং পরে চৈতন্যপদ হৃদয়ে ধারণ করে নীলাচলে গিয়েছিলেন, আমার সেই করুণানিধি শ্রীনিবাস প্রভুর জয় হোক্।)

'শ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশসূচক'-এর মধ্যে কর্ণপূর কবিরাজ শ্রীনিবাসের জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন (হরিদাস দাস সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগ্রন্থমালা', পৃঃ ২৫-৪০ দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য এই বিবরণ প্রামাণিক। নীচে আমরা এর একটি সংক্ষিপ্তসার দিলাম।

নীলাচলে পৌঁছে শ্রীনিবাস দেখলেন গদাধর পণ্ডিত দৃষ্টিহীন, তাঁর চোখের জলে ভাগবতের অক্ষর ধুয়ে গিয়েছে। শ্রীনিবাস গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়তে চেয়েছিলেন, এখন বুঝলেন তা সম্ভব নয়; তা সত্ত্বেও তিনি গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়তে চাইলে গদাধর পণ্ডিত তাঁর অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে তাঁকে গদাধর দাসের কাছে চিঠি দিয়ে পাঠালেন। শ্রীনিবাস গদাধর দাসের কাছে এসে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করলে গদাধর দাস তাঁকে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের কাছে যেতে বললেন। শ্রীনিবাস এর পর শ্রীখণ্ডে গিয়ে নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের সঙ্গে এবং খানাকুলে গিয়ে অভিরাম গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে প্রবেশের আগে মথুরায় রূপ ও সনাতনের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন এবং জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে রূপ-সনাতনের শোকে হাহাকার করতে লাগলেন। এ দিকে জীব গোস্বামীর লোকেরা (কর্ণপূরের মতে রূপ গোস্বামী মৃত্যুর আগে জীব গোস্বামীকে শ্রীনিবাসের আসার কথা বলে গিয়েছিলেন) মথুরায় এসে শ্রীনিবাসকে দেখতে পেয়ে বৃন্দাবনে নিয়ে গেল। জীব শ্রীনিবাসের সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে

'আচার্য' উপাধি দিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস গোপালভট্টের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। লোকনাথ গোস্বামী ও তাঁর শিষ্য নরোত্তমের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হল। কৃচ্ছ্রসাধন, গোস্বামীদের সেবা ও গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে অনেকদিন কাটালেন। তারপর একদিন জীব শ্রীনিবাসকে গোস্বামীদের গ্রন্থ নিয়ে গৌড় দেশে যেতে বললেন, গোপালভট্টও তাতে সম্মতি দিলেন। তখন শ্রীনিবাস গোস্বামীদের এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ * নিয়ে গৌড়ের দিকে রওনা হলেন। বিদায়ের সময়ে লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমকে শ্রীনিবাসের সঙ্গে দিলেন।

শ্রীনিবাস নিজের বাসভূমি যাজিগ্রামে ফিরে এলেন, শত শত বৈষ্ণব প্রতিদিন তাঁর কাছে আসতেন, তাঁদের তিনি গোস্বামীদের গ্রন্থ পড়ে শোনাতেন। সকলের অনুরোধে তিনি বিবাহ করলেন এবং ধর্মচর্চা ও হরিনামগ্রহণের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। একদিন রামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন, শ্রীনিবাস তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে হরিনাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। পরের দিন রামচন্দ্র তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজকেও শ্রীনিবাস দীক্ষা দিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গান লেখার আদেশ দিলেন। শ্রীনিবাস নিজের দু'জন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদেরও দীক্ষা দিলেন। আরও অনেকে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। একবার পুরুষোত্তমে যাওয়ার পথে মল্লরাজ বীর হাম্বীরের রাজ্যে শ্রীনিবাসের কাছ থেকে গ্রন্থ চুরি যাওয়ার পরে শ্রীনিবাস রাজার সভায় গেলেন এবং সেখানে ভাগবতের ব্যাখ্যা করলেন; বীর হাম্বীর তখন তাঁর চরণে পড়লেন; শ্রীনিবাসও তাঁকে কৃপা করলেন।

কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণে শ্রীনিবাস আচার্যের বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নেই। এর থেকে মনে হতে পারে যে 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা কাল্পনিক। কিন্তু তা নয়। 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে এই সাক্ষাৎকার যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার কোন কোন বিষয়ের সমর্থন প্রাচীন ও প্রামাণিক সূত্র থেকে পাওয়া যায়। যেমন, এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় বিষ্ণুপ্রিয়ার কৃচ্ছ্রসাধনের এই বিবরণ পাই,

একবার জপে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর॥

* নিঃসন্দেহে 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র টীকা ও 'গোবিন্দলীলামৃত'—'চৈতন্যচরিতামৃত' তখনও লেখা হয় নি।

তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন হরিনাম।
তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান॥
সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥

('প্রেমবিলাস', ৪র্থ বিলাস)

হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

('ভক্তিরত্নাকর', ৪র্থ তরঙ্গ)

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র (এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ) বৈরাগ্যখণ্ডের ২২শ অধ্যায় (পৃঃ ১২০-২১) থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় ; সেখানে দেখি চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাক্কালে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলছেন,

আতব তণ্ডুল মুষ্টি ভূমে থুয়্যা এক মুষ্টি
একটি তণ্ডুল হাথে করিহ।
হরেকৃষ্ণ হরেরাম বত্রিশ অক্ষর নাম
সাঙ্গ হইলে সে তণ্ডুল ছাড়িহ॥
এই মত জত পার প্রমাণ দুই প্রহর
সে তণ্ডুল রন্ধন করিহ।
সে অন্ন ভোজনে থুয়্যা তুলসী মঞ্জরী দিয়া
কৃষ্ণে নিবেদিয়া ধ্যান করিহ॥
সে মহাপ্রসাদ অন্ন কেবল তুমার ব্রহ্ম
সে অন্ন ভোজন তুমার।

সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদত্ত বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীনিবাস সাক্ষাৎকারের বিবরণ যে নির্ভরযোগ্য সূত্র অবলম্বনে রচিত এবং সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কর্ণপূর কবিরাজের দেওয়া শ্রীনিবাসের জীবন-বিবরণ থেকে ক'টি নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

(১) কিশোর বয়সে চৈতন্যদেবকে দেখবার জন্য নীলাচলের দিকে রওনা হয়ে পথে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সংবাদ পাবার পরে শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয়েছিলেন বলে

'ভক্তিরত্নাকরে' লেখা আছে। কিন্তু চৈতন্যদেব ৪৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করে-ছিলেন; জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের নদীয়াখণ্ড উনত্রিংশ অধ্যায় থেকে জানা যায় গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে কয়েক বছরের ছোট; সুতরাং চৈতন্যদেবের তিরো-ধানের সময়ে গদাধরের বয়স ৪২।৪৩ বছরের বেশি ছিল না। কিন্তু শ্রীনিবাস যখন নীলাচলে পৌঁছেছিলেন—তখন গদাধর পণ্ডিত বৃদ্ধ, দৃষ্টিহীন, স্মৃতিহীন ও দুর্বলমতি। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে শ্রীনিবাস নীলাচলে যাওয়ার পথে চৈতন্যদেবের তিরোধানের সংবাদ পাওয়ার পরে নীলাচলে গিয়ে থাকলেও তার অনেক দিন বাদে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে আবার নীলাচলে যান। আগে উদ্ধৃত কর্ণপূর কবিরাজের দু'টি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

(২) বৃন্দাবন থেকে গৌড়দেশে আসার পথে শ্রীনিবাসের কাছ থেকে গ্রন্থ চুরি যায় নি, চুরি গিয়েছিল গৌড় থেকে পুরুষোত্তমে যাওয়ার সময়। এই কথা নিঃসন্দেহে সত্য, কারণ বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে আসার পথে বিষ্ণুপুর পড়ে না, গৌড় থেকে পুরুষোত্তমে যাওয়ার পথে পড়ে।

(৩) দেশ থেকে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হবার সময় শ্রীনিবাস রূপ ও সনাতন উভয়েই জীবিত আছেন জেনে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনে পৌঁছোবার প্রাক্কালে তিনি রূপ-সনাতনের মৃত্যুসংবাদ পান। এর থেকে বোঝা যায়, সনাতন ও রূপের মৃত্যুর মধ্যে খুবই অল্প ব্যবধান ছিল। শ্রীনিবাসের আর এক শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ তাঁর 'নবপদ্যে'র একটি শ্লোকে ('ভক্তিরত্নাকরে' ধৃত) লিখেছেন যে শ্রীনিবাস রূপ-সনাতনের মৃত্যু সংবাদ পাবার পর তাঁরা স্বপ্নে শ্রীনিবাসকে দেখা দিয়ে বিষাদ পরিত্যাগ করতে, গোপালভট্টের কাছে দীক্ষা নিতে, গৌড়ে (গোস্বামীদের) গ্রন্থ নিয়ে যেতে ও বৈষ্ণবদের শিক্ষাদান করতে বলেছিলেন।*

ইতিপূর্বে আমরা অনুমান করেছি যে, ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রথম বিবাহ হয়েছিল। এর স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে'র চতুর্দশ তরঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যকে লেখা জীব গোস্বামীর দু'টি চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম চিঠিতে জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র বৃন্দাবনদাসের কুশল এবং তিনি কিছু

* "তথাহি নব পদ্যে ॥

স্বপ্নে শ্রীল-সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ
প্রোচুস্তং নহি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ ;
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয় ॥"

লেখাপড়া করতে চেয়েছেন কিনা জানতে চেয়েছেন—"স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি ন বেত্যপি"। দ্বিতীয় চিঠিখানি প্রথম চিঠির কিছুকাল পরে লেখা—কারণ "প্রথম পত্রে লেখা হইয়াছে—হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংশোধন কিঞ্চিৎ বাকী আছে, বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছে; তাই এখন তাহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল না। দ্বিতীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে—পূর্ব্বে আপনার (শ্রীনিবাসের) নিকটে যে হরিনামামৃত-ব্যাকরণ পাঠান হইয়াছে, তাহার অধ্যাপন যদি আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভাষ্য-বৃত্ত্যাদি অনুসারে ভ্রমাদির সংশোধন করিয়া লইবেন।" হরিনামামৃত সংশোধনের আগে প্রথম চিঠি লেখা, সংশোধনের পর বাংলায় পাঠানো এবং তার অধ্যাপনা সুরু হবার সময় উপস্থিত হলে দ্বিতীয় চিঠি লেখা। সুতরাং দুই চিঠির মাঝখানে কয়েক বছর ব্যবধান ধরা যায়। দ্বিতীয় চিঠিতে জীব গোস্বামী লিখেছেন যে, তিনি গোপালচম্পূ (পূর্বচম্পূ) বাংলায় পাঠাচ্ছেন. উত্তরচম্পূ সবেমাত্র লেখা হয়েছে, বিচারমূলক সংশোধন তখনও বাকী আছে। গোপালচম্পূর পূর্বভাগ ও উত্তরভাগের রচনাসমাপ্তিকাল যথাক্রমে ১৫৮৮ খ্রীঃ ও ১৫৯২ খ্রীঃ। এরই মাঝামাঝি সময়ে দ্বিতীয় চিঠি ও তার কয়েক বছর আগে প্রথম চিঠি লেখা হয়। প্রথম চিঠি ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে যদি লেখা হয় এবং সেই সময়ে যদি শ্রীনিবাস আচার্যের ছেলে বৃন্দাবনদাসের লেখাপড়া করবার বয়স হয়, তাহলে বৃন্দাবনদাসের জন্ম প্রায় ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ধরা যায়। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় চিঠিতে জীব গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের ভ্রাতা-ভগিনীদের প্রতিও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। সুতরাং ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীনিবাসের কয়েকটি পুত্রকন্যা হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। অতএব শ্রীনিবাসের বিবাহের সময় ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের বেশি পরে ধরা যায় না।

সুতরাং শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কাল সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত করেছি, তা যথার্থ বলে প্রমাণ হচ্ছে। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস তাঁর 'বৃন্দাবন-কথা'য় লিখেছেন যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরদের বাড়ির এক পুঁথিতে দেখেছেন যে তাতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্যের জন্ম এবং ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোভাব লেখা আছে। এই দুই তারিখ অকৃত্রিম হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

শ্রীনিবাস আচার্যের সময় সম্বন্ধে আমার এই সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে (১৯৫৮) প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীনিবাস আচার্যের কাল সম্বন্ধে রাধাগোবিন্দ নাথের মতের সমর্থক ছিলেন। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' পড়ার পরে ডঃ মজুমদারের মত পরিবর্তিত হয় এবং 'শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালনির্ণয়' প্রবন্ধে (১৩৬৬ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য

পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত) এবং 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য' বইয়ে (পৃঃ ১০৬-১৩১) তিনি এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে আমার সিদ্ধান্তকে শুধু গ্রহণ করেন নি, নানা নতুন যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে তাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাঠকদের ডঃ মজুমদারের ঐ মূল্যবান্ আলোচনা পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'-এ বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল সংক্রান্ত আলোচনায় বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর-মন্দিরের শিলালিপিকে অন্যতম প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন মল্লেশ্বর-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বীর হাম্বীর নন, বীরসিংহ। সেইজন্য বর্তমান গ্রন্থে ঐ "প্রমাণ"-কে ত্যাগ করা হল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'চৈতন্য-পরিকর' গ্রন্থের লেখক আমার ও বিমানবাবুর আবিষ্কৃত তথ্যগুলিকে স্বীকৃতি ছাড়াই ব্যবহার করেছেন।

শ্রীনিবাসের প্রথম বৃন্দাবনে গমনের ও সনাতন-রূপের তিরোভাবের সময়

শ্রীনিবাস আচার্যের প্রথম বৃন্দাবন গমনের তারিখ নির্ণয়ের কিছু কিছু সূত্র 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর ৪র্থ তরঙ্গে লেখা আছে যে বৃন্দাবন গমনের সঙ্কল্প নিয়ে মথুরায় উপনীত হয়ে শ্রীনিবাস "দুই চারি বিপ্র"র কাছে—কাশীশ্বর গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেলেন। এতে শ্রীনিবাস মর্মাহত হয়ে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন এবং তারপর বাংলার দিকে ফিরে চললেন ("উলটি চলিল পুনঃ পূর্ব্বদেশ-পানে ॥")। অনেক দূর হাঁটার পরে রাত্রি হল, তখন শ্রীনিবাস "পথে এক বৃক্ষ দেখি তথাই রহিল"। তারপর তিনি নিদ্রিত হয়ে পড়লেন ; তখন রূপ-সনাতন তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বৃন্দাবনে ফিরে যেতে ও গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা নিতে বললেন।

পরের দিন অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন প্রভাতে শ্রীনিবাস আবার বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা সুরু করলেন ("হইয়া বিহ্বল প্রাতে চলে উলটিয়া ॥")। এদিকে সেই দিন রাত্রিতেই রূপ-সনাতন জীব গোস্বামীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন শ্রীনিবাস আজই বৃন্দাবনে প্রবেশ করছেন ; সংশ্লিষ্ট অংশটি আমরা উদ্ধৃত* করছি,

বৈশাখমাসের এই বিংশতি দিনেতে।
হইবে অপূর্ব্ব সঙ্গ কহিল পূর্ব্বেতে ॥

* গৌড়ীয় মিশন থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর', পৃঃ ৮৩ থেকে উদ্ধৃত। পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলিতে এই সংস্করণেরই পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

তিঁহ আজি আসি প্রবেশিবে বৃন্দাবনে।
পাইবে পরমানন্দ তাঁহার মিলনে॥

কিছু পরে রূপ-সনাতন গোপাল ভট্টকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন যে শ্রীনিবাস ইতিমধ্যেই বৃন্দাবনে এসে গিয়েছেন ("আইল তোমার শ্রীনিবাস গৌড় হইতে।")। যা হোক, উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করেছি—তার থেকে পাওয়া যায় যে, এই দ্বিতীয় দিনের তারিখ ২০শে বৈশাখ; এই দিন প্রাতঃকালেই শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের দিকে ফিরে চলা শুরু করেন এবং এই দিন রাত্রিতেই তিনি বৃন্দাবনে পৌছোন।

তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে জীব ও গোপাল ভট্ট পরস্পরের স্বপ্নের কথা পরস্পরকে বললেন। জীব শ্রীনিবাসের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে প্রবেশ করার পর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও "ব্রজবাসি-বৈষ্ণবের আলয়" দেখে সারাদিন কাটালেন। সন্ধ্যায় তিনি গোবিন্দের মন্দিরে* গেলেন। সেখানেই জীব গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। দু'জনের মিলন-সম্ভাষণের পর জীব শ্রীনিবাসকে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন।

এই তৃতীয় দিনের তিথিটি 'ভক্তিরত্নাকর'-এ দু' জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমবার পরোক্ষভাবে—জীব ও গোপাল ভট্টের স্বপ্নের কথা নিয়ে আলোচনা করার সময়ে; সেখানে লেখা হয়েছে যে শ্রীনিবাসের আসার কথা শুনে জীব অস্থির হয়ে উঠলে গোপাল ভট্ট

শ্রীজীবে করিলা স্থির অনেক কহিয়া॥
রাধারমণের সিংহাসন-যাত্রা হয়।
এ হেতু হইয়া ব্যস্ত করে আয়োজন॥ (পৃঃ ৮৪)

* রাধাগোবিন্দ নাথের মতে এই গোবিন্দের মন্দির অম্বরের রাজা মানসিংহ কর্তৃক নির্মিত গোবিন্দ-মন্দির, যার নির্মাণকাল ১৫৯০ খ্রীঃ। কিন্তু একাধিক গবেষক 'চৈতন্যচরিতামৃত'র অন্ত্যলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে রঘুনাথ ভট্ট তাঁর অনেক শিষ্যকে আদেশ দিয়ে একটি গোবিন্দ-মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন ('নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল। বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥') এই শিষ্য মহারাজ মানসিংহ হতে পারেন না। কারণ মানসিংহ-নির্মিত মন্দিরের শিলালিপিতে রঘুনাথ ভট্টের নাম বা আজ্ঞার কোনই উল্লেখ নেই। রঘুনাথ ভট্ট যে শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবনে প্রথম আগমনের আগে পরলোকগমন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সব লেখকই একমত। সুতরাং শ্রীনিবাস যে রঘুনাথ ভট্টের শিষ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেই জীব গোস্বামীর প্রথম দেখা পেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এর কিছু পরেই বলা হয়েছে যে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাধারমণের সিংহাসন-যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়,

শ্রীবৈশাখ মাসে শ্রীপূর্ণিমা-শুভক্ষণে।
শ্রীরাধারমণ বসিলেন সিংহাসনে॥ (পৃঃ ৮৬)

দ্বিতীয়বার কিন্তু আলোচ্য দিনের তিথিটি প্রত্যক্ষ ভাবেই উল্লিখিত হয়েছে, জীব গোস্বামীর শ্রীনিবাসকে নিজের বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনার বর্ণনার মধ্যে; এই বর্ণনা 'ভক্তিরত্নাকর'-এর ৪র্থ তরঙ্গ থেকে উদ্ধৃত করলাম,

শ্রীজীব নিভৃতে বাসা দিল শ্রীনিবাসে।
শ্রীনিবাস রহে তথা মনের উল্লাসে॥
বৈশাখী পূর্ণিমা-নিশি শোভা চমৎকার।
প্রফুল্লিত নানা পুষ্প সৌগন্ধ্য বিস্তার॥ (পৃঃ ৮৫)

উপরে যে আলোচনা করা হল, তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় * যে, 'ভক্তিরত্নাকর'-এর মত অনুসারে শ্রীনিবাস এমন এক বছরে বৃন্দাবনে প্রথম গিয়েছিলেন, যে বছরে ২০শে বৈশাখের পর দিন অর্থাৎ ২১শে বৈশাখ ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

১৪৭৬ শকাব্দ বা ১৫৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন গোস্বামী 'ভাগবত'-এর 'বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণী' টীকা রচনা করেছিলেন; সুতরাং সনাতন অন্তত ঐ বছর অবধি জীবিত ছিলেন। এর পরে কোন এক বছর শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে প্রথম যান। স্বামী কান্নু পিল্লাইয়ের Indian Ephemeries (Vol. V) থেকে দেখছি যে, ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী বহু বছরের মধ্যে একমাত্র ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি ২১শে বৈশাখে পড়েছিল; ঐ তারিখে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিদধিক ছয় ঘণ্টা পরে (বেলা এগারটার সামান্য পরে) পূর্ণিমা সুরু হয়েছিল † (Indian Ephemeries, Vol. V, p. 326 দ্রষ্টব্য) ঐদিনের সারা রাত্রিই পূর্ণিমা ছিল। ঐ দিন ইংরেজী তারিখ ছিল ১৮ই এপ্রিল।

* রাধাগোবিন্দ নাথ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা'য় শ্রীনিবাসের প্রথম বৃন্দাবনে গমনের দিনে যুগপৎ ২০শে বৈশাখ তারিখ এবং বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি ছিল মনে করে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং কোন্ কোন্ বছরের ২০শে বৈশাখে পূর্ণিমা তিথি ছিল—তা' অনর্থক গণনা করেছেন।

† 'ভক্তিরত্নাকর'-এর বিবরণে দেখি শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবনে প্রবেশের পর দিন সকালে জীব ও গোপাল ভট্ট নিজেদের মধ্যে আগের রাত্রিতে দেখা স্বপ্ন সম্বন্ধে ও শ্রীনিবাস সম্বন্ধে আলোচনা করলেন—তার পর গোপাল ভট্ট রাধারমণের সিংহাসন-যাত্রার "আয়োজন" করতে লাগলেন, এর থেকে বোঝা যায়, সিংহাসন-যাত্রা অনুষ্ঠানের তখনও কিছু দেরী ছিল। এই বিষয়টি থেকেও ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দকে আলোচ্য ঘটনার কাল ধরার সমর্থন পাওয়া যায়—কারণ ঐ বছরের রাধারমণের সিংহাসন-যাত্রা বেলা এগারটার পরে (পূর্ণিমা তিথি সুরু হওয়ার পরে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অবশ্য, আলোচ্য বিষয়ে 'ভক্তিরত্নাকর' এর বিবরণ নির্ভরযোগ্য কিনা, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। নির্ভরযোগ্য না হবার কোন কারণ নেই, কারণ 'ভক্তিরত্নাকর'-এর এই বিবরণে উল্লিখিত ঘটনাগুলির অধিকাংশেরই সমর্থন কর্ণপূর কবিরাজের 'শ্রীনিবাসাচার্য্য-গুণলেশসূচক' থেকে পাওয়া যায়। দু'একটি খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণের সঙ্গে 'ভক্তিরত্নাকর'-এর বিবরণের অমিল আছে, * কিন্তু সেগুলি নিতান্তই গৌণ বিষয়। এই সব খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়ত 'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা ভুল করেছেন, কিন্তু সে কথাও জোর করে বলা চলে না—কারণ 'ভক্তিরত্নাকর'-কার বহু সমসাময়িক ও প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁর বিবরণ প্রস্তুত করেছেন এবং আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের 'নবপদ্য' প্রভৃতি প্রামাণিক রচনা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

অতএব 'ভক্তিরত্নাকর'-এর বিবরণের উপর নির্ভর করে আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে শ্রীনিবাস আচার্য প্রথম বৃন্দাবনে যান ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে এবং ঐ বছরের ১৮ই এপ্রিল তারিখের (২১শে বৈশাখ, ১৫৮৪ শকাব্দ) সন্ধ্যায় জীব গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা'য় রাধাগোবিন্দ নাথ লিখেছেন, "কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় শ্রীগোপাল-ভট্টগোস্বামীর নিকটে তিনি (শ্রীনিবাস আচার্য) দীক্ষা লাভ করিয়া-ছিলেন।" কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে রাধাগোবিন্দবাবুর অন্য অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিও ভুল। যে 'ভক্তিরত্নাকর'-এর বিবৃতির উপর নির্ভর করে রাধাগোবিন্দবাবু এই উক্তি করেছেন, তাতে লেখা আছে যে "বৈশাখী পূর্ণিমা নিশি" বিনিদ্রভাবে যাপন করার পরে সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সেরে শ্রনিবাস জীব গোস্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে প্রথমে রাধাদামোদরকে, পরে রূপ গোস্বামীর সমাধি দর্শন করলেন; অতঃপর

* যেমন, 'ভক্তিরত্নাকর'-এর মতে জীব গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগের দিন শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু কর্ণপূর কবিরাজ লিখেছেন যে, আগের দিন শ্রীনিবাস মথুরায় প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানে একদিন কাটাবার পরে পর দিন তিনি বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন ও সেই দিনই জীব গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কর্ণপূর কবিরাজ লিখেছেন ২০ শে বৈশাখ তারিখে ("বৈশাখ-মাসেহংশকে বিংশে") শ্রীনিবাস মথুরায় প্রবেশ করেছিলেন (এই বিষয়টি শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন রায় আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁর 'শ্রীনিবাস আচার্য' নামক প্রকাশিতব্য গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন)। সুতরাং শ্রীনিবাসের সঙ্গে জীব গোস্বামীর প্রথম সাক্ষাৎকার যে ২১ শে বৈশাখ তারিখে সংঘটিত হয়েছিব—তা কর্ণপূর কবিরাজের সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণিত হয়।

তিনি গোপাল ভট্টের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা লাভ করতে চাইলেন; এর পর 'ভক্তিরত্নাকরে' (৪র্থ তরঙ্গ, পৃঃ ৮৬) লেখা হয়েছে,

শ্রীনিবাস দীক্ষা-হেতু ব্যাকুল হিয়ায়।
গোস্বামীর অনুমতি হৈল দ্বিতীয়ায়॥

এর থেকে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয়ার দিনে শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা লাভের অনুমতি পেয়েছিলেন, দীক্ষা পান নি। শ্রীনিবাস দীক্ষা লাভ করেছিলেন তার পর দিনে—এ কথা জানা যায় এর কিছু পরের এই পংক্তিগুলি (পৃঃ ৮৯) থেকে,

তার পরদিন স্নান করি' শ্রীনিবাস।
শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা গোস্বামীর পাশ॥

শ্রীনিবাসে শ্রীরাধারমণ-সন্নিধানে।
করিলেন শিষ্য অতি অপূর্ব্ব বিধানে॥

শ্রীনিবাস আচার্যের প্রথম বৃন্দাবন গমনের তারিখ স্থির করা হল। এখন আমাদের এর ভিত্তিতে—সনাতন ও রূপ কবে পরলোকগমন করেছিলেন, তা স্থির করতে হবে।

সনাতন যে ১৪৭৬ শক বা ১৫৫৩-৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। সনাতন যে এর পরের বছর অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দ বা ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন, তা ঐ সালে রচিত জীব গোস্বামীর 'মাধবমহোৎসব' কাব্যের প্রথম উল্লাসের একটি শ্লোক থেকে মনে হয়। শ্লোকটি এই,

অঙ্ঘ্রিযুগ্মমিহ সার-সারস-স্পর্দ্ধিমূর্দ্ধনি দধাতু মামকে।
যঃ সনাতনতয়া স্ম বিন্দতে বৃন্দকারণ্যমমন্দমন্দিরম্॥

শ্লোকটির অর্থ :—

'যিনি চিরকালের জন্য বৃন্দাবনে উৎকৃষ্ট মন্দির (বাসস্থান) লাভ করেছেন (অর্থাৎ বৃন্দাবন ছেড়ে যিনি কোথাও যান না), তিনি (কৃষ্ণ) তাঁর উত্তম প্রস্ফুটিত পদ্মের মত পদযুগল আমার মাথায় স্থাপন করুন।'

কিন্তু শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণে "সনাতনতয়া" শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে মনে হয় শ্লোকটির আরও একটি অর্থ আছে এবং সে অর্থে জীব গোস্বামীর জ্যেষ্ঠতাত সনাতনের কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়টির কথা ইতিপূর্বে বলেছেন ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদার ও তাঁর অনুবর্তী লেখক ডঃ নরেশচন্দ্র জানা ('ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য' পৃঃ ১১৮ এবং 'বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী', পৃঃ ৬৫ দ্রষ্টব্য); তাঁরা

দু'জনেই 'কৃষ্ণ'পক্ষে ও 'সনাতন'পক্ষে এই শ্লোকটির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের 'সনাতন'পক্ষের ব্যাখ্যা অনুসারে শ্লোকটিতে সনাতনের তিরোধানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের ব্যাখ্যার মারাত্মক ত্রুটি এই যে, 'কৃষ্ণ'পক্ষের ব্যাখ্যায় ও 'সনাতন' পক্ষের ব্যাখ্যায়—উভয় ব্যাখ্যাতেই তাঁরা "সনাতনতয়া" শব্দটিকে 'চিরকালের জন্য' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু "সনাতনতয়া" শব্দটির ব্যাখ্যায় 'সনাতন' নামকে না আনলে এই শ্লোকের সঙ্গে সনাতন গোস্বামীর কোন সম্পর্কই থাকে না। সুতরাং এঁদের 'সনাতন'পক্ষের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। "সনাতনতয়া" শব্দের মধ্যে 'সনাতন' নাম আছে ধরলে এই শ্লোকটির অর্থ হবে,

'যিনি সনাতনত্বহেতু বৃন্দাবনে উৎকৃষ্ট মন্দির (বাসস্থান) প্রাপ্ত হয়েছেন, (তিনি) তাঁর উত্তম প্রস্ফুটিত পদ্মের মত পদযুগল আমার মাথায় স্থাপন করুন।' (বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ এই অর্থ করেছেন।)

এই অর্থ অনুসারে—আলোচ্য শ্লোকটি রচনার সময়ে সনাতন গোস্বামী জীবিত ছিলেন এবং বৃন্দাবনে বাস করছিলেন।

অন্য দিক দিয়ে বিচার করলেও—আলোচ্য শ্লোকে সনাতন গোস্বামীর মৃত্যুর কথা ব্যক্ত হওয়ার অসম্ভাব্যতা বোঝা যাবে। সনাতন ১৪৭৬ শকাব্দে জীবিত ছিলেন এবং ভাগবতের 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী' টীকা রচনা করেছিলেন। তার অব্যবহিত পরেই তিনি মারা গেলেন এবং এর অব্যবহিত পরে লেখা 'মাধবমহোৎসব'-এর একেবারে গোড়ার দিকের শ্লোকে জীব গোস্বামী তাঁর তিরোধানের কথা বললেন—এই জাতীয় ঘটনা মোটেই সুলভ নয়।

রূপ গোস্বামী যে সনাতনের মৃত্যুর পরেও কিছুকাল জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায় (বিশ্বভারতী পল্লীসদনের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন রায় এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন)। ঐ পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে রূপ-সনাতন গোবর্ধন পর্বতে চড়তেন না, কিন্তু তবুও তাঁদের গোবর্ধন পর্বতের গোপালকে দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল, কারণ

কোন ছলে গোপাল উতরে আপনে ॥
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে ॥
পর্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তাঁ সবারে দিয়াছেন দর্শন ॥

এর পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন,

বৃদ্ধকালে রূপ গোঁসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
এক মাস রহিল বিট্ঠলেশ্বর ঘরে ॥
তবে রূপ গোঁসাঞি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন যে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, লোকনাথ গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, যাদব আচার্য, গোবিন্দ গোস্বামী, উদ্ধব দাস, হু'জন মাধব, গোপাল দাস, নারায়ণ দাস, গোবিন্দ ভকত, বাণী কৃষ্ণদাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান ও লঘু হরিদাস মথুরায় গোপাল দর্শন করতে গিয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়—সনাতন ঐ সময়ে পরলোকে, তা না হলে তিনিও গোপাল দর্শন করতে যেতেন। রাধাগোবিন্দ নাথও লিখেছেন,"···মনে হয় শ্রীপাদ সনাতনের অন্তর্দ্ধানের পরেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি তখন প্রকট থাকিলে তিনিও গোপাল-দর্শনে যাইতেন। অতি বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত অশক্ত বলিয়াই যে তিনি যাইতে পারেন নাই, তাহাও মনে হয় না; সেইরূপ অবস্থা হইলে তাঁহাকে একাকী বৃন্দাবনে রাখিয়া যে শ্রীরূপাদি একমাস পর্য্যন্ত অন্যত্র থাকিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।"

প্রেমবিলাস-এর পঞ্চম বিলাসে লেখা আছে যে শ্রীনিবাসের প্রথম বৃন্দাবনে প্রবেশের চার দিন আগে রূপ গোস্বামীর এবং তার চার মাস আগে সনাতন গোস্বামীর মৃত্যু হয়েছিল। একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে প্রবেশের মাত্র চার দিন আগে যদি রূপ গোস্বামীর মৃত্যু হত, তা' হলে জীব ও গোপাল ভট্টের শ্রীনিবাসকে আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানাবার মত মনের অবস্থা থাকত না। তাছাড়া 'প্রেমবিলাস'-এর এই কথা সত্য হলে বলতে হবে রূপ বৈশাখ মাসে এবং সনাতন পৌষ মাসে পরলোকগমন করেছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় সনাতনের এবং শ্রাবণ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে রূপের তিরোভাব-দিবস পালন করেন। বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত ১৬২০ শকাব্দে (১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ) রচিত সংস্কৃত পাতড়ার (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৫৯ দ্রষ্টব্য) শেষাংশে সনাতনকে "শ্রীশ্রীবড় গোস্বামী" ও রূপকে "শ্রীশ্রীমধ্যম গোস্বামী" বলা হয়েছে এবং তাঁদের "দিবস" যথাক্রমে "আষাঢ়ী পূর্ণিমা" ও "শ্রাবণের শুক্লা দ্বাদশী" বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে (বা. সা. ই. ১। পূঃ, ৪র্থ সং, পৃঃ

৩০৯, পা টী.)। অতএব সনাতন ও রূপের মৃত্যু-সময় সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাস'-এর উক্তিকে কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না।

সনাতন ও রূপ যে শ্রীনিবাসের প্রথম বৃন্দাবনে গমনের অল্প আগে পরলোকগমন করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই ; শ্রীনিবাসের শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের 'গুণলেশ-সূচক' থেকে জানা যায় যে, শ্রীনিবাসের বাংলা থেকে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হবার আগে বাংলা দেশের কেউ সনাতন-রূপের মৃত্যু-সংবাদ জানতেন না। সনাতন ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ ১৪৮২ শকাব্দের আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এবং রূপ ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ ১৪৮৩ শকাব্দের শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীতে পরলোকগমন করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। এর আগে তাঁরা পরলোকগমন করে থাকলে তাঁদের মৃত্যু-সংবাদ শ্রীনিবাসের বাংলা ত্যাগের আগে বাংলায় না পৌঁছোবার কোন কারণ দেখা যায় না।

ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি যে যখন "ম্লেচ্ছ ভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে"—তখন রূপ সঙ্গীদের নিয়ে মথুরায় গোপাল দর্শনে গিয়েছিলেন, * এ কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ

* ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বল্লাভাচারী সম্প্রদায়ের কোনও লোকের লেখা "শ্রীপুষ্টিমার্গীয় শ্রীআচার্য্যজী মহাপ্রভুনকে নিজসেবক চৌরাশী বৈষ্ণবন্‌কী বার্ত্তা" বইয়ের অংশবিশেষের উপর নির্ভর করে লিখেছেন যে, গোপাল বা শ্রীনাথজীর সেবা থেকে বাঙালীদের (বল্লভাচার্য কর্তৃক নিযুক্ত) কৃষ্ণদাস অধিকারী (ইনিও বল্লভাচার্য কর্তৃক নিযুক্ত) বলপূর্বক অপসারিত করলে বাঙালীরা মথুরার হাকিমের কাছে যে মামলা করে, তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্যই রূপ এইভাবে সদলবলে মথুরায় গিয়েছিলেন।—শুধুমাত্র গোপালকে দেখতে যান নি (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ৩৭৯-৮১)। কিন্তু ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের এই মত সমর্থন করা যায় না। কারণ প্রথমত "চৌরাশী বৈষ্ণবন্‌কী বার্ত্তা' বইকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলা যায় না : এ বই কার লেখা এবং কবে লেখা তা জানা নেই। (কারও কারও মতে এর লেখক বল্লভাচার্যের পৌত্র, কিন্তু এই মতের অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই—এই বইয়ের ভুল-ভ্রান্তির প্রাচুর্য এই মতের বিপক্ষে একটি বড় প্রমাণ।) দ্বিতীয়ত, এই বইয়ের আলোচ্য বিবরণে মারাত্মক কালবৈষম্য আছে, এতে বলা হয়েছে বাঙালীদের তাড়াবার সুবিধা হবে বলে টোডরমল্ল ও বীরবলকে বিট্‌ঠলদাস (বল্লভাচার্যের পুত্র) চিঠি দিলেন অড়েল বা আড়েল (এলাহাবাদের কাছে অবস্থিত) থেকে (তিনি তখন সেখানেই বাস করতেন) এবং সেই চিঠি নিয়ে কৃষ্ণদাস আগ্রায় গেলেন ; কিন্তু টোডরমল্ল ও বীরবল সামান্যতমও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করার অন্তত ১৫ বছর আগে বিট্‌ঠলদাস আড়েল থেকে বাস উঠিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, আলোচ্য বিবরণে লেখা আছে যে রূপ-সনাতন শুধুমাত্র গোপালের সেবা থেকে বিতাড়িত বাঙালীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন, তাদের মামলায় তাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, এমন ইঙ্গিত তাতে নেই। চতুর্থত, ঐ বিবরণে স্পষ্ট লেখা আছে যে মামলা চলার সময়ে ও আগে বিট্‌ঠলদাস আড়েলে এবং "গোপাল" বা "শ্রীনাথজী" গোবর্ধনে ছিলেন, তাঁরা কেউই মথুরায় আসেন নি। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপরে উল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে এই মামলার কোন সম্পর্কই নেই।

বলেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই উক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই নেই। এখন, গোপালের "ম্লেচ্ছভয়" হতে পারে দু' রকমের পরিস্থিতিতে—(১) যখন দেশের মুসলমান রাজশক্তি হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী এবং মন্দির-মূর্তি ধ্বংসে তৎপর এবং (২) যখন রাজশক্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং দেশের অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিচ্ছিন্ন পরধর্মদ্বেষী মুসলমান-গোষ্ঠী হিন্দুর মন্দির ও মূর্তির উপর হামলা করার সুযোগ পাচ্ছে। শের শাহের মৃত্যু (১৫৪৫ খ্রীঃ) এবং আকবরের নিজের হাতে শাসনভার নেওয়ার (১৫৬১ খ্রীঃ) মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর ভারতে দ্বিতীয় ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছিল এবং এর মধ্যে কোন কোন সময়ে প্রথম ধরনের পরিস্থিতিও দেখা দিত। আকবর স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় ধরনের পরিস্থিতি আর ছিল না; তার পরেও কোথাও স্থানীয় শাসনকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রথম ধরনের পরিস্থিতি যদি থেকে থাকে, ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবর মথুরার তীর্থযাত্রীদের উপর থেকে কর তুলে নেওয়ার (অর্থাৎ আকবরের উদার ধর্মনীতি পুরোপুরি চালু হবার পর) ও ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করার পর তার সম্পূর্ণ অবসান হয়েছিল।

সুতরাং "ম্লেচ্ছভয়ে" গোপালের মথুরায় আগমন ও রূপ গোস্বামীর তাঁকে দেখতে যাওয়া নিঃসন্দেহে ১৫৬৩ খ্রীঃর আগেকার এবং খুব সম্ভবত ১৫৬১ খ্রীঃরও আগেকার ঘটনা। সনাতন তার আগেই পরলোকগমন করেছিলেন।*

শ্রীনিবাস আচার্যের রচনা

শ্রীনিবাস আচার্যের অল্প কিছু বাংলা ও সংস্কৃত রচনা পাওয়া গিয়েছে। "শ্রীনিবাস দাস" ভনিতাযুক্ত একটি পদ 'ভক্তিরত্নাকরে' শ্রীনিবাস আচার্যের রচনা বলে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে, সুতরাং এটি শ্রীনিবাস আচার্যেরই লেখা। রামগোপাল দাসের 'রসকল্প-বল্লী' ও মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী'তে "শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের" রচনা বলে একটি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটিও নিঃসন্দেহে শ্রীনিবাস আচার্যের রচনা। পদটির আরম্ভ,

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ার বাহিরে পরবাস।

* রূপ-সনাতনের জীবৎকাল সম্বন্ধে গ্রাউজের District Memoirs of Mathura নামক বইটির মধ্যে যে সমস্ত কথা লেখা আছে, তাদের বেশির ভাগই অমূলক, ডঃ নরেশচন্দ্র জানা 'বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী' বইতে (পৃঃ ৬৫-৬৬, ৮৭) সেগুলি খণ্ডন করেছেন। বাহুল্যবোধে আমরা সেগুলির পুনরালোচনা করলাম না।

'পদকল্পতরু'র ৩০৭২ সংখ্যক প্রার্থনা-বিষয়ক পদটিও নিঃসন্দেহে শ্রীনিবাস আচার্যের রচনা; কারণ এর ভনিতায় 'শ্রীনিবাস' ('শ্রীনিবাস দাস' নয়) নাম পাওয়া যায়; ভনিতাটি এই,

কহই কাতর ভাষে পুন পুন শ্রীনিবাসে
করুণায় করু অবধানে ॥

এ ছাড়া শ্রীনিবাস আচার্যের এইসব সংস্কৃত রচনা এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে,

(ক) ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ভাষ্য, (খ) ষড়গোস্বামী সম্বন্ধীয় অষ্টক, (গ) নরহরি সরকার সংক্রান্ত অষ্টক, (ঘ) রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণয়ে' উদ্ধৃত রঘুনন্দনের প্রশস্তি-শ্লোক, (ঙ) বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত আরও কয়েকটি শ্লোক। [হরিদাস দাস সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগ্রন্থমালা' দ্রষ্টব্য]।

॥ উনিশ ॥

নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ দাস

নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ দাস শ্রীনিবাস আচার্যের সমসাময়িক বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক, ধর্মপ্রচারক, কবি ও গ্রন্থকার। যে সব গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়, সেই সব গ্রন্থে নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য মেলে।

নরোত্তম সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি বিবরণ পাওয়া যায় নরহরি চক্রবর্তীর 'নরোত্তম-বিলাস' গ্রন্থে। সমসাময়িক না হলেও এই গ্রন্থের সাক্ষ্য মূল্যবান। এই গ্রন্থে লেখা আছে যে, নরোত্তমের পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ, মাতার নাম নারায়ণী। এই গ্রন্থ ও 'নরোত্তমবিলাসে' উদ্ধৃত গোবিন্দদাস কবিরাজের অধুনালুপ্ত নাটক 'সঙ্গীতমাধব'-এর একটি উক্তি* (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'নরোত্তমবিলাস,' ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৯০) থেকে জানা যায় যে—নরোত্তমের বাড়ি ছিল পদ্মাতীরে বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে; গৌড়ের সুলতানের মহামাত্য পুরুষোত্তম ছিলেন তাঁর পিতৃব্য; পুরুষোত্তমের পুত্র সন্তোষ দত্ত নরোত্তমের শিষ্য ছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের লেখা 'শ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশসূচক' থেকে জানা যায় (অন্যান্য গ্রন্থেও লেখা আছে) যে, শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে যান (১৫৬২ খ্রীঃ), তখন নরোত্তম বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীনিবাস বৃন্দাবন থেকে বাংলায় ফেরবার সময়ে লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমকে শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেন। শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে দেশে ফিরে নরোত্তম ভক্তিধর্ম প্রচার করেন এবং খেতরী, কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডের মহোৎসবে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। খেতরীর উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত।

* "পদ্মাবতীতীরবর্ত্তি - গোপালপুরনগরনিবাসি - গৌড়াধিরাজ - মহামাত্যশ্রীপুরুষোত্তমদত্তসত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষ-দত্তঃ। স হি শ্রীনরোত্তমদত্তসত্তমমহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ। তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্ব্বরাগাদিবিলাসার্হ-সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য, নানারত্নাদিদানেন সাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতোঽস্তি।"

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই অংশটুকু 'নরোত্তমবিলাস' থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১৩১৭, পৃঃ ৫৫৭)। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "সঙ্গীতমাধবের খণ্ডিত পুথি উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক পণ্ডিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় দেখিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিয়াছিলেন" (বা. সা. ই. ১। পূঃ, ৪র্থ সং, পৃ ৪৬৯, পাদটীকা)। এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। ডঃ সেন বোধ হয় 'নরোত্তম-বিলাস' ভাল করে পড়েন নি।

১৭৪৩ শকাব্দের এক পুথিতে প্রাপ্ত (বা. সা. ই. ১।পূঃ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৪২ দ্রঃ) একটি পদে দেখি—নরোত্তম লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য ও রামচন্দ্র ক বিরাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছেন।

ঐ পদটির প্রথম আট ছত্রে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাই (ডঃ সুকুমার সেন ছত্র-গুলির তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি)। সেটি এই—নরোত্তমের গুরু লোকনাথ গোস্বামী পরলোকগমন করলে নরোত্তম শোকে বিহ্বল হন এবং আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে তিনি জলে ঝাঁপ দেন; সেখানে শ্রীনিবাস আচার্য উপস্থিত ছিলেন, তিনি নরোত্তমকে চুলে ধরে জল থেকে তুলে বাঁচান; এর পর তিনি নরোত্তমকে দশ রাত্রি নিজের কাছে রেখে দেন এবং তার পরে নরোত্তমকে রামচন্দ্র কবিরাজের কাছে সমর্পণ করেন। রামচন্দ্রকে তিনি বলে দেন নরোত্তমের যেন কিছু না হয়, অর্থাৎ নরোত্তম যেন আত্মহত্যা করতে না পারেন সেদিকে যেন রামচন্দ্র দৃষ্টি রাখেন; এ কথা রামচন্দ্র নরোত্তমকে বারবার বলতেন। নীচে ছত্র আটটির বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করলাম,

পতি বিনে সতী কাঁদে শিরে দিয়া হাত।
এই দশা করি গেল স্বামী লোকনাথ॥
পড়িনু অগাধ জলে কূল রহে দূর।
কেশে ধরি তুলিলেহ আচার্য্য ঠাকুর॥
দশ রাত্রি সঙ্গে করি বহু কৃপা কৈল।
রামচন্দ্র কবিরাজের সাথে সঁপি দিল॥
আমার আগে রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ কয়।
এই কৈল যেন কিছু নরোত্তমে নয় (পাঠ—রয়)॥

'নরোত্তমবিলাসে'র একাদশ বিলাসে সঙ্কলিত নরোত্তমের দু'টি পদেও শ্রীনিবাস আচার্যের তিরোধানে নরোত্তমের শোক বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটিতে রামচন্দ্রের দেখা না পাওয়ার (রামচন্দ্র কবিরাজ তখনও জীবিত) এবং দ্বিতীয়টিতে রামচন্দ্রের মৃত্যুর উল্লেখ আছে।

নরোত্তম যে রামচন্দ্র কবিরাজ এবং তাঁর ভাই গোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে অন্তত কিছুদিন ছিলেন, তা জানা যায় 'ভক্তিরত্নাকর'-এর চতুর্দশ তরঙ্গে রক্ষিত জীব গোস্বামীর একটি চিঠি থেকে। জীব গোস্বামী এই চিঠিটি একযোগে রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ-দাস কবিরাজ ও নরোত্তমকে লিখেছেন। তিনজনে এক জায়গায় না থাকলে এ ভাবে চিঠি লেখা সম্ভব হত না।

'নরোত্তমবিলাস'-এর একাদশ পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে রামচন্দ্র কবিরাজের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে নরোত্তমের জ্বর হয় এবং গঙ্গাতীরবর্তী গাম্ভীলা গ্রামে তাঁর মৃত্যুর অনুরূপ অবস্থা দেখা দেয়। ভক্তেরা তখন চিতা প্রস্তুত করে তাঁকে শোয়ান, কিন্তু নরোত্তম "পুনর্জীবন" লাভ করে চিতা থেকে উঠে আসেন। এর কিছুদিন পরে নরোত্তম পরলোকগমন করেন, 'নরোত্তমবিলাসে'র মতে তিনি "দুগ্ধ প্রায় মিলাইলা গঙ্গার জলেতে।" নরোত্তমের তিরোধানের পরে ভক্তেরা যে মহোৎসব করেন, তাতে গোবিন্দদাস কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন।

নরোত্তম তাঁর পদের মধ্যে যেভাবে শ্রীনিবাস আচার্যের উল্লেখ করেছেন, তার থেকে মনে হয়, শ্রীনিবাস তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এ দিকে নরোত্তম শ্রীনিবাসের মৃত্যুর পরে ও গোবিন্দদাস কবিরাজের মৃত্যুর আগে পরলোকগমন করেন। সুতরাং তাঁর আনুমানিক জীবৎকাল ১৫৪০-১৬১০ খ্রীঃ ধরা যায়।

'নরোত্তমবিলাসে' লেখা আছে যে জীব গোস্বামী নরোত্তমকে "দিলেন পদবী শ্রীঠাকুরমহাশয়।" কিন্তু শ্রীনিবাসের 'আচার্যঠাকুর' পদবীর মত নরোত্তমের এই পদবী লোকের কাছে ততটা সুপরিচিত নয়।

বল্লভদাস নামক একজন কবির মতে নরোত্তম দাস বহু গ্রন্থ—পাঁচ "চন্দ্রিকা", তিন "মণি", 'প্রার্থনা' 'গুরুশিষ্যসংবাদপটল' এবং 'হাটপত্তন' লিখেছিলেন। এদের মধ্যে 'গুরুশিষ্যসংবাদপটল', 'হাটপত্তন' এবং 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' নিঃসন্দেহে নরোত্তমের রচনা। নরোত্তমের লেখা অনেক পদও পাওয়া গিয়েছে। তাঁর প্রার্থনা-বিষয়ক পদগুলিই উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত।

সহজিয়ারাও নরোত্তমকে দলে টানবার চেষ্টা করেছে এবং তাঁর নামে অনেক গ্রন্থ ও পদ রচনা করেছে। বলা বাহুল্য এগুলি নরোত্তমের লেখা হতে পারে না। শুধু সহজিয়া নয়, অ-সহজিয়া যে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থ নরোত্তমের নামে চলিত আছে, তাদেরও অনেকগুলি জাল রচনা।

নরোত্তম সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের কোন কোন উক্তি (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৪০-৪২ দ্রষ্টব্য) বিস্ময়কর। যেমন, তিনি বলেছেন, "সম্ভবত এইখানেই (অর্থাৎ বৃন্দাবনে) শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে তাঁহার (অর্থাৎ নরোত্তমের) মিলন।" এ রকম একটা প্রশ্নাতীত সত্যকে ডঃ সেন "সম্ভবত" দিয়ে আচ্ছন্ন করছেন কেন? শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোত্তমের প্রথম মিলন যে বৃন্দাবনে হয়েছিল, তা তো শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যের লেখা 'শ্রীনিবাসাচার্য্যগুণলেশ-

সূচক' (বহুদিন আগেই বইটি আবিষ্কৃত ও হরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে—
—"নরোত্তমবিলাসে' এ বইটি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে) থেকেই জানা যায়। তারপর, ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে খেতরী-উৎসব ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দের "আরও বিশ-পঁচিশ বছর পরে হওয়া অসম্ভব নয়।" খেতরী উৎসবে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন সক্রিয় ও প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন ; রঘুনন্দনের জন্ম হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ; তিনি যে ১৫৮১ খ্রীঃর বিশ-পঁচিশ বছর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও জীবিত ছিলেন এবং এত বৃদ্ধ বয়স (অন্তত ১১০ বছর) পর্যন্ত যে তাঁর কর্মশক্তি অটুট ছিল, তা ভাববার কোন কারণই নেই। এর থেকেই বোঝা যাবে, ডঃ সুকুমার সেন কতখানি ভেবেচিন্তে কথা বলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য বাংলার এক অঞ্চলের লোক, নরোত্তম আর এক অঞ্চলের, আর শ্যামানন্দ তৃতীয় এক অঞ্চলের লোক। শ্যামানন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যায়—তাঁর বাড়ি ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে ; তাঁর পূর্ব নাম "দুঃখী" কৃষ্ণদাস ; গুরু (মতান্তরে জীব গোস্বামী) "শ্যামানন্দ দাস" নাম রাখেন ; তিনি জাতিতে সদ্‌গোপ, পিতামাতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ও দুরিকা। বৃন্দাবন থেকে ফিরে তিনি নিজের দেশ ও তার সংলগ্ন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বহু স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।

শ্যামানন্দের গুরু ছিলেন গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ বা হৃদয়চৈতন্য—যিনি বয়সের দিক দিয়ে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। এর থেকে বোঝা যায়—শ্যামানন্দ বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন। শ্যামানন্দের শিষ্য গোপীজনবল্লভ দাসের লেখা 'রসিকমঙ্গল' থেকে জানা যায় যে শ্যামানন্দ ১৫৫২ শকাব্দ বা ১৬৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন। এ তারিখ শ্রীনিবাসের জন্মসালের ১১০ বছরেরও বেশি পরবর্তী। সুতরাং শ্যামানন্দ নিঃসন্দেহে বয়সে শ্রীনিবাসের চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন। শ্যামানন্দ আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ধরলে সব দিক্ দিয়ে সঙ্গতি থাকে।

শ্যামানন্দ বাংলায় কয়েকটি স্তব ও সাধন-নিবন্ধ এবং কিছু সংখ্যক বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন; বৈষ্ণব পদে ইনি "দুঃখী", "দুঃখিনী" ও "কৃষ্ণদাস" নামেও ভনিতা দিয়েছেন। তবে "দুঃখী" ভনিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে কয়েকটি 'গোবিন্দমঙ্গল'-রচয়িতা 'দুঃখী শ্যামদাসে'র লেখাও হতে পারে। 'দুঃখী শ্যামদাস' ও 'দুঃখী শ্যামানন্দ দাস'—

এঁদের নামের মিল থাকলেও এঁরা পৃথক লোক, কারণ শ্যামদাসের পিতামাতার নাম শ্রীমুখ ও ভবানী * আর শ্যামানন্দ দাসের পিতামাতার নাম শ্রীকৃষ্ণ ও দুরিকা।

---

* 'দুঃখী শ্যামদাসে'র আবির্ভাবকাল অনিশ্চিত। কাশীরাম দাসের এক খুল্লপিতামহের নাম ছিল শ্রীমুখ—এর থেকেই ডঃ সুকুমার সেন স্থির করেছেন যে 'দুঃখী শ্যামদাস' কাশীরাম দাসের খুল্লপিতামহের পুত্র ছিলেন। কিন্তু একটি নামের মিল থেকেই এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। 'গোবিন্দমঙ্গল'-এর বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসুর দুটি আপ্তবাক্য—(১) 'দুঃখী শ্যামদাসে'র বাড়ি ছিল মেদিনীপুর জেলার হরিহরপুরে এবং (২) তিনি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ ছিলেন—ডঃ সেনের সিদ্ধান্তের সমর্থক "প্রমাণ"। কিন্তু কাশীরাম দাসের খুল্লপিতামহ বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণায় থাকতেন, মেদিনীপুর জেলায় থাকতেন না। আর কাশীরাম দাসের অনুজ গদাধর দাস লিখেছেন যে, তাঁরা শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় কায়স্থ, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় নন। সুতরাং ডঃ সেনের সিদ্ধান্ত ধোপে টিকছে না।

॥ কুড়ি ॥

জ্ঞানদাস

মহাকবি জ্ঞানদাস সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত যা তথ্য পেয়েছি, তা খুবই সামান্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের শাখায় জ্ঞানদাসের নাম করেছেন,

পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥

নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র কয়েক স্থানে জ্ঞানদাসের নাম পাই। 'নরোত্তমবিলাসে'র ষষ্ঠ বিলাসে লেখা আছে যে জাহ্নবী দেবী যখন খেতরীতে যান, তখন তাঁর অনেক সহযাত্রীর মধ্যে এই ক'জনও উপস্থিত ছিলেন,

শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারি-চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর ॥

'নরোত্তমবিলাসে'র অষ্টম বিলাসে খেতরীর মহোৎসবের সময়ে যাঁরা "শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর ভবন অঙ্গনে" ভোজনে বসেছিলেন, তাঁদের নামের এক তালিকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেও জ্ঞানদাসের নাম পাই—

শ্রীমীনকেতন-রামদাস মহীধর।
মুরারি-চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর ॥

'চৈতন্যচরিতামৃতে' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র দু'জায়গাতে "জ্ঞানদাস মনোহর" লেখা আছে দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, জ্ঞানদাসের প্রকৃত নাম বা দ্বিতীয় নাম ছিল 'মনোহর'। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর চতুর্দশ তরঙ্গে জ্ঞানদাসের নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

রাঢ়দেশে কাঁদরা-নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥

এর থেকে জানা যায় যে জ্ঞানদাসের বাসভূমি ছিল রাঢ়ের অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে। 'ভক্তিরত্নাকরে'র এই দু'টি ছত্র থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জ্ঞানদাসের নামান্তর ছিল 'মঙ্গল'।

'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে (২য় সং, পৃঃ ৩১৩) সঙ্কলিত 'নরহরিদাস' ভনিতাযুক্ত একটি পদে কবি জ্ঞানদাসের এই বিবরণ পাওয়া যায়,

শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাঁদড়া মঁাদড়া গ্রাম তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগ্যেতে রত বাল্যকাল হৈতে দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ

মদনমঙ্গল নাম রূপে গুণে অনুপাম আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে বাবা আউল ছিল সহচর ॥

পদটি কোথায় পাওয়া গিয়েছে, 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে তার কোন উল্লেখ নেই। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই পদটির ভনিতা দেখে মনে করেছিলেন যে পদটি 'ভক্তিরত্না-কর'-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর রচনা; তিনি পদটিকে খুব প্রামাণিক বলেও মনে করতেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ডঃ মজুমদার লিখেছেন, "কাঁদরায় যে প্রবাদ শুনিয়া শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন—'জ্ঞানদাস বিবাহিত ছিলেন' তাহা অপেক্ষা নরহরি চক্রবর্তীর পদের (অর্থাৎ আলোচ্য পদটির) প্রামাণিকতা ইতিহাসের ছাত্রের নিকট বেশী। সেইজন্য জ্ঞানদাসকে চিরকুমার বলিয়াই মানিতে হয়।" ('জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী', পৃঃ ১)

কিন্তু পদটি নিঃসন্দেহে জাল। অর্থাৎ, এটি 'ভক্তিরত্নাকর'-কার নরহরি চক্রবর্তীর লেখা নয় এবং নিতান্তই অর্বাচীন ও অপ্রামাণিক রচনা। এখন এ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি।

পদটিতে জ্ঞানদাস সম্বন্ধে সর্ব-সমস্যার সমাধান করা দেখে এর অকৃত্রিমতায় সন্দেহ জাগে। আগেই বলা হয়েছে যে 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'নরোত্তমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্না-করের' কয়েকটি শ্লোক দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, জ্ঞানদাসের নামান্তর ছিল 'মনোহর' ও 'মঙ্গল'। আলোচ্য পদটিতে এ সম্বন্ধে "সংশয় ভঞ্জন" করে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানদাসের "মদনমঙ্গল নাম" এবং "আর এক উপাধি মনোহর"। কিন্তু 'মনোহর' নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও নরোত্তমবিলাস' থেকে আগে-উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে 'জ্ঞানদাস' নামের পাশে থাকলেও নামটি যে স্বতন্ত্র লোকের, তা 'ভক্তিরত্নাকরে'র নবম ও দশম তরঙ্গ থেকে জানা যায়। 'ভক্তিরত্নাকরে'র নবম তরঙ্গে কাটোয়ার মহোৎসবে সমবেত ভক্তদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার একাংশ উদ্ধৃত করছি,

বিপ্র কৃষ্ণদাস শ্রীনকড়ি মনোহর।
হরিহরানন্দ শ্রীমাধব মহীধর ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ বসন্ত লবনি।
শ্রীকানু ঠাকুর শ্রীগোকুল গুণমণি ॥

শ্রীমাধবাচার্য্য রাম সেন দামোদর।
জ্ঞানদাস নর্ত্তক গোপাল পীতাম্বর॥

জাহ্নবী বা জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে যাঁরা খড়দহ থেকে খেতরী গিয়েছিলেন, 'ভক্তিরত্নাকরে'র দশম তরঙ্গে তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে; এর মধ্যে এইভাবে জ্ঞানদাসের নাম উল্লিখিত হয়েছে,

শ্রীমীনকেতন রামদাস মনোহর।
মুরারি-চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর॥

তারপর, জাহ্নবা দেবীর সহযাত্রী হয়ে যে সব ভক্তেরা খেতরী থেকে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তাঁদের তালিকা 'ভক্তিরত্নাকরে'র দশম তরঙ্গ ও 'নরোত্তমবিলাসে'র অষ্টম বিলাস—দু'জায়গাতেই পাই। 'ভক্তিরত্নাকরে'র দশম তরঙ্গের তালিকায় জ্ঞানদাসের নাম এই ভাবে লেখা আছে,

শ্রীপরমেশ্বরী দাস দাস দামোদর।
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর॥
জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি ভাগবত যত।

আর 'নরোত্তমবিলাসে'র অষ্টম বিলাসে বৃন্দাবনযাত্রীদের তালিকায় পাই,

রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর।
জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি গুণের সাগর॥

এই চারটি তালিকায় 'মনোহর' ও 'জ্ঞানদাস' নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে, সুতরাং মনোহর জ্ঞানদাস থেকে পৃথক ব্যক্তি।

'মঙ্গল'ও জ্ঞানদাসের নাম নয়। ইতিপূর্বে আমরা 'নরোত্তমবিলাসে'র অষ্টম বিলাসে প্রদত্ত খেতরীর মহোৎসবে সমবেত ভক্তদের তালিকা থেকে জ্ঞানদাসের নাম সংবলিত একটি শ্লোক (শ্রীমীনকেতন…জ্ঞানদাস মনোহর॥) উদ্ধৃত করেছি; এই শ্লোকটির কয়েক ছত্র পরেই আর একটি শ্লোকে পৃথকভাবে 'শ্রীমঙ্গল' নাম উদ্ধৃত হয়েছে.

শ্রীনয়ন মিশ্র শ্রীমঙ্গল এক ঠাঞি।
এ সভে ভুঞ্জয়ে সে শোভার সীমা নাই॥

'নরোত্তমবিলাসে'র ষষ্ঠ বিলাসে নয়নানন্দ মিশ্রের নামের পরে 'মঙ্গল বৈষ্ণব' নাম উল্লিখিত হয়েছে। 'শ্রীমঙ্গল' ও 'মঙ্গল বৈষ্ণব' যে অভিন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'মঙ্গল বৈষ্ণব'-এর নাম চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গদাধর পণ্ডিতের শাখায় উল্লিখিত হয়েছে।

পূর্বোদ্ধৃত 'নরহরিদাস' ভনিতাযুক্ত "শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাঁদড়া মাঁদড়া গ্রাম" পদটিতে জ্ঞানদাস ও মনোহরকে অভিন্ন বানানো হয়েছে এবং 'মঙ্গল'-এর সম্প্রসারিত রূপ 'মদনমঙ্গল'কে জ্ঞানদাসের নাম বলা হয়েছে বলে অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পদটি জাল। 'ভক্তিরত্নাকরে'র উক্তির সঙ্গে এর যে বিরোধ দেখা যায়, তাতে পদটি কখনই 'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর রচনা হতে পারে না। "শ্রীবীরভূমেতে ধাম" উক্তি থেকেও পদটির কৃত্রিমতা প্রমাণিত হয়; বাংলায় ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কাঁদড়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত হয়—বর্তমানে এই গ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত। অতএব পদটির কোন কথাই সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

এই জাল পদটির "দীক্ষা নৈলা জাহ্নবার পাশ" উক্তির উপর নির্ভর করে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে জ্ঞানদাস জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ঐ উক্তির কোন মূল্য নেই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নিত্যানন্দ-শাখার বর্ণনায় জ্ঞানদাসের নাম আছে বলে আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাসের লেখা অনেকগুলি নিত্যানন্দ-বন্দনার পদ পাওয়া গিয়েছে; পদগুলির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী', পৃঃ ৩-৪)। যিনি নিত্যানন্দকে চোখে দেখে আবেগপূর্ণ ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন, তিনি নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ না করে ক্ষান্ত রইলেন এবং নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন—এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

তা ছাড়া, পূর্বোক্ত জাল পদটি ভিন্ন আর কোন সূত্রেই জ্ঞানদাসের জাহ্নবা দেবীর কাছে দীক্ষা গ্রহণের কথা লেখা নেই। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে' জাহ্নবা দেবীর সহযাত্রী ভক্তের দলের মধ্যে জ্ঞানদাসের নাম দেখা যায়—এ থেকেও প্রমাণ হয় না যে, জ্ঞানদাস জাহ্নবা দেবীর শিষ্য; তার কারণ নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর জাহ্নবা দেবীই হয়েছিলেন নিত্যানন্দের গোষ্ঠীর নেত্রী। তার ফলে নিত্যানন্দের শিষ্যদের স্বভাবতই জাহ্নবা দেবীর "গণ"-এর মধ্যে সর্বত্র দেখা যেত। 'ভক্তিরত্নাকরে' ও 'নরোত্তমবিলাসে' জাহ্নবা দেবীর সহযাত্রীদের মধ্যে মীনকেতন-রামদাসের নাম আছে, তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে নিত্যানন্দশিষ্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছেন। অতএব জ্ঞানদাসও যে নিত্যানন্দের শিষ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দশিষ্য না হয়ে জাহ্নবাশিষ্য হলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে নিত্যানন্দের শাখায় স্থান পেতেন বলে মনে হয় না; 'চৈতন্যচরিতামৃতে' জাহ্নবা দেবীরই নাম নেই, সুতরাং

তাঁর শিষ্যদের নিত্যানন্দের শাখায় অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রশ্ন ওঠে বলে মনে হয় না।

তথ্যের অপ্রাচুর্যের জন্য জ্ঞানদাসের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কালক্রম প্রস্তুত করা খুব দুরূহ। তিনি প্রথম বয়সে নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিণত বয়সে কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এইটুকু মাত্র জানা যায়। নিত্যানন্দ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পরলোকগমন করেন এবং কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসব ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং জ্ঞানদাস যে অন্ততপক্ষে ১৫২০ থেকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

॥ একুশ ॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ কবিরই পরিচয় ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। মুষ্টিমেয় যে ক'জনের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ।

ভক্তিরত্নাকর থেকে জানা যায় যে, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও তাঁর বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং জীব গোস্বামী তাঁর পদ আস্বাদন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সংস্কৃত শাখানির্ণয়ের পুঁথিতে (নং G-5638) শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য হিসাবে সস্ত্রীক রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস এবং গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহের নাম পাওয়া যায়,

সস্ত্রীকো (কৌ) রামচন্দ্র-শ্রীগোবিন্দ-কবি-পাথিবৌ।
তৎপুত্রো দিব্যসিংহাখ্য (:) কবিরাজঃ প্রিয়া যুতঃ॥

গোবিন্দদাসের পদ আস্বাদনে মুগ্ধ হয়ে জীব গোস্বামী তাঁকে দু'টি চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলি ভক্তিরত্নাকরের চতুর্দশ তরঙ্গে পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি চিঠি জীব গোবিন্দদাসকে এককভাবে লিখেছিলেন, অপরটি গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস ও রামচন্দ্র কবিরাজকে যুক্তভাবে সম্বোধন করে লিখেছিলেন। জীবের এই চিঠি দু'টি থেকে প্রমাণ হয় যে, গোবিন্দদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জীবিত ছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' আদিলীলার ১১শ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের শিষ্য হিসাবেও রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম পাই।

কংসারি সেন রাম সেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ॥

এই রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজকে অনেকে কবিভ্রাতৃযুগল রামচন্দ্র-গোবিন্দ থেকে পৃথক লোক বলে মনে করেন। কিন্তু 'চরিতামৃতে' যখন রামচন্দ্র ও গোবিন্দের একই সঙ্গে নাম করা হয়েছে এবং তাঁদের কবিরাজ বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তখন এঁদের আমাদের আলোচ্য রামচন্দ্র ও গোবিন্দের সঙ্গে অভিন্ন না ধরে উপায় নেই।

এই দুই ভাই চরিতামৃতে নিত্যানন্দের শিষ্য হিসাবে এবং অন্যত্র শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন কেন? এ সম্বন্ধে আমাদের যা মনে হয় তা বলছি। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে লেখা আছে যে, গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন এবং রামচন্দ্র-গোবিন্দের শৈশবেই তাঁদের পিতার মৃত্যু ঘটে। আমাদের মনে হয় পিতার জীবদ্দশাতে রামচন্দ্র-গোবিন্দ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' লেখা আছে, পিতৃবিয়োগের পরে রামচন্দ্র-গোবিন্দ শক্তি-ধর্ম উপাসক মাতামহের আশ্রয়ে লালিত পালিত হতে থাকেন এবং মাতামহের প্রভাবে তাঁরাও শাক্ত হয়ে যান। তারপর অনেকদিন বাদে প্রথমে রামচন্দ্র ও পরে গোবিন্দ শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন, আসলে যা পুনর্দীক্ষাগ্রহণ।

নিত্যানন্দ ১৫৪০ খ্রীঃর বেশি পরে জীবিত ছিলেন না। কাজেই ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গোবিন্দদাসের জন্ম ধরলে অল্প বয়সে নিত্যানন্দের কাছে তাঁর প্রথম দীক্ষা গ্রহণের এবং বেশি বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দ্বিতীয় দীক্ষা গ্রহণের সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। 'শ্রীনিবাস আচার্য' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে, শ্রীনিবাস আনুমানিক ১৫৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন থেকে বাংলায় ফিরে আসেন; তারপরে তিনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও দীক্ষা দান সুরু করেন। সুতরাং গোবিন্দদাস ১৫৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গোবিন্দদাস কতদিন জীবিত ছিলেন, তাও মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা যায়। তাঁর 'প্রেম আগুনি মনহিঁ গুণি গুণি' পদের ভনিতায় 'প্রতাপ আদিত্যে'র নাম পাওয়া যায়। বিশ্বভারতীর ১৮৯৫ নং বাংলা পুথিতে (শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস সংগৃহীত) আমরা পদটির এই ভনিতার এই পাঠ পাই,

> জানি পুন পুন সো পিয়া পরশন সে পিয়া পুজে পাঁচ বাণ রে।
> ও রস গাহক প্রতাপ আদিত্য দাস গোবিন্দ ভান রে॥

অন্যত্র 'প্রতাপ আদিত্য'র জায়গায় 'প্রাত আদিত' পাঠ পাওয়া যায়। কোন কোন পুথিতে এর জায়গায় 'রায় চম্পতি'র নাম পাই। মূল পাঠ আমাদের পুথিতেই সঠিকভাবে পাওয়া যায় এবং তাতে 'প্রতাপ আদিত্য' ও 'রায় চম্পতি' দুজনেরই নাম আছে। উপরে উদ্ধৃত অংশের ঠিক পরেই আছে,

> বিরহমোচন ও তুয়া লোচন রোজ হেরব কান রে।
> রায় চম্পতি বচন মানিয়ে দাস গোবিন্দ ভান রে॥

গোবিন্দদাসের 'শুনহ নিরদয় হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই' পদের ভনিতাতেও 'প্রতাপ আদিত'র নাম পাই।

ভনিতাটি এই,

এতহি বিরহে আপনি মুরছই শুনহ নাগরকান।
প্রতাপ আদিত এ রস ভাসিত দাস গোবিন্দ গান॥

(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, পৃঃ ২২৩ দ্রষ্টব্য)

উপরে উক্ত পদ দু'টিতে উল্লিখিত 'প্রতাপ-আদিত্য' বা 'প্রতাপ আদিত' নিঃসন্দেহে বিখ্যাত যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য, যিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন (History of Bengal, D. U., Vol. II, 1948, p. 264 দ্রষ্টব্য)। গোবিন্দদাস যখন প্রতাপাদিত্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন তিনি যে অন্তত ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গোবিন্দদাস কবিরাজের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় তাঁর নিজের লেখা অধুনালুপ্ত 'সঙ্গীতমাধব' নাটকে ('ভক্তিরত্নাকরে' ও 'নরোত্তমবিলাসে' এই বইটির কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে), রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'তে এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'। এই সব সূত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতা, মাতা ও মাতামহের নাম ছিল যথাক্রমে চিরঞ্জীব সেন, সুনন্দা এবং দামোদর। দামোদর ছিলেন "মহাকবি" এবং শ্রীখণ্ডের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। গোবিন্দদাসের দেশ ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুমারনগরে। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল শ্রীখণ্ডে মাতামহের বাড়িতে। শেষ জীবনে গোবিন্দ-দাস বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভগবানগোলার নিকটবর্তী তেলিয়া বুধুরী গ্রামের পশ্চিম-পাড়াতে বাস করতেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই হাস্যকর মত প্রচার করেছিলেন যে গোবিন্দদাস কবিরাজ আসলে মৈথিল; তাঁর প্রকৃত নাম গোবিন্দদাস ঝা; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি মিথিলায় আবির্ভূত হন।* "স্বদেশপ্রেমিক" মৈথিলরা এই মতকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। এই মতের সমর্থনে সামান্যতমও তথ্য বা প্রমাণ নেই। তা সত্ত্বেও সতীশচন্দ্র

* লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত শুধু গোবিন্দদাস কবিরাজের দেশ নয়, সময় পর্যন্ত বদলে দেবার চেষ্টা করেছেন—সুস্পষ্ট তথ্য ও প্রমাণরাজিকে উপেক্ষা করে। ষোড়শ শতাব্দীতে সারা মিথিলা খুঁজে গোবিন্দদাস নামধেয় কোন লোককে পাওয়া যায় নি, তাই নগেন্দ্রবাবু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নামতে বাধ্য হয়েছেন!

রায় (তাঁর সম্পাদিত 'পদকল্পতরু'র ভূমিকায়), ডঃ সুকুমার সেন ('বিচিত্র নিবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'গোবিন্দদাস কবিরাজ' প্রবন্ধে) এবং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ('গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে) ঐ মত খণ্ডন করেছেন এবং রাশি রাশি প্রমাণ দিয়ে গোবিন্দদাসের বাঙালীত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ দেওয়া যায়। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই। গোবিন্দদাস কবিরাজকে বাঙালী প্রমাণ করা তুষারকে শাদা প্রমাণ করার সমতুল্য।

॥ বাইশ ॥

দ্বিজ মাধব

দ্বিজ মাধব নামে কবির ভনিতাযুক্ত চণ্ডীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এই তিনখানি কাব্য পাওয়া যায়। অনেকে প্রধানত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে এই তিনটি কাব্য বিভিন্ন লোকের লেখা বলে মনে করেন। কিন্তু এই তিন কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করলে এঁদের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও পুথিতে এই দুই ছত্র পাওয়া যায়,

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার। মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥

আর 'চণ্ডীমঙ্গলে'র সমস্ত পুথির উপক্রমে পাই,

পরাশর-সুত হয় মাধব তার নাম। কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপাম ॥

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে' 'দ্বিজ মাধব'-এর সঙ্গে 'মাধব আচার্য' ভনিতাও বহু জায়গায় পাওয়া যায়। 'চণ্ডীমঙ্গলে'ও কোন কোন পুথিতে আছে,

তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য। ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য ॥

'গঙ্গামঙ্গলের' সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের' ভনিতার মিল খুব বেশী। 'গঙ্গামঙ্গলে' পাই,

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণকমল। দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল ॥

আর 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে' পাই,

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণকমল। দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

সুতরাং তিনটি কাব্যই যে এক লোকের লেখা, তাতে সংশয়ের অবকাশ অল্প।

'চণ্ডীমঙ্গলে'র উপক্রম থেকে জানা যায় দ্বিজ মাধব বা মাধব আচার্য পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যের পুথি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় না, কেবল উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের জনপ্রিয়তাই হয়তো পশ্চিমবঙ্গে দ্বিজ মাধবের কাব্যের প্রচার লোপ করেছিল। অবশ্য দ্বিজ মাধবের পূর্ববঙ্গে বসতি স্থাপনও এর কারণ হতে পারে।

দৈবকীনন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় লেখা আছে,

মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব-শীতল। যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

দৈবকীনন্দন নিত্যানন্দের প্রিয়পাত্র পুরুষোত্তমের শিষ্য, সুতরাং তাঁর বৈষ্ণব-বন্দনার রচনাকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী নয়। দ্বিজ মাধব তার অনেক আগেই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করেছিলেন।

দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গলে'র রচনাকাল কবি নিম্নলিখিত শ্লোকের মধ্য দিয়ে জানিয়েছেন,

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত ॥

ইন্দু=১, বিন্দু=০, বাণ=৫, ধাতা=১। সুতরাং দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' অনুসারে ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

কবি তাঁর সমসাময়িক বাংলা তথা ভারতের বাদশাহ আকবরেরও উল্লেখ করেছেন এইভাবে,

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার ;
তাহে একাব্বর বাশ্চা অর্জ্জুন অবতার ॥
প্রতাপে সকল জিনে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলি যুগে রাম তুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি ॥

"বাশ্চা" মানে বাদশাহ, এই শব্দের পাঠান্তর "রাজা"ও কোন কোন পুথিতে পাওয়া যায়।

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের উপরে নির্ণীত রচনাকাল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সন্দেহাতীত। তা সত্ত্বেও ডঃ সুকুমার সেন তাকে গ্রহণ করতে চান নি এবং "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"র বদলে "দক্ষিণা গতিঃ" ধরে এবং "শক"-এর জায়গায় "সন" ধরে এই কাব্যের রচনাকালকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন (বা. সা. ই. ১।পূঃ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫১০ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু দ্বিজ মাধব আকবরের নাম উল্লেখ করায় ডঃ সেনের কিছু অসুবিধা হয়েছে। এই অসুবিধা কাটাবার জন্য ডঃ সেন লিখেছেন, "বাঙ্গালা বিজয় শেষ করিবার পর কিছুকাল না কাটিলে কোন পুরানো বাঙ্গালী কবি আকবরকে তারিফ···করিতেন না।···আকবরের নাম করার জন্যই ১৫০১ শক পাঠ গ্রহণ করা যায় না।" এই উক্তি আমাদের স্তম্ভিত করেছে। প্রথমত, ১৫০১ শকাব্দের তিন বছর আগেই বাংলা আকবরের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এসেছিল। দ্বিতীয়ত, তারও বহু বছর আগে থেকে আকবর বাংলার সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। বাংলার বিখ্যাত শাসনকর্তা সুলেমান কররানীও (১৫৬৫-৭২ খ্রীঃ) আকবরের নামেই মুদ্রা খোদাই করতেন ও খুৎবা পাঠ করাতেন ; আচার্য যদুনাথ সরকার এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "Sulaimān had Ākbar's name read from the pulpit as his suzerain and himself never sat on the throne nor stamped his

own coins, nor assumed any other mark of royalty" (History of Bengal, D. U., Vol. II, p. 182). সুতরাং ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে কোন বাঙালী কবি স্বচ্ছন্দেই আকবরের প্রশস্তি রচনা করতে এবং অর্জুন ও রামের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে পারেন। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনায় সময়ে ডঃ সুকুমার সেন তাঁরই ভাষায় "ন্যায় আঁকড়িয়া তর্ক" করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মত মেনে নিলে ঐতিহাসিক গবেষণার সর্বস্বীকৃত পদ্ধতির মূলোচ্ছেদ করা হবে। সুতরাং ১৫০১ শকাব্দকেই দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল বলে গ্রহণ করা গেল।

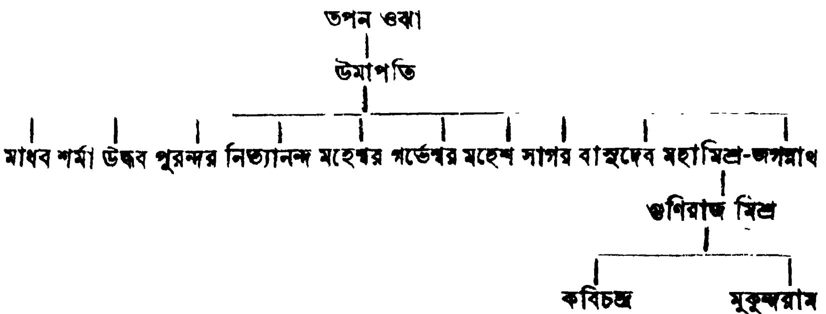
॥ তেইশ ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মধ্যযুগে এমন খুব অল্প বাংলা কাব্যই রচিত হয়েছে, যা নিয়ে বাঙালী গর্ব করতে পারে। যে দু' একখানি হয়েছে, তার মধ্যে 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' নামে পরিচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের নামই অগ্রগণ্য।

মুকুন্দরামের পরিচয় ও সময় সম্বন্ধে আলোচনার প্রধান উপকরণ তাঁর আত্মকাহিনী। অবশ্য তিনি দুটি আত্মকাহিনী লিখেছিলেন। প্রথম আত্মকাহিনীটি মুকুন্দরামের গ্রাম দামুন্যা বা দামিন্যায় রক্ষিত একটি পুথিতে (যে পুথি অবলম্বনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন) এবং কাইতি গ্রামের এক পুথিতে পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটি অধিকাংশ পুথিতেই পাওয়া যায়। বর্ধমান সাহিত্যসভার ৩২ নং পুথিতে (ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৭৫-৭৬ পৃষ্ঠায় যে পুথিটির ফটো ছাপিয়েছেন) একসঙ্গে দুটি আত্মকাহিনীই আছে। প্রথম আত্মকাহিনীতে মুকুন্দরাম স্বগ্রাম দামিন্যার বিবরণ এবং তাঁর বংশপরিচয় দিয়েছেন। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর সঙ্গে এই আত্মকাহিনীর এদিক দিয়ে বেশ মিল আছে। দ্বিতীয় আত্মকাহিনীতে তিনি তাঁর দেশত্যাগের করুণ কাহিনী এবং কাব্যরচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। মুকুন্দরামের কালনির্ণয়ের সূত্র এই দ্বিতীয় আত্মকাহিনীতেই পাওয়া যায়।

প্রথম আত্মকাহিনী থেকে মুকুন্দরামের এই বংশলতিকা পাওয়া যায়,



চণ্ডীমঙ্গলের বহু ভনিতা থেকে জানা যায় যে, মুকুন্দরামের পিতা গুণিরাজ মিশ্রের প্রকৃত নাম ছিল হৃদয় মিশ্র।

মুকুন্দরাম কয়ড়ি কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন পুথিতে মুকুন্দরামের প্রথম আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত দামিন্যা গ্রামের "চক্রাদিত্য" শিবের "ধামাধিকরণী" মাধব ওঝাকে "সাবর্ণ গোত্রের রাজা" বলা হয়েছে (বা. সা. ই. ১।পূঃ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫১৬)। এই মাধব ওঝা সম্ভবত উপরের বংশলতিকায় উল্লিখিত মাধব শর্মার সঙ্গে অভিন্ন। তা যদি হয়, তা' হলে বলতে হবে মুকুন্দরাম সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুল-গ্রন্থেও মুকুন্দরামকে সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে।

এই আত্মকাহিনী থেকে আরও জানা যায় যে, মুকুন্দরাম নিতান্ত অল্প বয়সেই ("শিশুকালে") দামিন্যার "চক্রাদিত্য" শিবের "সঙ্গীত" রচনা করেছিলেন।

কবির দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ (অতঃপর আমরা যেখানে "আত্ম-কাহিনী" বলব, সেখানে এই আত্মকাহিনীটিকেই বোঝাবে)। শুধু তথ্যের দিক দিয়েই এই আত্মকাহিনীটি মূল্যবান্ নয়, এর রসমূল্যও অসাধারণ।

এই আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, মুকুন্দরাম সেলিমাবাদ-শহর-নিবাসী গোপীনাথ নন্দী নিয়োগীর প্রজা হিসাবে দামিন্যায় বাস করতেন ও ভূসম্পত্তি ভোগ করতেন। কিন্তু অত্যাচারী ডিহিদার[১] মামুদ (বা মহম্মদ) সরিফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রজাদের উপর নানারকম উৎপীড়ন সুরু করে ও গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী করে। তখন মুকুন্দরাম তাঁর "সহায়" শ্রীমন্ত খাঁর সঙ্গে ও গ্রামের মোড়লের সঙ্গে পরামর্শ করে[২] সপরিবারে দেশত্যাগ করেন। পথে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে ও অনেকগুলি নদী পার হয়ে কবি গোথড়া বা গোচড্যা গ্রামে পৌঁছোন; এখানে ভালমত স্নানাহার না হওয়াতে কবি হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন; এই নিদ্রার সময়েই চণ্ডী তাঁকে স্বপ্নে

১ ডঃ সুকুমার সেনের মতে "ডিহিদার পাঠ ভ্রান্ত, মোগল শাসনের সময়ে অথবা তার পূর্বে এ রকম কোন শাসক-পদ ছিল না।" এ রকম শাসক-পদ যে তখন ছিল না, তার কোন প্রমাণ কিন্তু নেই। 'ডিহিদার' পাঠ মোটেই ভ্রান্ত নয়, কারণ আত্মকাহিনীর দু'জায়গায় 'ডিহিদার' শব্দটি পাওয়া যায় ("ডিহিদার মামুদ সরিফ" ও "ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ"); বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতুর উক্তির মধ্যেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ("খন্দে নাহি নিব বাড়ি রহে ব:স দিব কড়ি ডিহিদার নাহি দিব দেশে।") [ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'চণ্ডীমঙ্গল', ভূমিকা, পৃঃ ৪-এ এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

২ "যুক্তি কৈল গ্রাম্ভারির সনে"—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১৪১ নং পুথির পাঠ। বিভিন্ন পুথিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে 'গ্রাম্ভারি'র স্থানে 'গম্ভীর খাঁ, 'গরীব খাঁ', 'মুনিব খাঁ' ও 'মীর খাঁ' প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। সেগুলি ভ্রান্ত পাঠ। দেশত্যাগের সময়ে গ্রামের "গ্রাম্ভারি" বা মোড়লের সঙ্গে যুক্তি করাই স্বাভাবিক।

দেখা দিয়ে "সঙ্গীত" অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে আদেশ দিলেন। এরপর কবি শিলাই নদী পার হয়ে ব্রাহ্মণভূমি রাজ্যের রাজধানী আড়রাতে উপনীত হন; সেখানকার রাজা বাঁকুড়া রায় কবিকে পাঁচ আড়া ধান দেন ও তাঁকে শিক্ষণকার্যে[১] নিযুক্ত করেন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায় রাজা হন। মুকুন্দরামের দেশত্যাগের সহযাত্রী ছিল তাঁর ভাই রামানন্দ, সে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের কথা জানত, তার তাগাদায়* অবশেষে কবি দীর্ঘকাল পরে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন (একটি পুথির মতে কবির এক পুত্রের মৃত্যু হওয়ার পরে তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনা সুরু করেন)। রাজা রঘুনাথ স্বয়ং কবিকে কাব্য রচনার অনুমতি দেন এবং গায়নকে "ভূষণ" দান করেন।

মুকুন্দরাম কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তা মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা মোটেই দুরূহ নয়, কারণ তিনি আত্মকাহিনীতে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের শাসনকর্তা মানসিংহের নাম করেছেন। মানসিংহ ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন। কিন্তু কবির জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সময় আজও পর্যন্ত সন্তোষজনক-ভাবে নিরূপিত হয় নি। তাঁর দেশত্যাগ ও গ্রন্থরচনার সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সূত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আত্মকাহিনীর দ্বিতীয় শ্লোকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে ও অধিকাংশ পুথিতে আমরা শ্লোকটি এইভাবে পাই,

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।

১ আত্মকাহিনীর এই অংশের বিভিন্ন ধরনের পাঠ মেলে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করেছি।

* রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এর প্রথম সংস্করণে (১৮৭৩ খ্রীঃ) আত্মকাহিনীটি যেভাবে প্রদত্ত হয়েছে, তার এই অংশে আছে,

সঙ্গে ভাই রামানন্দী সে জানে স্বপ্নের সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।

এইটিই সঠিক পাঠ। বিভিন্ন পুথিতে ও ছাপা গ্রন্থে 'ভাই রামানন্দী'র জায়গায় 'দামোদর নন্দী', 'ডামাল নন্দী', 'গোপালদাস নন্দী' প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়; সেগুলি ভুল পাঠ। আত্মকাহিনীতে কবি স্পষ্টভাবে বলেছেন, দেশত্যাগের সময় তাঁর সঙ্গে "রামানন্দ ভাই" ছিল, সুতরাং স্বপ্নের কথা তার পক্ষে জানাই স্বাভাবিক; অন্য কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুকুন্দরামের সহযাত্রী হয় নি, সুতরাং আর কারও পক্ষে স্বপ্নের কথা জানা ও তাই নিয়ে কবিকে তাগাদা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ ॥

কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এর প্রথম সংস্করণে (১৮৭৩ খ্রীঃ) শ্লোকটির এই পাঠ পাওয়া যায়,

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মহম্মদ সরিফে ॥

রামগতি কোন্ পুথিতে এই পাঠ পেয়েছিলেন, তাও উল্লেখ করেছেন—"কবিকঙ্কণ, আড়রাগ্রামের যে ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা রঘুনাথদেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের বংশীয়েরা উক্ত আড়রাগ্রাম হইতে ২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী 'সেনাপতে' নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস করেন। তাঁহারা কহেন যে, তাঁহাদের বাটীতে যে চণ্ডীপুস্তক বর্তমান আছে, তাহা কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত।" রামগতি এই পুথি থেকেই আলোচ্য শ্লোকটির পাঠ নিয়েছেন।

এদিকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুথিতে (লিপিকাল ১৭১৭ শকাব্দ বা ১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) উদ্ধৃত শ্লোকটির দ্বিতীয় ছত্রে "রাজা মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে" ইত্যাদি পাঠ পাওয়া যাচ্ছে।

"সে মানসিংহের কালে" পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে মানসিংহের শাসনকালে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন। "অধর্ম্মী রাজার কালে" পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে মুকুন্দরাম মানসিংহের পূর্ববর্তী কোন এক অধার্মিক শাসকের আমলে দেশত্যাগ করেছিলেন ও মানসিংহের আমলে কাব্য রচনা করেছিলেন। আর "রাজা মানসিংহ গেলে" পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে বাংলায় মানসিংহের শাসন শেষ হলে মুকুন্দরাম দেশ-ত্যাগ করেছিলেন, কাব্যরচনা করেছিলেন আরও পরে। এর থেকেই বোঝা যাবে, মুকুন্দরামের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কত দুরূহ। এখন আরও কতকগুলি সূত্র বিশ্লেষণ করছি।

(ক) ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র পুথিতে একটি চৌতিশা পাওয়া গিয়াছে। কোন ভনিতা নাই, তবে পুথিতে আছে কবিকঙ্কণের

চৌতিশা। চৌতিশার পাঠ মুদ্রিত পুস্তকের পাঠের সহিত মিলে না। চৌতিশাটির শেষে রচনাকাল দেওয়া আছে।

চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত।
পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত ॥

এখানে প্রথম ছত্রে স্পষ্টতঃ সিন্ধু স্থলে ইন্দু পাঠ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা পাই ১৫১৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই সাল গ্রন্থরচনার তারিখ হইতে কোনই বাধা নাই।"

কিন্তু চৌতিশাটি সত্যই মুকুন্দরামের রচনা কিনা, অথবা এতে উল্লিখিত শকাব্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধীয় কিনা, তা সঠিকভাবে বলবার কোন উপায় নেই। অতএব এর থেকে মুকুন্দরামের গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না।

(খ) মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ১৮৭৩ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন, "আমাদের পরমসুহৃৎ মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল ও বংশাবলী প্রভৃতি পূর্বোল্লিখিত রাজবাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, রাজা রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ শক [১৫৭৩ খ্রীঃ অঃ] হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৪ শক [১৬০২ খ্রীঃ অঃ] পর্যন্ত ৩০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন।" রঘুনাথের রাজত্বকাল সম্বন্ধে এই উক্তির সমর্থন পাচ্ছি ১৩১২ বঙ্গাব্দের 'প্রদীপে' প্রকাশিত অম্বিকাচরণ গুপ্তের প্রবন্ধ থেকে। ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ অনেক গবেষক রামগতি ও অম্বিকাচরণের উক্তির উপর নির্ভর করে মুকুন্দরামের গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। কিন্তু রামগতি বা অম্বিকাচরণ কেউই এমন কোন প্রমাণ পেশ করেন নি, যাতে তাঁদের দেওয়া রঘুনাথ রায়ের এই "রাজত্বকাল"কে আমরা নিঃসংশয়ে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি।

(গ) দুটি শিলালিপির সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথম শিলালিপিটি আবিষ্কার করেন শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ। মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী গ্রামে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে উড়িয়া অক্ষরে এই শিলালিপিটি লেখা আছে; এর পাঠ :—

"শ্রীমানসিংহ মহারাজ শুভরাজ্যে নিজ কুলে কুমুদানন্দ শ্রীনরঘুনাথ শর্মা ভূমিপ সুত শ্রীচক্রধর শর্মা প্রকাশিলে সর্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি। শকাব্দ ১৫২৬ কামিলা রতুপাত্র।" ('পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', পৃঃ ৪১৬ দ্রষ্টব্য)

এখানে মানসিংহের উল্লেখ লক্ষ্যণীয়। মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রাজা রঘুনাথ এবং

এই রাজা রঘুনাথ দুজনেই মানসিংহের সমসাময়িক এবং আড়রা থেকে কেশিয়াড়ীর দূরত্ব মাত্র ৫০।৫৫ মাইল। সুতরাং দুজন অভিন্ন বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রঘুনাথের পুত্র চক্রধর শর্মার নাম থাকায় কেউ কেউ মনে করেন এর আগেই রঘুনাথের মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু রঘুনাথ শর্মার জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত—কারণ শিলালিপি-টিতে রঘুনাথ শর্মার নামের আগে "শ্রীল" বিশেষণ যুক্ত হয়েছে, যা তখনকার দিনে জীবিত লোকদের নামের আগেই যুক্ত হত। শিলালিপিটির ভাষা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঐ অঞ্চলের তৎকালীন "ভূমিপ" বা রাজা রঘুনাথ শর্মাই, চক্রধর "ভূমিপসুত" মাত্র। ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ রায় যদি ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করে থাকেন, তা'হলে রঘুনাথের রাজত্বকাল সম্বন্ধে রামগতি ও অম্বিকাচরণের উক্তিকে অমূলক বলতে হবে। অবশ্য এই রঘুনাথ শর্মা ও ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ রায় যে অভিন্নই, তা' নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু এঁদের নামের প্রায় অভিন্নতা এবং রঘুনাথ শর্মার পুত্র চক্রধরের সঙ্গে রঘুনাথ রায়ের পরবর্তী রাজা শ্রীধরের (পরবর্তী অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) নামের সাদৃশ্য থেকে মনে হয়, এই দুই রাজার এক লোক হবার সম্ভাবনাই বেশী।

দ্বিতীয় শিলালিপিটি আড়রার সন্নিহিত 'সেনাপতে' গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত জয়পুর গ্রামের জয়চণ্ডীর প্রস্তর-মন্দিরে পাওয়া গিয়েছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এর কথা আমায় প্রথম বলেন। শিলালিপিটির তারিখ ১৫৪৫ শক বা ১৬২৩-২৪ খ্রীঃ। এতে "দ্বিজাবনীশ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণভূমির অধিপতি 'শ্রীধর'-এর নাম আছে। সুতরাং রঘুনাথের রাজত্ব যে তার আগে শেষ হয়েছিল, তা এর থেকে বোঝা যাচ্ছে। (এই শ্রীধর ও পূর্বোক্ত চক্রধর কি দুই ভাই?)

(ঘ) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৫ শক বা ১৮২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে। তার শেষে এই শ্লোকগুলি ছিল,

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥
অভয়া মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ
যার যেবা মনোরথ পূরে তার আশ॥

ইত্যাদি

পরবর্তী সমস্ত মুদ্রিত গ্রন্থেই এই শ্লোকগুলি স্থান পেয়েছে। কিন্তু শ্লোকগুলি এতদিন কোন পুথিতে পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি বর্ধমান সাহিত্য সভার ২০০১ নং পুথিতে (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত) আমরা এই শ্লোকগুলি পেয়েছি। এই পুথির লিপিকাল ১৮৪২ খ্রীঃ। সুতরাং সন্দেহ করা যেতে পারে যে, ছাপা বই থেকেই শ্লোকগুলি নেওয়া হয়েছে। আমরা এই পুথি থেকে শ্লোকগুলি অবিকলভাবে উদ্ধৃত করছি,

শকে রষ রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতমত দিলা গিত হরের বণিতা॥
অভয়া মঙ্গল গিত গাইল মুকুন্দ।
আশোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
তার সেবা মনোরথ পুরে অভিলাষ॥
ইত্যাদি

ছাপা বই-এর সঙ্গে এর পাঠের হুবহু মিল নেই, সুতরাং ছাপা বই থেকে শ্লোকগুলি পুথিতে গৃহীত না-ও হতে পারে।

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা"র থেকে পাওয়া যায় ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ সময় মুকুন্দরামের কাব্যরচনার কাল হতে পারে না, কারণ মানসিংহের শাসনকাল এর পঞ্চাশ বছর পরবর্তী। মানসিংহের শাসনকালের আগে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয় নি। সুতরাং এ তারিখ কিসের?

আত্মকাহিনীতে কবি বলেছেন যে দেশ ছেড়ে আড়রায় যাবার সময় মাঝপথে গোথড়া বা গোচড্যা গ্রামে যখন তিনি ক্ষুধায় পরিশ্রমে কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন দেবী চণ্ডী স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে চণ্ডীমঙ্গল লিখতে আদেশ দেন। বহু সমালোচক বলেছেন 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' ঐ স্বপ্নাদেশ লাভের তারিখ। অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ১৪৬৬ শকাব্দেই মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন। অনেকে 'রস' অর্থে ৯ ধরে 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' = ১৪৯৯ শকাব্দ ধরেন। কিন্তু এই মত সমর্থন করা যায় না। 'রস' শব্দটি যখন সংখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন সর্বত্র ৬ অর্থেই প্রযুক্ত হয়, ৯ অর্থে ব্যবহারের কোন দৃষ্টান্ত এপর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সুতরাং "শাকে রস" ইত্যাদি ছত্রটি যদি মুকুন্দরামের দেশত্যাগের তারিখ হয়, তা হলে মুকুন্দরাম নিঃসন্দেহে ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দেই দেশত্যাগ করেছিলেন।

অবশ্য ১৪৬৬ শক ও মানসিংহের বাংলা-উড়িষ্যার সুবেদারী লাভের মধ্যে ৫০ বছরের তফাৎ। কিন্তু তাতেও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ দেশত্যাগের সময় কবি যুবক ছিলেন বলে মনে হয়। যেহেতু আত্মকাহিনীতে তিনি তাঁর একটি মাত্র শিশুসন্তানের উল্লেখ করেছেন—"কান্দে শিশু ওদনের তরে।" আর চণ্ডীমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করার সময়ে তিনি বৃদ্ধ; ভনিতায় তিনি বারবার তাঁর পুত্র শিবরাম এবং চিত্রলেখা, যশোদা ও মহেশ প্রভৃতি কল্যাণীয়া ও কল্যাণীয়দের নাম করেছেন। দামিন্যার পুথিতে আছে,

শিবরাম বংশধর কৃপা কর মহেশ্বর
রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।

এই সাক্ষ্য অনুসারে কবির তখন পৌত্র হয়েছিল। এছাড়া তিনি চণ্ডীমঙ্গলের এক জায়গায় "বুঢ়ারে না করে গুণ মোহন ঔষধ" বলে নিজের বার্ধক্যের প্রমাণ দিয়েছেন।

তারপর, কবি যখন আরড়ায় পৌঁছোন, তখন রঘুনাথ ছাত্র এবং "শিশু" বলে আত্মকাহিনীর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি থেকে মনে হয়,

সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশু পাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ দ্বিজ কুলে অবদাত
গুরু বলি কৈল পূজিত॥

অথচ চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময় রঘুনাথই রাজা। এদিক দিয়েও কবির স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্তি ও কাব্য রচনার সময়ের মধ্যে বহু বছরের ব্যবধান আভাসিত হয়।

সুতরাং ২৪।২৫ বছরের মত বয়সে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন ও স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন এবং ৭৪।৭৫ বছরের মত বয়সে চণ্ডীমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন বলে স্থির করলে আপাতদৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি হয় না। কিন্তু "শাকে রস রস বেদ" ইত্যাদি শ্লোকটিকে মুকুন্দরামের দেশত্যাগের কালবাচক বলে গ্রহণ করলে বলতে হবে আত্মকাহিনীর দ্বিতীয় শ্লোকের "অধর্ম্মী রাজার কালে" ইত্যাদি পাঠই সঠিক। কিন্তু এসম্বন্ধে কি নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়? "সে মানসিংহের কালে" বা "রাজা মান-সিংহ গেলে" পাঠ যদি সঠিক হয়,—তাহলে মুকুন্দরাম ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে দেশত্যাগ করেছিলেন বলতে হয়—এবং সেক্ষেত্রে "শাকে রস" ইত্যাদি শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্তও বলতে হয়। শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলার অনুকূলে আরও যুক্তি এই যে, প্রথমত, শ্লোকটি কেবলমাত্র ছাপা বইতে এবং একটিমাত্র পুথিতে পাওয়া গিয়েছে, পুথিটির লিপিকাল

আবার ছাপা বইয়ের প্রকাশের পরবর্তী। দ্বিতীয়ত, মুকুন্দ কবিচন্দ্র নামে জনৈক কবির লেখা একখানি 'বাশুলীমঙ্গল' কাব্যে (পুথির লিপিকাল ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ—সা. প. প., ১৩৬২, পৃঃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য) এই শ্লোকগুলি পাওয়া গিয়েছে,

> শাকে রস রথ (রসে) বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
> বাস্থলীমঙ্গল গীত হইল সেই হইতে ॥
> চণ্ডীর চরণে মতি পূর্বজন্মতপে।
> পয়ার রচিয়া কথা কথিব সংক্ষেপে ॥

অনুমান করা যেতে পারে "শাকে রস" ইত্যাদি চরণটি মূলে 'বাশুলীমঙ্গল' কাব্যেরই, পরবর্তীকালে দুই কবির নামের সাদৃশ্যের দরুন শ্লোকটি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কোন কোন পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

তারপর "সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায় শিশুপাঠে কৈলা নিয়োজিত" ইত্যাদি উক্তি থেকে মুকুন্দরামের আরড়ায় আগমনের সময় রঘুনাথ "শিশু" ছিলেন এবং কবির দেশত্যাগ ও কাব্যরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ কালব্যবধান ছিল বলে সুনিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করারও বাধা আছে; কারণ, ডঃ মনোমোহন ঘোষ এই উক্তিটির অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর ব্যাখ্যাও অযৌক্তিক বলা যায় না। তিনি লিখেছেন, "উল্লিখিত অংশটির সারার্থ এই দাঁড়ায় যে, বাঁকুড়া রায় মুকুন্দরামকে শিশুদের পাঠে অর্থাৎ গুরু মহাশয়ের কাজে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র রঘুনাথ (মুকুন্দরামকে দেবানুগৃহীত ব্যক্তি জানিয়া) তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।" ('বাংলা সাহিত্য', পৃঃ ১৮৬)

'শিশু পাঠে'র জায়গায় 'সুত পাঠে' এবং 'সুত পাছে' পাঠও পাওয়া যায়। 'সুত পাঠে' পাঠ ঠিক হলে তার থেকে কবির আরড়ায় আগমন ও কাব্যরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ কালব্যবধান প্রমাণিত হয় না। কারণ, রঘুনাথ প্রথম যৌবনে মুকুন্দরামের কাছে পড়তে পারেন এবং তার অল্প পরে রাজা হয়ে কবিকে চণ্ডীমঙ্গল রচনায় উৎসাহ দিতে পারেন। 'সুত পাছে' পাঠ গ্রহণ করলে রঘুনাথ মুকুন্দরামের কাছে পড়েন নি, তাঁর সান্নিধ্য মাত্র লাভ করেছিলেন, এমন কথা বলা যায়।

বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি বিষয়ের এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) অম্বিকাচরণ গুপ্ত ১৩১২ বঙ্গাব্দের 'প্রদীপে' লিখেছিলেন, মুকুন্দরাম বৃদ্ধবয়সে দামিন্যায় ফিরে এসেছিলেন। ঐ সময়ের আঞ্চলিক শাসনকর্তা তাঁকে সম্মান দেখান এবং তাঁর পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীর নামে "ষোল বিঘা বাস্তু বাগাত ইত্যাদি নিষ্কর করিয়া"

সনদ লিখে দেন। এই সনদটির তারিখ অম্বিকাচরণের মতে ১০২৫ সনের ফাল্গুন মাস বা ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু এর প্রকৃত তারিখ যে ১০৪৭ সন বা ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ তা আমরা পরে দেখাব। অম্বিকাচরণের কথা সত্য হলে বলতে হবে মুকুন্দরাম ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে জীবিত ছিলেন। কিন্তু অম্বিকাচরণের উক্তি কিংবদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা চলে না।

(২) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে চৈতন্যদেবের বন্দনা আছে। বহু পুথি ও ছাপা বইয়ে চৈতন্য-বন্দনার মধ্যে এই অংশটি পাওয়া যায়,

অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা হরি পদছায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারিকা।
ত্রিগর্ত্ত লাহোর দিল্লী ভ্রমিলা অনেক পল্লী
করি প্রভু মুক্তির সাধিকা॥
কয়াড় অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
বিনয়ে মাগিলা বর জপি মন্ত্র দশাক্ষর
মীনমাংস ত্যজি বহুকাল॥

এই মহামিশ্র জগন্নাথ মুকুন্দরামের পিতামহ। কিন্তু তিনি কার কাছে বর মেগেছিলেন? শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে কি? চৈতন্য-বন্দনার মধ্যে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকায় তা'ই মনে হয়। তা'হলে কি উদ্ধৃত অংশের অর্থ এই যে—মহাপ্রভু যখন ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময়ে মুকুন্দরামের পিতামহ তাঁর সঙ্গে দেখা করে বর প্রার্থনা করেছিলেন? ১৫১০ থেকে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি মহাপ্রভু তীর্থভ্রমণ করেছিলেন। এই সময় মুকুন্দরামের পিতামহ যদি বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় জীবিত থাকেন, তাহলে মুকুন্দরামের জীবৎকাল মোটামুটিভাবে স্থির করা যায়। কিন্তু "কয়াড় অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ" ইত্যাদি শ্লোকটি সব পুথিতে চৈতন্য-বন্দনার মধ্যে পাওয়া যায় না এবং "বিনয়ে মাগিলা বর"-এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও বোধহয় সকলে একমত হবেন না। কাজেই আপাতত এ থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাচ্ছে না।

(৩) জনৈক গবেষক লিখেছেন, "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে পাওয়া যায় যে সহর সেলেমাবাজের ভূস্বামী গোপীনাথ নেউগীর তালুক দামিন্যায় কবির পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। এই সেলিমাবাজ—সেলিমাবাদ...সুলেমানাবাদের অপভ্রংশ। সুলেমানাবাদ সরকার বর্তমান বর্দ্ধমান জেলার অংশবিশেষ ছিল এবং সুলেমানাবাদ ঐ নামে অভিহিত

সরকারের শাসন ও রাজস্বের প্রধান কেন্দ্র ও প্রধান সহর ছিল।...Hunter সাহেবের গ্রন্থ (Statistical Account of Bengal) হইতে পাওয়া যায় যে বঙ্গের পাঠান রাজা সুলেমান ১৫৬৩ হইতে ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে ঐ সরকারের নামকরণ হইয়াছিল 'সুলেমানাবাদ'।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী, শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৭-৮)। সেলিমাবাদের আসল নাম যে 'সুলেমানাবাদ' ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে আলোচ্য সরকারের 'সুলেমানাবাদ' নামই পাওয়া যায়। কিন্তু এই 'সুলেমানাবাদ'-এর নামকরণ যে সুলেমান কররানীর (শাসনকাল ১৫৬৩-৭৩ খ্রীঃ নয়, ১৫৬৫-৭২ খ্রীঃ) নাম অনুসারে হয়েছিল, এই উক্তির স্বপক্ষে হাণ্টার কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নি। সুতরাং উদ্ধৃত উক্তির মূল্য আপাতত নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে পারে না; কারণ তাহলে এর দু' তিন দশক পরে ১৫৬৫ থেকে ১৫৭৬ খ্রীঃর মধ্যে 'সুলেমানাবাদ' সরকারের নামকরণ হয়, তাই থেকে লোকমুখে তার 'সেলিমাবাদ' এবং আরও পরে, 'সেলিমাবাজ' নাম দাঁড়ায়। এদিক দিয়ে ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিংবা ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল নির্ধারণ সমীচীন হয় এবং 'সে মানসিংহের কালে' বা 'রাজা মানসিংহ গেলে' পাঠ সমর্থিত হয়।

(৪) মুকুন্দরামের ছেলে শিবরাম চক্রবর্তীর জীবৎকাল সম্বন্ধে কিছু স্বতন্ত্র তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

শিবরাম চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত একটি জমি দানের সনদ দেখেছিলেন অম্বিকাচরণ গুপ্ত। এতে "কুতব খাঁ নামক কর্মচারীর স্বাক্ষর" ছিল। এঁর মারফৎ "দামুন্যা গ্রামে ষোল বিঘা বাস্তু বাগাত ইত্যাদি নিষ্কর করিয়া" দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে সনদটিতে "লিখিত তারিখ বড়ই দুর্বোধ কেবল ফাল্গুন মাস এবং সন ১০২৫ সাল বেশ বুঝিতে পারা যায়।" কিন্তু অম্বিকাচরণ দলিলটির তারিখ পড়তে পারেন নি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই দলিলটি দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "বারা খাঁ বর্দ্ধমান সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ১৬৪০ খ্রী. অ. (১০৪৭ বাং সনে) কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জমী প্রদান করেন। কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত দানপত্রখানি কতকদিনের জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন।" নগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ব্রাহ্মণকাণ্ডে

মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীর দানপত্র

(পৃঃ ১৬১)

(প্রথমাংশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৯৯) এই দলিলটি আলোকচিত্র সমেত মুদ্রিত হয়েছে। এতে বারা খাঁ ও কুতুব খাঁ দু জনেরই নাম আছে। আমরা নীচে এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করলাম।

"শ্রীশ্রীযুৎ যুতায় মিঞা বারা খাঁ
ব্রহ্মোত্তর জমা দলদে শ্রীযুত কুতুব খাঁ
মহাসয় (?) শ্রীযুত ৺জাউ
রকবনী অত শ্রীসিবরাম চক্রবর্ত্তী
মৌজে দামিন্যা পরগণে হাউলী
সরকার ছিলেমাবাজ গ্রাম মহুকুরে
তোমাকে জমি বিষ ২০ বিঘা তুমি বাষবাড়ী দিন
যুতিয়া জোতাইয়া… কে দোহা করিয়া পরম সুখে
ভোগ করহ অপর হা তীন তরফে সভাপণ্ডিতি
বিত্তি আচায্য বরণ ও হুদি বিবরণ ও জলদান ও
জজ্ঞেশ্বর বিধি বেবস্থার চোউত বেদীর সীমানা
ওগয়রহ তোমারে দিব ইতি ইস ১০৪৭ সাল
তাঃ—১ ফাল্গুন—

শ্রী কুতুব খাঁ পারসী মোহর

দলিলটির আলোকচিত্রও আমরা পুনর্মুদিত করলাম।

[নগেন্দ্রনাথ বসু দীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকেই দলিলটি নিয়ে তার পাঠ ও আলোকচিত্র প্রকাশ করেছিলেন; তার প্রমাণ, তিনি ঐ বইয়ে (পৃঃ ৯৮) দীনেশবাবুর কাছে রক্ষিত "কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত পুথি" বলে পরিচিত দামিন্যা গ্রামের পুথির আলোকচিত্রও প্রকাশ করেছেন।]

আরও একটি দলিলে আমরা এক শিবরাম চক্রবর্তীর নাম পেয়েছি। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র'র ২য় খণ্ডে (পৃঃ ৩৪৬) দলিলটি সংগৃহীত হয়েছে। দলিলটির নকল নীচে উদ্ধৃত করছি।

"(পারসী মোহর)

৭ং আদিকৰ্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত সিবরাম চক্রবর্ত্তি সদাসয়েষু শ্রীলিখিত কার্য্যঞ্চ আগে মৌজে মূর্জ্জাপুর তোমাকে আয়মা দিন ওয়া দোয়া করিয়া ভোগস্বত্ব গ্রামের রাজস্ব আমীদির তোমার সহিত রাজস্বের দায় নাহি আর আমরা আবহ পরগনাতে জে তোমার আমল আছে তাহা আমলস্বহ ইতি তা ২১ ফাল্গুন সন ১০৫৯ সাল—

এই দলিলে উল্লিখিত "সিবরাম চক্রবর্ত্তি"র সঙ্গে মুকুন্দরামের ছেলে শিবরাম চক্রবর্তীর অভিন্ন হওয়া সম্ভব। যা' হোক্, এই দলিলটি যদি হিসাবের মধ্যে গণ্য না-ও করা যায়, ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের দলিলটিকে অগ্রাহ্য করা চলে না কোন মতেই। শিবরাম চক্রবর্তী ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন; সুতরাং তাঁর পিতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেশত্যাগ করা অসম্ভাব্য ব্যাপার। অবশ্য এরকম যে হতে পারে না, তা'ও নয়। কবি রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন।

(৫) ১২১৩ বঙ্গাব্দের একটি পুথিতে এই শ্লোকটি পাওয়া গিয়েছিল,

সাল শাকে বসু পক্ষে কোঁকিল অম্বর। নির্ঘাৎ মারিল বাণ চন্দ্রের উপর॥
এই শাকে পুথি হইল চণ্ডী অনুভব। ডিল্লীর তক্তেতে তখন বাদশা অরংজেব॥
(শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', পৃঃ ১০৭ দ্রঃ)

এই শ্লোকটির সাক্ষ্যের কোন মূল্য নেই—কারণ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এতে পুথির লিপিকর নিজের কল্পনা অনুযায়ী মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার এক তারিখ স্থির করেছেন। বসু=৮, অম্বর=০, বাণ ৫, চন্দ্র=১। কিন্তু ১৫০৮ শকাব্দ বা ১৫৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর তক্তে আওরঙ্গজেব ছিলেন না।

মুকুন্দরামের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাগুলির সঠিক কাল নির্ধারণ করবার আশা দুরাশা মাত্র। মাত্র দুটি বিষয় সম্বন্ধে সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সে দুটি বিষয় নীচে উল্লেখ করা হল।

১) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যখন গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের শাসনকর্তা হিসাবে মানসিংহের উল্লেখ আছে, তখন তার রচনা ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে সম্পূর্ণ হতে পারে না। চণ্ডীমঙ্গল রচনার নিম্নতম সীমা নির্ধারণ করা যায় জয়পুর গ্রামের 'দ্বিজাবনীশ' শ্রীধরের শিলালিপি থেকে। ১৫৪৫ শক বা ১৬২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধর ব্রাহ্মণভূমির রাজা, সুতরাং মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের রাজত্ব তার আগেই শেষ হয়েছে। অতএব ১৫৯৪ থেকে ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

(২) মানসিংহের গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের শাসনকর্তা হবার আগে অর্থাৎ ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই যদি মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করে থাকেন, এবং মানসিংহ আসার অব্যবহিত পরেই কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করে যদি তিনি দেহত্যাগ করে থাকেন,

তাহলেও তিনি ১৫৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মুকুন্দরাম যদি মানসিংহের শাসনকালে (১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীঃ) বা তার কিছু পরে দেশত্যাগ করে থাকেন, তা'হলেও তিনি ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সংশয় নেই। অতএব যে দিক থেকেই দেখা যাক্ না কেন, মুকুন্দরাম ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

কল্পনার আশ্রয় না নিলে, অথবা স্বেচ্ছানুযায়ী পাঠ নির্বাচন না করলে, কিংবা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে কতকগুলি সূত্রকে জাল বা প্রক্ষিপ্ত বলে ঘোষণা না করলে এর বেশি আর কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মতের বিচার

আলোচনা শেষ করার আগে আমরা মুকুন্দরামের দেশত্যাগের পটভূমিকা ও তার সময় সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মতের বিচার করব।

এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় বিশ্বভারতী পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩, পৃঃ ২৪৮-২৫৫) প্রকাশিত-তাঁর 'মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে ডঃ সেন "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা" ইত্যাদি শ্লোকটিকে মুকুন্দরামের স্বরচিত এবং দেশত্যাগকালনির্দেশক বলে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন।

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে (পৃঃ ২৪৮) ডঃ সেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় "মানসিংহের কাল"-এর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়েছেন। এই ইতিবৃত্তের সবটাই তিনি আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal, Vol II থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এই ঋণ স্বীকার করতে তিনি ভুলে গেছেন।

অতঃপর ডঃ সেন মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীর "ধন্য রাজা মানসিংহ" ইত্যাদি শ্লোকটির বিভিন্ন পাঠ ও পাঠান্তরের বিচার করেছেন। তিনি "গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ"-এর বদলে "গৌড়াধিপ উৎকল মহিম" পাঠ গ্রহণ করতে চান। তিনিবলেন এই শ্লোকের তৃতীয় ছত্রে "অধর্মী রাজার কালে" "পাঠ স্বীকার করলে দ্বিতীয় ছত্রের এই পাঠ অবশ্যস্বীকার্য।" কেন? "গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ" পাঠ নিলে কি মুকুন্দরামের কোন পূর্ববর্তী শাসক "অধর্মী" হতে পারে না?"

ডঃ সেন "গৌড়াধিপ উৎকল মহিম"-এর অর্থ করেছেন—"যিনি 'গৌড়াধিপ' হয়ে উৎকলে অভিযান করেছিলেন।" কিন্তু এই পাঠ কোন পুথিতেই পাওয়া যায়নি। "গৌড়বঙ্গ উৎকল মহিম" এবং "গৌড়ধিব সকল মোহিত", এই দুই পাঠের সমন্বয় করে

ডঃ সেন এই পাঠ কল্পনা করেছেন। এই পাঠ নিলে শ্লোকটির চতুর্থ ছত্রের "মামুদ (বা মহম্মদ) সরিফ"-এর সঙ্গে "মহিম"-এর মিল হয় না। সুতরাং এই পাঠ গ্রহণ করা যায় না। "গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ" বা "গৌড়বঙ্গ উৎকল মহীপ" পাঠই সঙ্গত ও শুদ্ধ। যখন মানসিংহ এক সময়ে বাংলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা হয়েছিলেন বলেই ইতিহাসে লেখা আছে, তখন এই পাঠের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কেশিয়াড়ীতে মানসিংহের শাসনকালে উৎকীর্ণ ১৫২৬ শকাব্দের শিলালিপিতে যে "শ্রীল রঘুনাথ শর্মা ভূমিপ"-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁকে ডঃ সেন নিঃসংশয়ে মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের সঙ্গে অভিন্ন ধরেছেন। কিন্তু এঁরা যে অভিন্ন, তা বলার পক্ষে যুক্তি থাকলেও নিশ্চিত করে বলবার মত প্রমাণ নেই। রঘুনাথ শর্মার পুত্র চক্রধর শর্মা এই শিলালিপিটি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে ডঃ সেন বলেন, "১৬০৪ সালে রঘুনাথের পুত্র রাজা হয়েছিলেন।" কেন ? পিতার জীবদ্দশায় চক্রধর শিলালিপি উৎকীর্ণ করাতে পারেন না কেন ? ডঃ সেন লক্ষ্য করেন নি যে শিলালিপির রঘুনাথকে "শ্রীল রঘুনাথ" বলা হয়েছে। ডঃ সেন আরও বলেন, "চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময়ে রঘুনাথের পুত্র জন্মায়নি। তাহলে ভনিতায় তার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকত।" কিন্তু কোন কিছুর অনুল্লেখ থেকে কিছু নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় কি ? অতঃপর ডঃ সেন বলেন, "বরং ছেলে যে তখনো হয় নি তারই ইঙ্গিত আছে। কাব্যের শেষের দিকে ভনিতায় রঘুনাথের প্রসঙ্গে বারবার বলা হয়েছে 'অভয়া পুর তার কাম'। এ কামনা পুত্রের জন্য বলেই মনে করি।" এখানে ডঃ সেন কল্পনাকে বড় বেশী প্রশ্রয় দিয়েছেন।

ডঃ সুকুমার সেন অতঃপর এই মত প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথের পুত্র চক্রধর রাজা হয়েছিলেন, অতএব ঐ সময়ে তাঁর বয়স বারো তেরোর কম ছিল না, সুতরাং ১৫৯১-৯২ খ্রীঃ মুকুন্দরামের কাব্যরচনাকালের শেষ সীমা। যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে, (১) শিলালিপির রঘুনাথ শর্মা ও মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায় অভিন্ন, (২) উল্লিখিত শিলালিপি রঘুনাথের মৃত্যু ও চক্রধরের রাজ্যাভিষেকের পরে উৎকীর্ণ, এবং (৩) চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময় রঘুনাথের পুত্র হয় নি, ততক্ষণ এই সিদ্ধান্তকে কোন মূল্যই দেওয়া যায় না।

এরপরে ডঃ সেন দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, ১৪৬৬ শকাব্দেই মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন। তিনি বলেন, "রঘুনাথের রাজ্যকাল ১৫৭৩ থেকে ১৬০৩ সাল। সুতরাং মুকুন্দরামের আরড়ায় আগমন ১৫৭৩ সালের বেশ কিছু আগে।" কিন্তু রঘুনাথের রাজত্বকাল যে ১৫৭৩-১৬০৩ খ্রীঃ, সে সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন ও অম্বিকাচরণ গুপ্তের বিবরণ যথেষ্ট প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং তার উপর নির্ভর করা যায় না।

ডঃ সেন "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা" ইত্যাদি শ্লোককে মুকুন্দরামের স্বরচিত বলেই মনে করেন। তিনি বলেন, শ্লোকটিকে "প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যত সহজ মেনে নেওয়া তত সহজ নয়। প্রশ্ন উঠবে, কে প্রক্ষেপ করলে? কেন প্রক্ষেপ করলে? কোথা থেকে নিয়ে প্রক্ষেপ করলে? কবে প্রক্ষেপ করলে? প্রথম তিন প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই. না সদুত্তর না কদুত্তর। শেষ প্রশ্নের জবাবে বলতে পারি, প্রক্ষেপ যদি হয়েই থাকে তো অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের পরে নয়। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিশাল-লোচনীর গীত' এ ছত্র দুটি উদ্ধৃত আছে।" সর্বশেষ উক্তিটি আমাদের বিস্মিত করেছে। প্রথমত, ডঃ সেন কেন বলছেন দুটি ছত্রই উদ্ধৃত হয়েছে, কেবলমাত্র প্রথম ছত্রটি ("শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা") 'বিশাল-লোচনীর গীত'-এ পাওয়া যায়—সেখানে 'গণিতা'র জায়গায় 'গণিতে' পাঠ দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, ডঃ সেন কেন ধরে নিয়েছেন ছত্র দুটি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকেই 'বিশাললোচনীর গীত'-এ উদ্ধৃত হয়েছে? তার বিপরীতও তো হতে পারে? ঐ ছত্র দুটি বা প্রথম ছত্রটি হয়তো মূলে 'বিশাললোচনীর গীত'-এ ছিল; 'বিশাললোচনীর গীত'-এর রচয়িতার নামও মুকুন্দ, গায়ন বা লিপিকর হয়তো দুই কবির নামসাদৃশ্যে ভুল করে তা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে প্রক্ষেপ করেছে। এর থেকে ডঃ সেনের প্রথম তিন প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যায়।

অতঃপর ডঃ সুকুমার সেন আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীতে 'হৈল রাজা মামুদ শরিফ' এই পাঠ সার্থক হলে রাজা মামুদ নিশ্চয়ই গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ।" কিন্তু গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন এবং পরলোকগমন করেন (History of Bengal, D. U., Vol. II, p. 164)। সুতরাং মুকুন্দরাম যদি ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশত্যাগ করে থাকেন, তা'হলে মামুদ সে সময় রাজা থাকেন কি করে? মামুদের রাজত্ব অবসানের ছয় সাত বছর পরেও (ইতিমধ্যে শের শাহের আবির্ভাব ঘটে গেছে) কি মুকুন্দরাম তার খবর পান নি?

ডঃ সেন লিখেছেন, "তিনি (মুকুন্দরাম) ভুল করেছিলেন যে, মানসিংহের শাসন এদেশে চিরকাল ছিল না। তাঁর দেশত্যাগকালে (অর্থাৎ ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) যিনি রাজা ছিলেন ভ্রমক্রমে তাঁর বদলে মানসিংহের নাম করে ফেলেছেন।" ডঃ সেনের এই কথা সত্য হলে আমাদের বুঝতে হবে মহাকবি মুকুন্দরামের সামান্যতম কাণ্ডজ্ঞানও ছিল না, যার ফলে তিনি মানসিংহের শাসনকালের পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তখনকার রাজা হিসাবে মানসিংহের "নাম করে ফেলেছেন"।

এই প্রবন্ধের পরে ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি পাঠকদের এই প্রবন্ধটিই পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি নতুন কথা যোগ করেছেন, "১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল পরে ("কত দিনে") মুকুন্দরামের দেশত্যাগ ধরিলে কোন অসঙ্গতি হয় না।" খুবই অসঙ্গতি হয়, কারণ সেক্ষেত্রে বলতে হবে মুকুন্দরাম একটি অপ্রয়োজনীয় তারিখ ("শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা") ঘটা করে জানিয়েছেন এবং আসল তারিখ (দেশত্যাগ ও স্বপ্নাদেশপ্রাপ্তির) অস্পষ্ট (vague) রেখেছেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধের আধুনিকতম সংস্করণে সুকুমারবাবু কল্পনা করেছেন যে, মানসিংহের আমলের আগেই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল (আত্মকাহিনী সমেত) রচনা শেষ হয়েছিল, মানসিংহের উল্লেখ সংবলিত অংশ তার মধ্যে পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে! এইভাবে বেপরোয়া কল্পনা করে ও নিজের মতের প্রতিকূল বিষয়গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলে ঘোষণা করে সমস্ত জটিল সমস্যারই খুব সহজে সমাধান করা যায়! যা হোক্, মানসিংহের উল্লেখকে প্রক্ষিপ্ত বলার সামান্যতমও কারণ নেই।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় (পৃঃ ১০৫-১১৫) 'মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্যরচনা-প্রসঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ডঃ দাসের মতে মুকুন্দরাম বাংলা দেশে মানসিংহের শাসনকালেই দেশত্যাগ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পর ডঃ দাস এই সমস্ত সিদ্ধান্ত করেছেন,

"১. মুকুন্দরাম বিধর্মী শাসকের অত্যাচারে বিতাড়িত হন নাই। কিন্তু কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্ট সামগ্রিক পরিবর্তনমূলক নূতন ভূমি ও শাসন-ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় গোপনে পলাইয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও নিপীড়িত হন নাই।

২. তিনি যে আরড়া গেলেন তার কারণ, উহাই সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান যেখানে পুরাতন মুদ্রামান বজায় ছিল এবং পুরাতন জমিদারি অধিকারের আশ্রয়ে সাময়িক নিশ্চিন্ততা বর্তমান ছিল।

৩. তাঁহাকে দুর্বিপাক ভোগ করিতে হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু তাহা বেশি দিনের জন্য নহে। পথযাত্রার কষ্ট ১০।১৫ দিনের হইতে পারে।

৪. তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনায় হস্তক্ষেপ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কখনই হইতে পারে না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, যে-মোগল শাসনে বাংলার মানুষ দেড় শত বৎসরের অধিককাল শৃঙ্খলা ও শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছিল তাহার একটি কৌতুককর দলিল আমরা মুকুন্দরামের স্বগ্রামত্যাগের বিবরণে পাইতেছি।"

ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের প্রবন্ধটি সুলিখিত। আত্মকাহিনীর "ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ", "পোদ্দার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম", "মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া", "সরকার হইল কাল খিলভূমি লিখে লাল" প্রভৃতি উক্তির যে অভিনব ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তা মৌলিক ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসঞ্জাত। কিন্তু এই ব্যাখ্যা মূলত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুমান কখনও তথ্য ও প্রমাণের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। তাই এই ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না।

কয়েকটি ব্যাপারে আমরা ডঃ দাসের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। যেমন, "ডিহিদার" শব্দের অর্থ তিনি করেছেন 'গ্রাম-প্রধান বা ন্থ' চারটি গ্রামের সম্মিলনে গঠিত রাজস্ব-অঞ্চলের প্রধান'। কিন্তু বাংলার সুলতানদের শিলালিপিতে দেখা যায়, "ডিহ্" শব্দটি বড় একটি অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে। অতএব মুকুন্দরাম কথিত ডিহিদার যে মুকুন্দরামের গ্রাম ও আশপাশের গ্রামগুলি নিয়ে গঠিত একটি বড় অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুকুন্দরামের আত্মকাহিনী পড়লে বোঝা যায় যে, ডিহিদার মামুদ সরীফ একজন পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন এবং মুকুন্দরাম বর্ণিত "অত্যাচারী"দের মধ্যে তিনিই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তারপর, 'আকবর-নামা'য় উল্লিখিত উজীর, পোতদার (পোদ্দার), সরকার প্রভৃতি রাজপদ-বাচক শব্দগুলি মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়—এই বিষয়টির উপর ডঃ দাস তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু ঐ শব্দগুলি বহুলপ্রচলিত এবং আকবরের আমলের বহু আগে থাকতেই ঐ শব্দ চালু ছিল; শব্দগুলি মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীতে পারিভাষিক অর্থেও ব্যবহৃত হয় নি; সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া, আকবর সমগ্র বাংলাদেশের জন্য উজীর-পদে নিযুক্ত করে কিস্নদাস নামে যে রাজপুতকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকেই ডঃ দাস মুকুন্দরাম-কথিত "উজীর রায়জাদা"র সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরেছেন; কিন্তু মুকুন্দরামের মত সাধারণ প্রজারা বাংলার উজীরের খোঁজ রাখতেন বলে মনে হয় না, দেশের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের নিতান্ত অস্পষ্ট ধারণা ছিল; মানসিংহকে তাঁরা (শুধু মুকুন্দরাম নন, ভূমিপুত্র চক্রধরও) বাংলার অধিপতি বলে মনে করতেন; আসলে মুকুন্দরাম উল্লিখিত "উজীর রায়জাদা" ডিহিদার মামুদ সরিফেরই উজীর (official না হোক্, unofficial); এর সম্বন্ধে মুকুন্দরাম বলেছেন "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি", আকবরের রাজত্বকালে রাজপুত কিস্নদাসের পক্ষে এরকম

হওয়া কথনই সম্ভব নয়। ডিহিদার মামুদ সরিফ প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার করে নি, কেবল কর্তব্যের অনুরোধে কঠোর হয়েছিল—ডঃ দাসের এই অভিমতও সমর্থন করা যায় না; মুকুন্দরাম ডিহিদারের আচরণে এতদূর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর কল্পিত আদর্শ রাজ্যে তিনি ডিহিদারকে স্থান দিতে চান নি; বুলান মণ্ডলকে কালকেতু বলেছে,

খন্দে নাহি নিব বাড়ি রহে বসে দিব কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে ॥

(বঙ্গবাসী সংস্করণ 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' থেকে উদ্ধৃত)

দেশত্যাগের দীর্ঘকাল পরে মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন। ডিহিদার মামুদ সরিফ কর্তব্যের অনুরোধে কঠোর হয়ে থাকলে এতদিন বাদে তা উপলব্ধি করতে না পারার মত অবুঝ মুকুন্দরাম ছিলেন বলে ভাবা যায় না।

ডঃ দাসের আলোচনা থেকে আর একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। মোগল আমলের নতুন ভূমি ও শাসনব্যবস্থায় অসুবিধা অনুভব করা কি মুকুন্দরামের মত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দেশ ছেড়ে পালাবার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে? নতুন জরীপ ও মুদ্রা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় মুকুন্দরামের জমি ও অর্থের পরিমাণ কমে যাচ্ছিল, কিন্তু একেবারে চলে যাচ্ছিল না। কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে তিনি তো সব কিছুই হারালেন। ডঃ দাস মুকুন্দরামের আড়রায় যাবার কারণ সম্বন্ধে বলেছেন, সেখানে পুরানো ব্যবস্থা চালু ছিল; কিন্তু জমিই যদি না থাকে, তা'হলে পুরোনো ব্যবস্থা চালু থাকলে মুকুন্দরাম কীভাবে লাভবান্ হতে পারেন? সুতরাং কবি ব্যক্তিগতভাবে নিপীড়িত হয়ে দেশত্যাগ করেন নি—ডঃ দাসের এই মত মানা যায় না।

॥ চব্বিশ ॥

মুহম্মদ কবীর

উত্তর ভারতে মনোহর ও মধুমালতীর প্রণয়োপাখ্যান অত্যন্ত বিখ্যাত। এই উপাখ্যান অবলম্বনে হিন্দী ভাষায় অনেকগুলি কাব্য রচিত হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মনঝনের কাব্য (রচনারম্ভকাল ৯৫২ হিজরা অর্থাৎ ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

মুহম্মদ কবীর বাংলা ভাষায় এই উপাখ্যান অবলম্বনে প্রথম কাব্য লেখেন। এই কাব্য প্রথম ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে (ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৫৩৩ দ্রষ্টব্য), এই মুদ্রিত সংস্করণে কবির এই উক্তিটি পাওয়া যায়,

এই সে সোন্দর কেচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশ ভাষাএ মুঞি পাঞ্চালি রচিল ॥*

সেই সঙ্গে এই সংস্করণে রচনাকালবাচক এই হেঁয়ালী শ্লোকটি পাওয়া যায়,

অস্তে অস্তে অস্ত রএ সিন্ধু তার পাছ।
পাঞ্চালী ভনিতে গেল হিজিরার পাঁচ ।*

ডঃ সুকুমার সেন এই হেঁয়ালিকে "অবোধ্য" বলেছেন; কিন্তু ডঃ এনামুল হক এই হেঁয়ালির সমাধান করেছেন—এর প্রথম ছত্র থেকে তিনি ৯৯৭ হিজরা পেয়েছেন (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৯৬-৯৮ দ্রঃ)। এই সমাধান গ্রহণযোগ্য; 'নয়' যখন সর্বশেষ একক সংখ্যা, তখন "অস্ত" বলতে 'নয়'-ই বোঝাবে। ("অস্তে অস্তে অস্ত রএ"—এর মূল পাঠ "অঙ্ক অস্তে অঙ্ক রএ" ও হওয়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রেও প্রথম ছত্র থেকে ৯৯৭ হিজরাই পাওয়া যাবে।)

ডঃ আলী আহসান 'সাহিত্য পত্রিকা'র ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (পৃঃ ৪৩-৫৪) মনঝন ও মুহম্মদ কবীরের কাব্যের তুলনামূলক বিচার করে দেখিয়েছেন যে, "মনঝনের মধুমালতী অবলম্বন করে তিনি (অর্থাৎ মুহম্মদ কবীর) তাঁর মধুমালতী কাহিনী রচনা করেছিলেন।"

* এই দু'টি শ্লোকই ডঃ এনামুল হক দেখেছিলেন চট্টগ্রাম জেলার জোয়ারগঞ্জ গ্রামের একটি পুঁথিতে।

মনঝনের কাব্যের রচনা যদি ৯৫২ হিজরায় আরম্ভ হয়ে থাকে, তা হলে মুহম্মদ কবীরের কাব্য ৯৯৭ হিজরায় রচিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।* তবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলা ছিল মোগলসম্রাট আকবরের অধীন। ঐ সময়ে দিল্লী ও উত্তর ভারত থেকে অসংখ্য রাজকর্মচারী বাংলায় আসত। তাদের কারও হাত দিয়ে মনঝনের কাব্যের পুথি বাংলায় আসা ও এদেশে অল্পকালের মধ্যেই তার প্রচার হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

এই কারণে আমি সিদ্ধান্ত করছি যে, মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' ৯৯৭ হিজরা বা ১৫৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত হয়। তবে ঐ সাল কাব্যের রচনা আরম্ভের তারিখ। কবি বলেছেন কাব্য শেষ করতে আর পাঁচ হিজরা অতিবাহিত হয়েছিল—"পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজিরার পাঁচ"। সুতরাং ৯৯৭+৫=১০০২ হিজরা বা ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যের রচনা সম্পূর্ণ হয়।

মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী'র নতুন সংস্করণের (১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) ভূমিকায় সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ "বাংলা ভাষা অর্থে 'হিন্দুয়ানি' শব্দের প্রয়োগ" মুহম্মদ কবীরের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য। বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা যে আরবী বা ফার্সী নয়, বাংলা—এই সত্যটি উপলব্ধি করতে তাঁদের কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। উপলব্ধি করার আগে তাঁরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে মনে করতেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই ঐ ধারণার প্রতিফলন দেখতে পাই। তাই দেখি, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর 'নবীবংশ' কাব্যে বলেছেন,

"কহে ছৈদ সুলতানে শুন নরগণ।
এহি মত নবীবংশ শুন দিয়া মন॥

* আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মুহম্মদ কবীরের কাব্যের একটি পুথিতে রচনাকালবাচক শ্লোকটির এই পাঠান্তর পেয়েছিলেন,

অঙ্গসঙ্গে রঙ্গ রস বিন্দু তার কাছ।
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজরার পাঁচ॥

ডঃ এনামুল হক এই শ্লোকটির "পাঠশুদ্ধি" করে এর থেকে ৮৯০ হিজরা বা ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই সাল উপরে বর্ণিত কারণের জন্য মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী'র রচনাকাল হওয়া সম্ভব নয়। ডঃ এনামুল হক 'অঙ্গ'কে ৮ এবং 'রস'কে ৯ অর্থে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এই দুই শব্দেরই আঙ্কিক অর্থ ৬ (১৩৩৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের 'আঙ্কিক শব্দ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

আছিল আরবী ভাষা হিন্দুআনি কৈলু।
বঙ্গদেশি বুঝে মত প্রচারিয়া দিলু ॥
ন বুঝি আরবি শাস্ত্র জ্ঞান ন পাইলা।
হিন্দুয়ানি ভাষা পাই আচারে রহিলা ॥"

মুহম্মদ কবীরও অনুরূপ কথাই লিখেছেন,

মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি।
আছিল ফারসি কিতাব * করিল হিন্দুয়ালি ॥

অতএব মুহম্মদ কবীরকে সৈয়দ সুলতানের কাছাকাছি সময়ের লোক বলেই ধরতে হয় এবং এদিক দিয়েও ৯৯৭-১০০২ হিজরাকে তাঁর কাব্যের রচনাকাল বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হয়।

---

* ডঃ আলী আহসান দেখিয়েছেন যে এক্ষেত্রে "ফারসি কিতাব" শব্দের অর্থ মনঝনের হিন্দী কাব্যের ফার্সী অক্ষরে লেখা পুথি (সাহিত্য পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪১-৪৩ দ্রঃ)

॥ পঁচিশ ॥

শাহ মোহাম্মদ সগীর

শাহ মোহাম্মদ সগীর একজন শক্তিশালী কবি। ফার্সী ভাষার বিখ্যাত প্রণয়কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা'র বিষয়বস্তু অবলম্বনে তিনি বাংলা ভাষায় 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য লিখেছিলেন।

সগীরের আবির্ভাবকাল নিয়ে এ পর্যন্ত যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন সগীর গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১৩৯০-১৪১০ খ্রীঃ) পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। তিনি "চট্টগ্রামের পুথির সহিত মিলাইয়া ত্রিপুরার খণ্ডিত পুথির পত্র হইতে কবির যে আত্মবিবরণী" প্রস্তুত করেছিলেন, তা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের 'মাহে-নও' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এর পরে 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি ঐ আত্মবিবরণীর অসংশোধিত অবিকল পাঠ ও আলোকচিত্র প্রকাশ করেছেন। আত্মবিবরণীর নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলি থেকে ডঃ হক তাঁর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন,

রাজা রাজ্যেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত॥
মনুষ্যের মধ্যে যেহ্ ধর্ম অবতার।*
মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার॥*
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজয়।
পুত্র শিষ্য হস্তে তিঁই মাগে পরাজয়॥
মহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিআ।
লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ॥
করুণা হৃদয় রাজা পুণ্যবন্ত ওর।
সবগুণে অসীম অতুল মনোহর॥
পূর্ণিমার চান্দ জনি বদন সুন্দর।
মধুর মধুর বাণী কহন্ত সুন্দর॥

---

* এই দুই ছত্রের পাঠ পুথির "মূল বানানে" এই,

মনুস্তের মৈদ্ধে যেহ্ ধর্ম্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পিরথিবীর সার॥

রমণীবল্লভ নৃপ রসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিমা ॥
... ...
মোহাম্মদ সগীর তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহান আছুক যশ ভুবন এ তিন ॥

এই ছত্রগুলির মধ্যে কোন একজন রাজার বন্দনা করা হয়েছে। শেষ দুই ছত্রের ভাষা থেকে মনে হয় এই রাজা সগীরের সমসাময়িক এবং পৃষ্ঠপোষক। ডঃ এনামুল হক বলেন যে উদ্ধৃত অংশের চতুর্থ ছত্রের "নরপতি গ্যেছ" কথায় অর্থ "গ্যেছ" নামক রাজা এবং গ্যেছ=গিয়াস=গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ তাঁর পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে গৌড়বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। উদ্ধৃত অংশের পঞ্চম থেকে অষ্টম ছত্রে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বলে ডঃ হক মনে করেন। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই,

(ক) "মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার"—এই চরণটির 'গ্যেছ' শব্দটি কোন রাজার নাম হিসাবে, বিশেষ করে কবির পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম হিসাবে গ্রহণ করা চলে কিনা, তা বিতর্কের বিষয়। পৃষ্ঠপোষক রাজার নামকে এ'রকম সংক্ষেপে ও বিকৃতভাবে কোন-ক্রমে মাত্র এক জায়গায় উল্লেখ করে চলে যাওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার।

(খ) নামটি মূলে "গ্যেছ" ছিল কিনা, তা'ও সংশয়ের বিষয়। 'যেহু' 'যেহ' প্রভৃতি শব্দ লিপিকর-প্রমাদে "গ্যেছ"-এ রূপান্তরিত হতে পারে, অথবা পুথির অস্পষ্ট অক্ষরের জন্য ঐ সব শব্দকে কেউ ভুল করে "গ্যেছ"-রূপে পড়তে পারেন। "গ্যেছ"-এর জায়গায় ঐ শব্দগুলি চরণটির মধ্যে সার্থকতর ভাবে স্থান পেতে পারে। মোটের উপর "গ্যেছ"—এই ছোট্ট শব্দটির মধ্যে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের নাম আবিষ্কার করতে হলে আরও জোরালো প্রমাণ দরকার।

(গ) এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, ডঃ এনামুল হক 'ইউসুফ-জোলেখা'র পুথির যে আলোকচিত্র প্রকাশ করেছেন, তাতে "গ্যেছ" শব্দটি ম্যাগনিফাইং লেন্স ব্যবহার করেও স্পষ্টভাবে পড়া যায় না।

(ঘ) "ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজয়" থেকে "লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ" পর্যন্ত চরণগুলিতে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পিতাকে হারিয়ে রাজ্য অধিকার করার প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে বলে ডঃ হক মনে করেন। কিন্তু চরণ-গুলির স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে এদের মধ্যে এমন একজন রাজার কথা বলা

হয়েছে, যিনি মহাজন-বচন সার্থক করে নিজের পুত্র বা শিষ্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং অন্যদের হারিয়ে গৌড় ও বঙ্গের রাজ্য অধিকার করেছিলেন।

(ঙ) সগীরের কাব্যের যতটুকু অংশ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তার ভাষা থেকেও সগীরকে অত প্রাচীন বলে মনে হয় না।

(চ) অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভুঁইয়া দেখিয়েছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত 'ইউসুফ-জোলেখা'র একটি পুথিতে কাব্যের কাহিনীর মধ্যে তার অন্যতম চরিত্র রাজা তৈমুসের গুণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে,

> মনুস্তের মৈদ্ধে জেন ধর্ম্ম অবতার
> মোহা মোহা নরপতি পৃথিস্কির সার ॥
> ... ...
> রাজা রাজেশ্বর মোহা ধাম্মিক পণ্ডিত।
> দেব অবতার নৃপ জগত বিদিত ॥
> ... ...
> করুণা হৃদএ রাজা পুণ্য তত্তপর।
> সর্বগুণে অসীম অতুল মেনোহর ॥
> পুন্নিমার চন্দ্র জিনি বদন সোন্দর।
> মধুর মধুর বানি কহে মৃদুস্বর ॥
> রমনি বল্লব নৃপ রসে নিউপমা।
> কনে বা কহিতে পারে সে গুন মহিমা ॥

এই ছত্রগুলিই আবার ডঃ এনামুল হক কর্তৃক প্রকাশিত সগীরের পূর্বোক্ত রাজবন্দনার মধ্যে প্রায় অবিকলভাবে পাওয়া যায়—দু' একটি শব্দ মাত্র পরিবর্তিত হয়েছে। এইভাবে অধ্যাপক ভুঁইয়া রাজবন্দনার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে তাঁরই ভাষায় "ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ" সৃষ্টি করেছেন।

এরপর অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভুঁইয়া 'নও বাহার' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় (পৃঃ ২২৫-২২৮) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখেন, "শাহ মোহাম্মদ সগীরের কাব্যে আমরা যে সমস্ত ভনিতা পাই তাহাতে দেখা যায় যে, কবি ইহা ফারসী কোনও কিতাব দেখিয়া রচনা করিয়াছেন।...পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাকবি ফেরদৌসী এবং মোল্লা আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-৯২ খ্রীঃ) 'যুসুফ জোলেখা' নামীয় কাব্য যথাক্রমে একাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচনা করিয়াছেন।...

ফেরদৌসী, জামী ও সগীরের কাব্য আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সগীরের কাব্যখানি জামীর কাব্যের অনুকরণে রচিত ; ফেরদৌসীর কাব্যের কোন প্রভাব ত াহার কাব্যে নাই। সুতরাং জামীর 'য়ুসুফ জোলেখা' কাব্য রচনার (রচনা-কাল—৮৮৮ হি:=১৪৮৩ খৃ: দ্রষ্টব্য—Literary History of Persia—E. G. Brown, Vol. III, page 516) অন্ততঃ পক্ষে একশত বৎসর পরে আমাদের বঙ্গাল দেশের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর ত াহার 'য়ুসুফ জোলেখা' কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই খুব নেক নজরে দেখিলেও শাহ মোহাম্মদ সগীরকে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে ফেলা যায় না।"

এর পরে অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভূঁইয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্যিকী'র ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের শরৎ সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং সগীর ও জামীর কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁর সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সগীর যে খুব আধুনিক কবিও নন, তা'ও তাঁর কাব্যের ভাষা থেকেই বোঝা যায়। মোটামুটিভাবে বিচার করে, তিনি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনা করেছিলেন বলে মনে করা যায়।

শেখ এ. টি. এম রুহুল আমীন ১৩৭১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সগীর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে "সগীর" নামটি ভুল, কবির আসল নাম "সগিরি" (যা অনেক পুঁথিতে পাওয়া যায়)। জনাব আমীন "সগিরি" নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এবং আলোচ্য কবির বংশপরিচয় ও পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা লিখেছেন। তাঁর আলোচনার ভিত্তি প্রধানত কিংবদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সব কিংবদন্তীর সমর্থনে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য-প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত জনাব আমীনের সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করা যায় না।

॥ ছাব্বিশ ॥

কাশীরাম দাস

কাশীরাম দাসের মহাভারত যে শুধু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাই নয়, জনপ্রিয়তার দিক্ দিয়েও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভিন্ন আর কোন বাংলা কাব্য তার কাছে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু কৃত্তিবাস শুধু বাংলা রামায়ণের শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয়তম কবি নন, আদি কবিও বটেন। কাশীরাম দাস শেষোক্ত গৌরব দাবী করতে পারেন না। তাঁরও আগে বহু কবি "অমৃত সমান" "মহাভারতের কথা"কে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে বাঙালীর কাছে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁদের পথে চলে কাশীরাম যশের স্বর্ণমন্দিরে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু কাশীরামের কৃতিত্বও অল্প নয়। তাঁর মহাভারত রচিত হবার পরে পূর্ববর্তী কবিদের লেখা মহাভারতগুলি একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেল এবং তাঁর পরবর্তী কোন কবিরই রচিত মহাভারত আর জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হ'ল না। মহাভারতের মাত্র কয়েকটি পর্ব রচনা করে কাশীরাম যে আসন পেলেন, সম্পূর্ণ মহাভারতের রচয়িতাদের পক্ষেও সে আসন লাভ সম্ভব হ'ল না। এত অল্প আয়াসে দিগ্বিজয় করা খুব কম কবির পক্ষেই এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে।

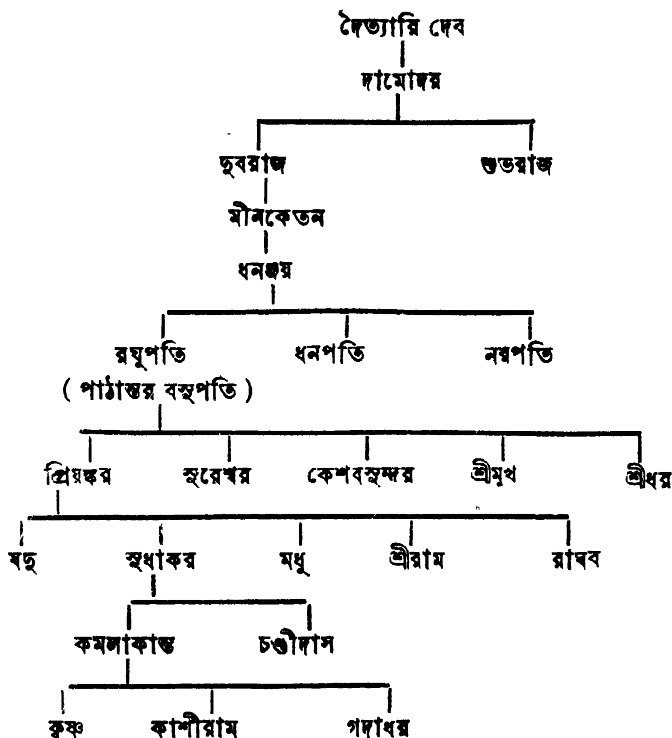
কাশীরাম দাসের ব্যক্তিগত ও বংশগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি। কাশীরাম দাস নিজে তাঁর মহাভারতের আদি পর্বের শেষে নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন,

> ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিদ্ধি (পাঠান্তর 'সিঙ্গি') গ্রাম।
> প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম ॥
> তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
> কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥

কাশীরাম দাসের অনুজ গদাধর দাস 'জগন্নাথমঙ্গল' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে কাশীরাম ও গদাধরের বাসভূমি ও বংশপরিচয় সম্বন্ধে কিছু বেশি তথ্য পাওয়া যায়। বাসভূমি সম্বন্ধে গদাধর দাস লিখেছেন,

> ভাগীরথীতটে বাটী ইন্দ্রায়নী নাম।
> তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিদ্ধি (পাঠান্তর 'সিঙ্গি') গ্রাম ॥
> অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে।
> নিবাস আমার সেই চরণকমলে ॥

বংশপরিচয় সম্বন্ধে গদাধরদাস দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। এর থেকে এই বংশলতা প্রস্তুত করা যায়,



কাশীরাম ও গদাধরের পিতা কমলাকান্ত সম্বন্ধে গদাধর লিখেছেন,

দেব শ্রীকমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস।
জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড্রে কৈল বাস॥
কমলাকান্তের হল্য এ তিন কোঙর।

সুতরাং কমলাকান্ত উড়িষ্যায় জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে সেখানেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। উপরের উদ্ধৃতি থেকে মনে হয়, উড়িষ্যাতেই কাশীরাম দাসের তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে গদাধর দাস উড়িষ্যাতে (কটকের নিকটবর্তী মাথনপুর গ্রামে) থেকেই তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। কাশীরামও যে উড়িষ্যায় তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই;

তাঁর মহাভারতের কোন কোন ভনিতায় লেখা আছে, "কাশীদাস-প্রভু যে শ্রীনীলশৈলারূঢ়" অর্থাৎ কাশীদাসের প্রভু নীলাচলবাসী জগন্নাথ।* কিন্তু কাশীরাম উত্তর কালে দেশে ফিরে এসেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়, অন্যথা তাঁর মহাভারত অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় এত জনপ্রিয় হতে পারত বলে বোধ হয় না। কাশীরামের মহাভারতের বহু পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থে এই ভনিতাটি পাওয়া যায়,

হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।

এই হরিহরপুর নিঃসন্দেহে বাংলার অন্তর্ভুক্ত। কাশীরাম এখানে থেকেই মহাভারত রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়।

কাশীরাম ও গদাধর দু'জনেই তাঁদের তিন ভাইয়ের নামের সঙ্গে 'দাস' শব্দ যোগ করেছেন। কিন্তু গদাধর দাসের বিবরণ এবং কাশীরাম দাসের কোন কোন ভনিতা থেকে জানা যায় যে, তাঁদের কৌলিক পদবী ছিল 'দেব'। তাঁরা যে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, তা'ও কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকেই জানা যায়; কাশীরাম দাস তাঁর প্রপিতামহ প্রিয়ঙ্কর দাস সম্বন্ধে বলেছেন, "কায়স্থ কুলেতে জন্ম", পরবর্তী কালে গায়ন ও লিপিকররা কাশীরাম দাস সম্বন্ধে বলেছেন, "ধন্য হইল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস"। আগে ব্রাহ্মণরা নামের সঙ্গে লিখতেন 'শর্মা,' ক্ষত্রিয়রা লিখতেন 'বর্মা', বৈশ্যরা লিখতেন 'গুপ্ত' এবং কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির লোকরা লিখতেন 'দাস'। কাশীরাম ও গদাধর এই রীতিই অনুসরণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম উল্লেখ করেছেন— 'কৃষ্ণ দাস'; কিন্তু এক্ষেত্রেও "দাস" পদবীর স্থলাভিষিক্ত শব্দ—নাম "কৃষ্ণ"।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রধান প্রধান কবির মত কাশীরাম দাসকে ঘিরেও কতকগুলি ছোট-বড় সমস্যা রয়েছে। প্রথম সমস্যা—কাশীরামের গ্রামের নাম কী? কাশীরাম ও গদাধর—উভয়েরই বিবরণে গ্রামের নাম উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে পাঠের অনৈক্য দেখা যায়—কোথাও 'সিঙ্গি',

* ডঃ সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "তখন মেদিনীপুর জেলার ও ধলভূমের সংলগ্ন অংশও উৎকলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (বা. সা. ই. ১। অ, ২য় সং, পৃঃ ১০৬) কাশীরামের পিতা কমলাকান্ত উড়িষ্যার অভ্যন্তরে জগন্নাথ দেখতে গিয়ে তার কাছাকাছি অঞ্চলে বসতি স্থাপন না করে মেদিনীপুর বা ধলভূমে করবেন কেন, তার কোন ব্যাখ্যা ডঃ সেন দেন নি। কমলাকান্ত যে পুরীর কাছাকাছি অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে গদাধরের কটকের কাছে মাথনপুরে বাস করার মধ্যে।

আবার কোথাও 'সিদ্ধি' পাঠ পাওয়া যায়। কাটোয়ার কাছে এই দুই নামের দু'টি গ্রামের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 'সিঙ্গি' গ্রামের অধিবাসীরা কাশীরাম দাসকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে দাবী করেন এবং সেখানকার "কেশে-পুকুর" নামক পুকুরকে কাশীরামের স্মৃতিবাহী বলে পরিচয় দেন। অপর দিকে 'সিদ্ধি' গ্রামের স্বপক্ষেও গ্রামের 'কাশী-গড়ে' পুকুরের উল্লেখ করা হয়েছে এবং নানারকম যুক্তি দেখানো হয়েছে (অভয়াদাস মুখোপাধ্যায় রচিত 'কাশীরাম দাসের জন্মস্থান' প্রবন্ধ, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৬১, পৃঃ ৫৯৯-৬০০ দ্রষ্টব্য)। আমার মনে হয়, কাশীরামের আদি বাড়ি 'সিদ্ধি'তেই ছিল। তার প্রমাণ, প্রথমত, কাশীরাম ও গদাধর দু'জনেই বলেছেন যে তাঁদের গ্রাম ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত ছিল; 'সিদ্ধি' ভাগীরথীর তীরেই, তার অনেকখানি এখন ভাগীরথীর গর্ভে চলে গিয়েছে; কিন্তু 'সিঙ্গি' ভাগীরথী-তীর থেকে কিছু দূরে, কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, গদাধরদাস লিখেছেন যে তাঁদের গ্রাম ছিল "অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে"; 'সিদ্ধি' অগ্রদ্বীপের সংলগ্ন, কিন্তু 'সিঙ্গি' অগ্রদ্বীপ থেকে অনেকখানি দূরে অবস্থিত। 'সিঙ্গি'র অবস্থান নির্দেশ করতে হলে অগ্রদ্বীপের নাম না উল্লেখ করে কাটোয়ার নাম উল্লেখ করার কথা। তৃতীয়ত, কাশীরাম ও গদাধর— দু'জনেরই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের গ্রাম ছিল 'ইন্দ্রাণী' ('ইন্দ্রাবনী', 'ইন্দ্রায়নী', 'ইন্দ্রাইনী' নামেও উল্লিখিত) নামক অধুনালুপ্ত বৃহৎ নগরের একটি অংশ। কাশীরাম 'ইন্দ্রাণী'কে "ইন্দ্রাণী নগর" বলেও উল্লেখ করেছেন। কাশীরামের মহাভারতের অনেক পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থে 'ইন্দ্রাণী'র এই বর্ণনা পাওয়া যায়,

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা দেবী ভাগীরথী॥

'ইন্দ্রাণী' সম্বন্ধে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে। সেটি এই,

বার ঘাট, তের হাট, তিন চণ্ডী, তিনেশ্বর।
ইহাই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর॥

বর্ত্তমান দাঁইহাট শহরকে ঘিরে এই 'ইন্দ্রাণী' নগর ছিল এবং দাঁইহাট উদ্ধৃত ছড়ায় উল্লিখিত তের হাটের অন্যতম হাট। 'ইন্দ্রাণী' তখন এত বিশিষ্ট একটি জনপদ ছিল যে বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' "ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঞা নামে গ্রাম" বলে কাটোয়ার অবস্থিতি জানিয়েছেন; মুকুন্দরামও তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে ইন্দ্রাণী ও সেখানকার ইন্দ্রেশ্বর শিবের উল্লেখ করেছেন। 'সিদ্ধি' গ্রাম ছিল 'ইন্দ্রাণী' নগরের সংলগ্ন; কিন্তু

'সিঙ্গি' ঐ নগরের সীমানা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং 'সিদ্ধি'কেই কাশীরাম দাসের দেশ বলে নির্দেশ করা চলে।

কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত মহাভারতের সবটা যে তিনি লেখেন নি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন এই—কতটা তিনি লিখেছিলেন? কোন কোন পুথিতে লেখা আছে,

ধন্য ধন্য কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
চারি পর্ব্ব ভারতের করিলা প্রকাশ॥
আদি সভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥

কিন্তু অন্য একটি পুথিতে এই চরণগুলির যে পাঠান্তর পাওয়া যায়, তা এই—

ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ।
আদি সভা……যে রচিল পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, কাশীরাম দাস ক'টি পর্ব লিখেছিলেন—তিন না চার? কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর সম্পাদিত মহাভারতের 'অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদে'র উপসংহারে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন,

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥

এই শ্লোকে তিন ও চারের মধ্যে একটা রফা করে দু'দিক রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু বিরাটপর্ব অসমাপ্ত রেখে কাশীরাম দাস পরলোকগমন করেছিলেন ধরায় অসুবিধা আছে। বিরাটপর্বের একটি পুথিতে রচনাসমাপ্তিকাল-নির্দেশক শ্লোক এবং "বিরাট হইল সাজ কাশীদাস কয়" উক্তি পাওয়া যায় (পরে দ্রষ্টব্য)। কাশীরাম দাস বিরাট-পর্বের সবটা লেখেন নি বললে ঐ শ্লোক ও উক্তিকে জাল বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিরাটপর্বের যতগুলি পুথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় সবগুলিতেই আদ্যন্ত কাশীরাম দাসের ভনিতা পাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয়টি এক সময়ে খুব জটিলই ছিল, কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৫,

পৃঃ ৯৪-৯৭ দ্রষ্টব্য), তাতে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। অক্ষয়বাবুর গবেষণা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কাশীরাম দাস আদি, সভা ও বিরাট—এই তিনটি পর্বের রচনা সম্পূর্ণ করেন ; বনপর্ব বিরাটপর্বের পূর্ববর্তী হলেও কাশীরাম বিরাটপর্ব রচনা শেষ করবার পরে বনপর্ব রচনা সুরু করেন এবং বনপর্ব অসম্পূর্ণ রেখে তিনি মারা যান। অক্ষয়বাবু ১৭২১ শকাব্দের একটি খণ্ডিত বনপর্বের পুথিতে এই শ্লোকটি পেয়েছেন,

আদি সভা বিরাট বনের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর ॥

কালীপ্রসন্ন সিংহ যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন, তার সঠিক পাঠ উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে পাওয়া যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি। বনপর্ব বিরাটপর্বের পূর্ববর্তী হওয়ার দরুন কালীপ্রসন্ন সরল বিশ্বাসে ইচ্ছাকৃতভাবে শ্লোকটির ভাষায় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন—এমনও হতে পারে।

বনপর্বের কতটা কাশীরাম দাস রচনা করেছিলেন, তা'ও অক্ষয়বাবুর আলোচনা থেকে জানা যায়। অক্ষয়বাবুর সংগৃহীত বনপর্বে একটি পুথিতে দেখি "জিত" নামে জনৈক লেখক বলছেন,

ধন্য ছিল কায়েস্ত কুলেতে কাশীদাস।
চারি পর্ব্ব মহাভারত করিলা প্রকাশ ॥
আদ্য সভা বিরাটের রচিলা পাচালি।
তাহা শুনি সর্ব্ব লোক ধন্য ২ বলি ॥
পূর্ব্বে তিহো আরম্ভ করিলা এই পুথি।
কালবশে মৃত্যু তার হইল দৈবগতি ॥
আগস্ত উপাক্ষণ (অগস্ত উপাখ্যান) করি হৈল কালপ্রাপ্ত।
বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্ত ॥

এই ছত্রগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭২৪ নং পুথিতেও পাওয়া যায় ; শেষ দু ছত্রের পাঠান্তর ঐ পুথিতে এইভাবে মেলে,

অগস্তি আক্ষাণ (অগস্ত্য আখ্যান) করি হৈল কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্তি ॥

অক্ষয়বাবুরই সংগৃহীত আর একটি বনপর্বের পুথিতে "অগস্ত্য উপাখ্যানে ভগীরথের

গঙ্গা আনয়নের পর লোমশ মুনি কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ভৃগুরামের পরাজয় কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে" এই ছত্রগুলি পাওয়া যায়,

মুনি কহে কহিলাঙ অগস্তী আক্ষান।
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা হরষ বিধান॥
কাশীদাস কহে এই অমৃত সমান।
কর্ণপথে সাধু নর সদা কর পান॥
এতবধি বনপর্ব্ব কাশীদাস কৈল।
অবধান করি সভে একান্তে শুনিল॥
না হইতে বনপর্ব্ব কথা সমাধান।
কাশীদাস করিলেন স্বর্গের পয়ান॥

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল দু'জনেই দেখিয়েছেন যে বনপর্বের পুঁথিতে অগস্ত্য উপাখ্যানের পর আর কাশীরাম দাসের ভনিতা পাওয়া যায় না; অন্ত কবির ভনিতা পাওয়া যায় (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি)।

সুতরাং কাশীরাম দাস আদিপর্ব, সভাপর্ব ও বিরাটপর্ব সম্পূর্ণ রচনা করার পরে বনপর্বের অগস্ত্য উপাখ্যান পর্যন্ত লিখে পরলোকগমন করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বনপর্বের আগেই বিরাটপর্ব রচনা করেছিলেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অনেকেই এরকম করে থাকেন। বাংলা মহাভারত-রচয়িতা অনিরুদ্ধও উদ্যোগপর্ব ও ভীষ্মপর্ব রচনার পরে বনপর্ব রচনা করেছিলেন (সা. প. প., ব. ৬৬, স. ৫, পৃঃ ৯৭)। সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ ভাগবতপুরাণের বাংলা অনুবাদ করার সময়ে তৃতীয় স্কন্ধ অনুবাদ করার পরে দ্বিতীয় স্কন্ধ অনুবাদ করেছিলেন।

এখন আমরা কাশীরাম দাসের কাল নির্ধারণ করব।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়। কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'জগন্নাথমঙ্গল' রচনা করেন ('গদাধর দাস' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। 'জগন্নাথমঙ্গলে' কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার উল্লেখ আছে,

কমলাকান্তের হৃদ্য এ তিন কোঙর।
প্রথমে সে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত-পুরাণ॥

সুতরাং কাশীরাম দাসের মহাভারত ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগেই লেখা হয়েছিল।

১২৩৬ বঙ্গাব্দে লেখা কাশীদাসী মহাভারতের একটি বিরাটপর্বের পুথিতে এই রচনাকালনির্দেশক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥

এর থেকে দক্ষিণাগতিতে ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। শ্লোকটি কাশীরামের লেখা কিনা, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু আগেই আমরা দেখিয়েছি যে কাশীরাম দাস বিরাটপর্বের রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন। সুতরাং বিরাট-পর্বের রচনাসমাপ্তির কালবাচক এই শ্লোকটি যে কাশীরাম দাসের রচিত, তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। অতএব ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দই তাঁর বিরাটপর্বের রচনাসমাপ্তিকাল বলে গ্রহণ করা যায়।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্বের একটি পুথিতে এইভাবে হেঁয়ালিতে রচনাকাল দেওয়া আছে,

শকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিনগুণে।
রুক্মিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় এই হেঁয়ালির এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "পঞ্চাননের পাঁচ মুখেই বিধু। অতএব বিধুমুখ=৫। ইহার তিনগুণ=১৫। রুক্মিণীনন্দন কাম, কামের পঞ্চশর। 'অঙ্ক' শব্দ দ্ব্যর্থ; ১৫, এই অঙ্কের ৫ অঙ্ক; এবং অঙ্কে কোলে, দুই বাহুতে। অর্থাৎ ৫ এর পর দুই। জলনিধি, সাগর=৪। সমুদয় অঙ্ক ১৫২৪ শক।

আচার্য যোগেশচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে মানতে অসুবিধা আছে। 'বিধুমুখ তিনগুণে'র যে অর্থ তিনি করেছেন, তা সুসঙ্গত বলে আমরা মনে করি। কিন্তু 'রুক্মিণী-নন্দন অঙ্কে' পদের যে ব্যাখ্যা আচার্য যোগেশচন্দ্র দিয়েছেন, তা কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয়। আর মদনের পাঁচ শর বলে 'রুক্মিণীনন্দন' বা মদন=৫ বোঝাবে কেন? 'মদন' শব্দ ১৩ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, সংস্কৃত সাহিত্যে 'সাগর' (বা তার সমার্থবাচক শব্দগুলি) ৪ অর্থে ব্যবহৃত হলেও বাংলা রচনায় সাধারণত ৭ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত হেঁয়ালির ব্যাখ্যা এই:—

বিধুমুখ তিনগুণে=১৫, রুক্মিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে ১৩+৭=২০।

অতএব ১৫২০ শকাব্দ বা ১৫৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দই আদিপর্বের রচনাসমাপ্তিকাল বলে

আমাদের ধারণা। মোটের উপর কাশীরাম দাসের মহাভারত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে রচিত হয়েছিল বললে ভুল হয় না।

কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত মহাভারতের বিরাটপর্বের পরবর্তী পর্বগুলি কার বা কাদের লেখা, সেটি এক জটিল প্রশ্ন। উদ্যোগপর্ব, দ্রোণপর্ব, ও কর্ণপর্বের অনেক পুথিতে নন্দরাম নামক জনৈক কবির ভনিতা পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং নন্দরাম অন্তত উদ্যোগ, দ্রোণ ও কর্ণপর্ব লিখেছিলেন বলে মনে হয়। এই নন্দরাম সম্পর্কে কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র।

এসম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি "বিশ্বকোষ অফিসে রক্ষিত কাশীদাসী মহাভারতের একখানি প্রাচীন পুথি" তে এই ছত্রগুলি পেয়ে তাঁর সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভূমিকায় প্রকাশ করেন,

কাশীরাম দাশর তিঁহ জ্যেষ্ঠতাত। মৃত্যুকালে আজ্ঞা কৈল শিরে দিয়া হাত॥
আয়ু অবশেষ বাপু যাই পরলোকে। রচিতে না পালাঙ পোথা পাই বড় শোকে॥
আশীর্ব্বাদ করি আমি বলিহে তোমারে। পাণ্ডব চরিত্র বাপু রচিবা আদরে॥
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি ভাবি রাধাশ্যাম। দ্রোণপর্ব্ব ভারত রচিল নন্দরাম॥

ডঃ সুকুমার সেনও উদ্যোগপর্বের একটি পুথিতে এই কটি ছত্র পেয়েছেন,

কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা। ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা॥
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহো খুল্লতাত। প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্ব্বাদ॥
আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক। রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক॥
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।* রচিবে পাণ্ডব কথা পরম সাদরে॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেই জন। অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ॥
কাশীদাস মহাশয় আশীর্ব্বাদ দিল। তাঁহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল॥

(বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৪৫৮-৫৯)

সাহিত্যপরিষদের একটি উদ্যোগপর্বের পুথিতে (১২৪২ নং পুথি, ৩ পত্র) এই অংশটি পাওয়া গিয়েছে,

নন্দরাম দাসে বলে শুন শ্যামরায়। আমারে অভয় প্রভু দেহ যম-দায়॥
জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোক কালে। আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে॥

* ডঃ সুকুমার সেন এই চরণটি থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, "মৃত্যুর আগে গঙ্গাতীরে ত্রিবেণীতে যাইবার সময়ে তিনি নন্দরামকে ভারত-পাঁচালী সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।" (বা. সা. ই. ১। অ. সং, পৃঃ ১০৯) কিন্তু 'ত্রিপথগা' মানে 'গঙ্গা'। এখানে ত্রিবেণীর কথা আসে কোথা থেকে?

শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন। ভারত অমৃত তুমি করহ রচন ॥

তাঁর আশীর্ব্বাদে আর ব্রাহ্মণ কৃপাতে। দিনে দিনে আশয় হৈল্য ভারত রচিতে ॥

নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী হইতে সংগৃহীত ১০৮৩ সনের একখানি দামোদরের পদাবলীর উপর লিখিত হইয়াছে যে, ঐ বর্ষে ১৮ই ফাল্গুন কৃষ্ণতৃতীয়ার দিন নন্দরাম দাসের মৃত্যু ঘটে" (বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা, পৃঃ ২১/০)। অতএব এই সূত্রের সাক্ষ্য অনুসারে নন্দরামদাস ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন।

ডঃ সুকুমার সেন 'ভারত-কোষ' গ্রন্থে 'কাশীরাম দাস' সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেছেন, তাতে নন্দরাম দাসকে "নন্দরাম ঘোষ" বলে উল্লেখ করেছেন। নন্দরামের "ঘোষ" পদবীর প্রমাণ তিনি কোথায় পেয়েছেন, তা কিন্তু তিনি উল্লেখ করেন নি। এ ক্ষেত্রে তিনি হয় কিংবদন্তী, না হয় কল্পনার দ্বারা চালিত হয়েছেন বলে মনে হয়।

নন্দরাম দাসের সঙ্গে কাশীরাম দাসের সম্বন্ধ সম্বন্ধে অনেক গবেষকেরই মনে ভুল ধারণা আছে। কেউ কেউ লিখেছেন যে নন্দরাম কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের পুত্র ছিলেন।

কিন্তু নন্দরাম দাসের নিম্নোদ্ধৃত ভনিতা থেকে জানা যায় যে, নন্দরামের পিতার নাম ছিল নারায়ণ,

নারায়ণ-নন্দন সেবিয়া রাধাশ্যাম।
পাণ্ডববিজয় বিরচিল নন্দরাম ॥

(বা. সা. ই. ১।অ, ২য় সং, পৃঃ ২১০)

অতএব নন্দরাম যে কাশীরামের সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পূর্বোল্লিখিত তিনটি পর্ব ছাড়া আর কোন পর্ব নন্দরাম লিখেছিলেন কিনা, তা জানা যায় না। কাশীরাম দাস মৃত্যুকালে নন্দরামকে তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন বলে নন্দরাম যে দাবী করেছেন, তা সত্য কিনা বলা যায় না। নন্দরাম রচিত দ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্বের সঙ্গে কাশীরামের নামে প্রচলিত মহাভারতের ঐ দুই পর্বের মিল থাকলেও নন্দরামের উদ্যোগপর্বের সঙ্গে "কাশীদাসী" মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বের মিল দেখা যায় না (মণীন্দ্রমোহন বসু, বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭-১০৯)। এর থেকে বোঝা যায় পরবর্তী কালের গায়ন ও লিপিকররা কাশীরাম দাসের না-লেখা পর্বগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরণ করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে নন্দরামের রচনার বিশেষ

অধিকার তাঁরা স্বীকার করেন নি। অন্যান্য মহাভারতকাররাও নন্দরামকে কাশীরামের স্থলাভিষিক্ত বলে গ্রহণ করেন নি। শিবরাম ঘোষ উদ্যোগ প্রভৃতি ছ'টি পর্ব রচনা করেছিলেন বলে "জিত" নামে জনৈক কবি জানিয়েছেন। এই "জিত" কাশীরাম দাসের অসম্পূর্ণ বনপর্ব্বের অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ অগস্ত্য উপাখ্যানের পরবর্তী অংশ লিখে পর্বটি সম্পূর্ণ করেন ১৬০৫ শকাব্দ বা ১৬৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কয়াল সংগৃহীত বনপর্বের পুথি থেকে "জিত"র উক্তির কতকাংশ আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। ঐ অংশের ঠিক পরেই আছে,

আরম্ভ অবধি পড়ি দুঃখ লাগে মনে।
চিরদিন চিন্তা ছিল তাহার কারণে ॥
তে কারণে প্রসঙ্গ বনের অন্ত শেষ।
পাচালি প্রবন্ধে কৈল মনের আবেশ ॥
লোকশ্রেষ্ঠ কাশীদাস ছিল পুণ্যবান।
সর্ব্বগুণে শূন্য আমি বিশেষে অজ্ঞান ॥
কাশীদাস বিচার করিয়াছিল পোতা।
আমি মাত্র লোকমুখে শুনি সেই কথা ॥
অজ্ঞান সময় সেই বহুদিন হৈল।
মন্দমতিমান্ মনে কিছু না আছিল ॥
পাচালি রচিনু আমি সেই অনুসারে।
দোষগুণ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ॥
... ...
পঞ্চপুষ্প রস শশি পরিমাণ শক।
পাচালি প্রবন্ধেতে শেষ অরণ্যক ॥ ১৬০৫*

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল লিখেছেন, "লিপিকর কি করিয়া 'পুষ্প' কে শূন্য বলিয়া ধরিলেন জানি না।" আমাদের মনে হয়, লিপিকর নয়, স্বয়ং কবিই 'পুষ্প' শব্দের 'শূন্য' অর্থ করে "১৬০৫" লিখেছেন। কুবেরের আকাশ-রথের নাম 'পুষ্পরথ'; এই জন্য কবি 'পুষ্প'=আকাশ=০ ধরেছেন বলে আমরা মনে করি।

ডঃ সুকুমার সেন অক্ষয়বাবুর সংগৃহীত এই পুথিটি থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি উদ্ধৃত করেছেন (বা. সা. ই. ১। অ, ২য় সং, পৃঃ ১১০)। তিনি ভ্রান্তিবশত "বনপর্বের পুথি"র স্থানে "কর্ণ-পর্বের পুথি" লিখেছেন এবং "১৬০৫" কে "১৬৭৫" পড়ে তার সঙ্গে মিল করার জন্য "পঞ্চ পুষ্প রস শশা"র জায়গায় "পঞ্চ অশ্ব রস শশী" পাঠ ধরেছেন। কিন্তু ১৬৭৫ শকাব্দ বা ১৭৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীরামদাসের বনপর্ব অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে বলে ভাবা যায় না।

অনুক্ষণ কৃষ্ণপদে মজাইয়া চিত।
বিরচিল তনয়শিখর সুত জিত ॥
ভারতে পঙ্কজ পর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অরণ্যক।
আদি সভা বিরাট বন কহিল লিখক ॥
এই চারি পর্ব্ব পুস্তক কাশীদাসি।
উদ্‌যোগ আদি ছয় পর্ব্ব শিবরাম ঘোষি ॥
ঐষীক আদি আট পর্ব্ব চাহিয়া বেড়াই।
তাহার নিমিত্তে সদা ঈশ্বর ধেয়াই ॥

(সা. প. প, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ১, পৃঃ ৯৪৬ দ্রঃ)

কবি "জিত"-এর পিতার নাম শেখর ; কবির সম্পূর্ণ নাম জিত ঘটক ; "কাশীদাসী" মহাভারতের বনপর্বের অনেক পুথিতেই অগস্ত্য উপাখ্যানের পরবর্তী অংশে "শেখরতনয় জিত" এবং "জিত ঘটক" ভনিতা পাওয়া যায়। বিশ্বভারতীর ৯২০ নং পুথিতে বনপর্বের এই অংশ আরম্ভ হয়েছে "এথা হৈতে ঘটক জীতি আরম্ভ" এবং শেষ হয়েছে "ইতি শ্রীমহাভারত ঘটক জিতি বনপর্ব সমাপ্তঃ" উক্তি দিয়ে।

কিন্তু কতকগুলি অর্বাচীন পুথিতে বনপর্বের ঐ অংশে "জিত"-এর বদলে "কাশীর নন্দন"—এই ভনিতা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, গায়ন ও লিপিকররাই এক্ষেত্রে ভনিতা পালটে দিয়েছেন। অজ্ঞাতপরিচয় জিত ঘটকের বদলে স্বয়ং কাশীরাম দাসের পুত্র ঐ অংশ লিখেছিলেন বলে প্রচার করলে ঐ অংশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, এই ধারণায় বশবর্তী হয়েই বোধহয় তাঁরা এ রকম করেছেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল লিখেছেন, "আমার নিকট একটি মুষল পর্বের পুথিতে পূর্ব্বোক্ত শক সহ (পঞ্চ পুষ্প রস শশি) 'সিখরতনয় যুত জিত' ভণিতা আছে।" কিন্তু মুষলপর্বেরই কোন কোন পুথিতে "কাশীর নন্দন"-এর ভনিতা দেখা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর একটি মুষলপর্বের পুথিতে আমরা এই ভনিতাটি পেয়েছি,

কাশীর নন্দন কহে অমৃতের সার।
ইহা রচি পিতা মোর গেলা স্বর্গদ্বার ॥

এ-ক্ষেত্রেও মনে হয়, এই পর্বটি আসলে জিত ঘটকেরই লেখা, পরবর্তীকালে গায়ন ও লিপিকররা "কাশীর নন্দন"-এর ভনিতা বসিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু "কাশীর নন্দন" ভনিতায় গদাপর্ব ও স্বর্গারোহণপর্বের এবং "আশ্চর্যপর্ব" নামে মহাভারত-বহির্ভূত এক পৌরাণিক রচনারও পুথি পাওয়া যায় (মণীন্দ্র বসু, বা. সা. ২, পৃঃ ৯৭-১০২)। এই সমস্ত রচনাও অন্য লোকে লিখেছে, এবং মর্যাদা বাড়াবার জন্য এদের মধ্যে "কাশীর নন্দন" ভনিতা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। কাশীরাম দাসের পুত্র যদি পিতার না-লেখা পর্বগুলি সত্যিই রচনা করতেন, তা হলে পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তা করতেন। কিন্তু জিত ঘটকের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি থেকে দেখা যায় কাশীরামের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরে— ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দেও শেষ দিক্‌কার পর্বগুলি পাওয়া যাচ্ছিল না। ("ঐষীক আদি আট পর্ব্ব খুঁজিয়া বেড়াই। তাহার নিমিত্তে সদা ঈশ্বর ধেয়াই॥")—সম্ভবত এর কারণ এই যে ঐ পর্ব্বগুলি তখনও লেখা হয় নি; লেখা হয়ে থাকলে তখন ওগুলি না পাওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না, বর্তমান কালে যখন পাওয়া যাচ্ছে। কাশীরাম দাসের পুত্র ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ততদিন পর্যন্ত চুপ করে বসে থেকে তার পরে পিতার অসম্পূর্ণ কাজ আংশিকভাবে সম্পূর্ণ করলেন বলে ভাবাও কঠিন।

কাশীরাম দাসের পুত্র যদি সত্যিই পূর্বোক্ত পর্বগুলি রচনা করে থাকেন, তাহলে তিনি ভনিতায় নিজের নাম উল্লেখ না করে শুধু "কাশীর নন্দন" বলে নিজের পরিচয় দিলেন কেন, এ প্রশ্নও ওঠে। অবশ্য ঐ পর্বগুলিতে কয়েক স্থানে "দ্বৈপায়ন দাস" ভনিতা পাওয়া যায়। কিন্তু "দ্বৈপায়ন দাস" মানে ব্যাসের দাস যে কোন মহাভারতকারই এই ভনিতা দিতে পারেন। বিশ্বভারতীর একটি বনপর্বের পুথির* জিত ঘটক রচিত অংশের মধ্যেও কয়েক জায়গায় "দ্বৈপায়ন দাস" ভনিতা পাওয়া যায়। এর থেকে এ-ও মনে করা যায় যে "দ্বৈপায়ন দাস" ভনিতাযুক্ত গদাপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব ও আশ্চর্যপর্বেরও আসল লেখক জিত ঘটকই, পরে তাতে "কাশীর নন্দন" ভনিতা বসেছে।

জয়ন্তদেব বা জয়ন্তিদেব নামে একজন কবির লেখা স্বর্গারোহণপর্বের কয়েকটি পুথি পাওয়া গিয়েছে। এতে "জয়ন্ত রচিল কাশীদাসের নন্দন" ভনিতা পাওয়া যায়। জয়ন্তের নামের সঙ্গে 'দেব' শব্দ (যা কাশীরাম দাসের পদবী) যুক্ত থাকায় অনেকেই মনে করেছেন যে জয়ন্ত সত্যিই কাশীরামের পুত্র। কিন্তু "কাশীর নন্দন" ভনিতাযুক্ত অন্য কোন পর্বের পুথিতেই জয়ন্তের নাম পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আরও একটি মজার ব্যাপার আছে। "দ্বৈপায়ন দাস" ভনিতায় যে স্বর্গারোহণপর্ব পাওয়া যায়, তার সঙ্গে জয়ন্ত রচিত স্বর্গারোহণপর্বের মিল নেই, অথচ দু'টি

* পুথি নং ৯২০। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭ দ্রষ্টব্য।

স্বর্গারোহণপর্বই "কাশীর নন্দন"-এর লেখা। বর্তমান-প্রচলিত "কাশীদাসী" স্বর্গারোহণপর্বের সঙ্গে "দ্বৈপায়ন দাস"-এর স্বর্গারোহণপর্বের মিল আছে, জয়ন্তদেবের মহাভারতের রচনা তার সঙ্গে মেলে না (মণীন্দ্র বসু, বা. সা. ২, পৃঃ ১০২, ১৩৫-১৩৮)। তবে কি কাশীরাম দাসের দু'জন পুত্র ছিলেন এবং তাঁরা দু'টি পৃথক স্বর্গারোহণপর্ব লিখেছিলেন? এই জাতীয় ধারণা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আসলে "কাশীর (বা কাশীদাসের) নন্দন" ভনিতাযুক্ত কোন রচনাই কাশীরাম দাসের পুত্রের লেখা নয়। * কাশীরাম দাসের কোন পুত্র ছিল কিনা সে সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। †

বর্তমান প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতে অনেকের রচনাই মিশে আছে। ডঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন লিখেছেন, "১৫৮৩ খৃ. অব্দের (!) লিখিত একখানি কাশীদাসী মহাভারতের শল্য ও নারীপর্বে ভৃগুরাম দাসের ভনিতা পাওয়া গিয়াছে। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃঃ ৫৬০) দীনেশবাবু দেখিয়েছেন যে, বর্তমান প্রচলিত "কাশীদাসী" মহাভারতের আদিপর্ব, ভীষ্মপর্ব ও অশ্বমেধপর্বে কীভাবে যথাক্রমে সঞ্জয়, কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর রচনা এসে প্রবেশ করেছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃঃ ৪৬১-৪৬৬)। তিনি আরও লিখেছেন, "অপরাপর কবিগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার সঙ্গেই কাশীদাসী মহাভারতের অধিকতর সাদৃশ্য এবং সেই সাদৃশ্য যুদ্ধপর্ব্ব এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা বহু অংশেই কিছুমাত্র মার্জ্জন, পরিবর্ত্তন বা সংশোধন না করিয়া কাশীদাসী মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।" "কাশীদাসী" মহাভারতের স্ত্রীপর্ব আসলে নিত্যানন্দের মহাভারত থেকেই ভনিতা পালটে নেওয়া। ঠিক তেমনি "কাশীদাসী" মহাভারতের শান্তিপর্ব কৃষ্ণানন্দ বসুর লেখা শান্তিপর্বের ভনিতা পালটানো রূপ। "কাশীদাসী" মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের সঙ্গে যে দ্বিজ রঘুনাথ

---

* ডঃ সুকুমার সেন জনৈক কাশীরাম বসুর পুত্র রমাকান্তের লেখা একটি উদ্যোগ-পর্বের পুথি পেয়ে "কাশীরামদাসের এই পুত্রসমস্যার সমাধান" হয়েছে বলে মনে করেছেন (বা. সা. ই. ১। অ, ২য় সং, পৃঃ ১১১-১১২)। কিন্তু "কাশীর নন্দন' ভনিতায় বিভিন্ন পর্বের আর যত পুথি পাওয়া গিয়েছে,—কোনটিতেই রমাকান্তের নাম পাওয়া যায় নি। অতএব সেগুলি রমাকান্তের লেখা বলে মেনে নেওয়া যায় না। মনে হয় ঐ পর্বগুলি রচিত হবার পরে মন্দকবিযশঃপ্রার্থী রমাকান্ত মহাভারত রচনার আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং অমর কবি কাশীরাম দাসের প্রাপ্য যশ নিজের পিতাকে দেবার অপচেষ্টা করেছিলেন।

† রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে কাশীরামের পুত্রের এক দানপত্রের উল্লেখ করেছিলেন; কিন্তু তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, দানপত্রটি জীর্ণ ও তার পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য। এতে কাশীরামের পুত্রের নাম ছিল না বোধ হয়, রামগতি পরে এই পুত্রের নাম জানতে পারেন—"নন্দরাম দাস"! অতএব এর থেকে কাশীরামের পুত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

রচিত অশ্বমেধপর্বের (রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ) "কোন কোন স্থলে সুন্দর মিল আছে", তা শেষোক্ত গ্রন্থের আবিষ্কর্তা রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছিলেন (সা. প. প. ১৩০৫, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৪১ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং "কাশীদাসী" মহাভারতের যে অংশ কাশীরাম দাস লিখেছিলেন, তার পরবর্তী অংশগুলি কিভাবে রচিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমরা এখন পরিষ্কার ধারণা করতে পারি। কাশীরামের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম এবং শিবরাম ঘোষ, জিত ঘটক প্রভৃতি কবিরা অবশিষ্ট অংশের কয়েকটি করে পর্ব (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন পর্বের অংশবিশেষ) রচনা করেন, এই সব কবিরা পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এবং দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে কাশীরামের মহাভারত সম্পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হন নি এবং এঁদের সবলে একই সময়ের লোকও নন। দুই একটি ক্ষেত্রে একই পর্ব একাধিক কবি রচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে গায়ন ও লিপিকররা তাদের রুচি ও জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে এই সব কবির রচনা থেকে এবং কাশীরামের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্যান্য কবিদের রচনা থেকে অংশ নির্বাচন করে তাদের ভনিতা বদলে কাশীরাম দাসের ভনিতা বসিয়ে দেয় এবং তা কাশীরাম দাসের মূল রচনার সঙ্গে যোগ করে অষ্টাদশ পর্ব "কাশীদাসী মহাভারত" দাঁড় করায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কাশীদাসী মহাভারত ছেপে বার হওয়ার কয়েক দশক আগেই এই মহাভারত বর্তমান রূপ লাভ করেছিল বলে আমরা অনুমান করতে পারি।

ইসলামী কাব্যের তিন কবি

সৈয়দ সুলতান

সৈয়দ সুলতান দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—'নবীবংশ' ও 'জ্ঞানপ্রদীপ'; তিনি 'রসুল-চরিত', 'শবেমেরাজ', 'ওফাৎ-ই-রসুল', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইব্লিস-নামা' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন, কিন্তু ঐ তথাকথিত গ্রন্থগুলি আসলে বিরাটকলেবর গ্রন্থ 'নবীবংশ'রই অংশ (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১১)। এছাড়া সৈয়দ সুলতান কিছু অধ্যাত্ম-সঙ্গীত ও পদাবলী-ও রচনা করেছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের আবির্ভাবকাল মোটেই বিতর্কের বিষয় নয়। তাঁর শিষ্য মোহাম্মদ খান ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 'মক্তুল হোসেন' কাব্য রচনা করেন (পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থে সৈয়দ সুলতানের নাম আছে, তাঁর 'নবীবংশ' রচনা করারও উল্লেখ আছে,

নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান।
আদ্যের উৎপন্ন যত কহিলা বাখান॥

সুতরাং ১৬৪৬ খ্রীঃ র কিছু আগে সৈয়দ সুলতান 'নবীবংশ' রচনা করেন।

কিন্তু 'নবীবংশ' র উপক্রম 'শবেমেরাজ'-এ* একটি কালবাচক শ্লোক পাওয়া যায় সেটি এই,

গ্রহ সত রস জোগে অব্দ গোঙাইল॥
দেশী ভাসে এই কথা কেহ না কহিল। †
(সা. প. প., ১৩৪১, পৃঃ ৪০, পাদটীকা)

গবেষকরা এর থেকে নানা সাল পেয়েছেন। ডঃ এনামুল হক "গ্রহ শত রস যোগে" =৯০০+৬=৯০৬ হিজরা (=১৫০০-০১ খ্রীঃ) পেয়েছেন। কিন্তু তা'হলে সৈয়দ সুলতানের সঙ্গে তাঁর শিষ্য মোহাম্মদ খানের সময়-ব্যবধান হয় ১৪৫ বছর, যা অসম্ভব। অন্যান্য গবেষকেরা 'জোগে' কে 'যুগে' ধরেছেন। তা ধরে ডঃ আহমদ শরীফ ৯৯২ বা

---

* ডঃ আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন যে 'শবেমেরাজ' 'নবীবংশে'র উপক্রম (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১১)।

† যে পুথিতে এই শ্লোকটি পাওয়া গিয়েছিল, সেটি নিখোঁজ। শ্লোকটির পাঠোদ্ধার ঠিকমত করা হয়েছে ধরে নিয়ে (এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় থাকলেও) এ সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

৯৯৪ হিজরা পেয়েছেন (গ্রহ=৯, রস=৯, যুগ=২ বা ৪)। কিন্তু 'রস' শব্দ ৯ অর্থে ব্যবহারের সন্দেহাতীত নিদর্শন আজ পর্যন্ত একটিও পাওয়া যায় নি বলে এই ব্যাখ্যা গ্রহণে অসুবিধা আছে। 'রস' কে ৬ ধরলে ৯৬২ বা ৯৬৪ হিজরা হয়, তা 'মক্তুল হোসেনে'র রচনাকালের ৯১ বা ৮৯ বছর পূর্ববর্তী। ডঃ সুকুমার সেন 'গ্রহ শত' র জায়গায় 'দশ শত' পাঠ কল্পনা করে ১০৬২ বা ১০৬৪ হিজরা (১৬৫১-৫২ বা ১৬৫৩-৫৪ খ্রীঃ) পেয়েছেন। তা'হলে 'নবীবংশ' র রচনাকাল 'মক্তুল হোসেন'-এর রচনাকালের পরবর্তী হয়ে পড়ে।

আসলে 'শবেমেরাজ'-এ উল্লিখিত "গ্রহ সত রস জোগে" র অর্থ ৯০৬ ই। 'জোগে' অর্থাৎ 'যোগে' কে 'যুগে' ধরবার কোন কারণ নেই। কবি এখানে ৯০৬ হিজরায় তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ হল বলছেন না—বলছেন যে, ৯০৬ অব্দ অর্থাৎ বছর কেটে গেল, তবু দেশী ভাষায় রসুলের "কথা কেহ না কহিল"। সৈয়দ সুলতান একটি পুরোনো আরবী গ্রন্থ অবলম্বনে 'নবীবংশ' রচনা করেন। সেই আরবী গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পরে ৯০৬ বছর কেটে গেল—এই বলা বলাই সৈয়দ সুলতানের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়, অন্যথা তিনি দেশী ভাষায় ৯০৬ বছর ধরে রসুলের কথা রচিত না হওয়ার কথা বলতেন না। আমাদের এই ধারণার সমর্থন পাই আলাওলের 'তোহ্ফা' র রচনাকালবাচক শ্লোক থেকে; আলাওল সৈয়দ সুলতানের মত ভাষাতেই বলেছেন যে, ইউসুফ গদার আরবী গ্রন্থ 'তোহ্ফা' রচনার পরে ২৭৮ বছর কেটে গেল, আলিমরা (অর্থাৎ বিদ্বানেরা—যাঁরা স্বভাবতই আরবী ভাষায় পণ্ডিত) তার মর্ম পেলেন, আমরা পেলাম না,—

দুইশত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল॥

(বর্তমান গ্রন্থের 'আলাওল' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

অতএব "গ্রহ শত রস যোগে অব্দ গোঙাইল" চরণটি থেকে সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' কাব্যের রচনাকাল পাওয়া যাবে না, 'নবীবংশ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বছর আগে রচিত হয়েছিল—এর বেশি কিছু বলবার কোন উপায় বর্তমানে নেই।

সৈয়দ সুলতান লিখেছেন যে তাঁর নিবাস ছিল পরাগলপুরে। এই পরাগলপুর চট্টগ্রামের চক্রশালা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সৈয়দ সুলতানের দেশ যে চক্রশালায় ছিল, এ কথা বহু লেখক লিখেছেন (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১২)। সৈয়দ সুলতানের গ্রাম পরাগলপুরের নামকরণ যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক পরাগল

খানের নাম অনুসারে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সৈয়দ সুলতান 'শবে মেরাজ'-এ পরাগল ও কবীন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

মোহাম্মদ খান

মোহাম্মদ খান দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—'সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ' বা 'যুগ-সংবাদ' এবং 'মক্তুল হোসেন'। শেষোক্ত গ্রন্থে ইমাম হোসেনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং রচনাসৌকর্যের দিক দিয়ে এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

'মক্তুল হোসেন'-এ কবি তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃকুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মাতৃকুল প্রধানত পীরের বংশ, পিতৃকুলের অনেকে চট্টগ্রামের শাসন-কর্তা বা স্বাধীনকল্প শাসকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবির দুই কুলের পরিচিতি থেকে বাংলার, বিশেষত চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।*

মোহাম্মদ খানের পিতার নাম মুবারিজ খান, পিতামহ ও প্রপিতামহ যথাক্রমে জালাল খান ও নসরৎ খান। এই নসরৎ খান চট্টগ্রামের শাসক ("চাটিগ্রাম পতি") ছিলেন। মোহাম্মদ খানের মাতামহ ছিলেন শাহ আহমদ এবং প্রমাতামহ ছিলেন বিখ্যাত পীর শাহ আবদুল ওহাব, যিনি "সদর জাঁহা" এবং "শাহ ভিখারী" নামেও পরিচিত ছিলেন; তিনি পূর্বোক্ত নসরৎ খানের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং মোহাম্মদ খানের পিতা তাঁর পিসতুতো ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন।

মোহাম্মদ খান তাঁর 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ'-এর রচনাকাল এইভাবে নির্দেশ করেছেন :—

দশ শত বাণ শত বাণ দশ দধি।
সমাপ্তি হইয়া গেল পঞ্চালিকা অবধি॥

এর থেকে কোন রকম কষ্টকল্পনা না করে ১০০০+৫০০+৫০+৭=১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৬৩৫-৩৬ খ্রীঃ পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন প্রশ্ন তুলেছেন " 'দধি' কি 'উদধি'?" তিনি মোহাম্মদ খানের গুরু-বন্দনা বা পীর-বন্দনা পড়ে দেখেন নি। দেখলে প্রমাণ পেতেন যে মোহাম্মদ খান 'উদধি' অর্থেই 'দধি' শব্দ প্রয়োগ করেছেন; ঐ পীর-বন্দনায় মোহাম্মদ খান সৈয়দ সুলতান সম্বন্ধে বলেছেন,

ইমাম হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ নবরস দধি॥

(সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১৫)

*'সাহিত্য পত্রিকা'র তিনটি সংখ্যায় (বর্ষা ১৩৬৬, শীত ১৩৬৯ ও বর্ষা ১৩৭১) এবং আমার লেখা 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' বইয়ের (২য় সং) নবম অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে।

'মক্তুল হোসেন'-এর রচনাকাল ১০৫৬ হিজরা। এই রচনাকাল কবি এইভাবে জানিয়েছেন,

মুসলমানি তারিখের দশ শত ভেল।
শতের অর্ধেক পাছে ঋতু রহি গেল ॥

এখানে পূর্বাচার্যেরা 'ঋতু বহি গেল' পাঠ ধরেছেন। কিন্তু 'ঋতু বয়ে গেল'—এই জাতীয় প্রয়োগ বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় না। পুরোনো বাংলা পুথিতে 'ব' ও 'র'র মধ্যে সাধারণত পার্থক্য রক্ষিত হত না। সুতরাং এক্ষেত্রে 'বহি'র জায়গায় 'রহি' পাঠ ধরা উচিত।

১০৫৬ হিজরা ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সুরু হয়। ঐ সময়ে ১৫৬৭ শকাব্দ ছিল—১৬৪৬ খ্রীঃর ৩০শে মার্চ থেকে ১৫৬৮ শকাব্দ সুরু হয়। মোহাম্মদ খান শকাব্দের উল্লেখও করেছেন,

বাণ বাহু শত অব্দ* আর বাণ শত ॥
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া দধি।
পঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি ॥

"বাণ বাহু শত অব্দ" অর্থাৎ ৫ × ২ = ১০ শত আর, "বাণ (৫) শত অর্থাৎ ১৫০০। এর সঙ্গে "বিংশ তিন পূর্ণ" = ৬০ + ('দধি' =) ৭ অর্থাৎ ৬৭। অতএব ১৫৬৭ শকাব্দ পাওয়া গেল। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, 'মক্তুল হোসেন' ১৬৪৬ খ্রীঃর ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৯শে মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। 'মক্তুল হোসেন' যে ১৫৬৭ শকাব্দের ৭ই চৈত্র অর্থাৎ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছিল, তা জানা যায় পূর্বোদ্ধৃত চরণ তিনটির পরবর্তী চরণগুলি থেকে,

সুরগুরু শেষ দৈত্যগুরু (পাঠ—নিদস্থ গুরু) আগে।
মিত্র এই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে ॥
হইয়া নক্ষত্ররূপ উড়ি গেল শশী।
দশ দিকে প্রসন্ন পাতকী তম নাশি ॥
মাধ্বীমাসের সপ্ত দিবস গইল।
সেই রাত্রি পঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল ॥

(সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১৮ দ্রষ্টব্য। সেখানে "মাধ্বী মাস" কে ভুল করে "মাধবী মাস" পড়া হয়েছে। "মাধ্বী মাস" মানে মধুমাস অর্থাৎ চৈত্র মাস। ১৫৬৭ শকাব্দের ৭ই চৈত্র তারিখে "সুরগুরু" অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ছিল।)

* পুথিতে "বাহু সম অর্ধ" পাঠ মেলে।

জৈনুদ্দীন

জৈনুদ্দীন নামে জনৈক কবি হজরৎ মুহম্মদের জীবনী অবলম্বনে 'রসুলবিজয়' নামে একটি কাব্য লিখেছিলেন। কাব্যটি ডঃ আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'সাহিত্য পত্রিকা'র সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই কাব্যের ভনিতায় কবি জনৈক রাজা "ইছুপ খান" বা "য়ুসুফ খান"-এর উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন,

দানে ধর্মে হরিচন্দ্র মান্যগুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছুপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলুঁ পাঞ্চালি সন্ধান ॥

কেউ কেউ মনে করেন এই য়ুসুফ খান গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ (১৪৭৪—৮০খ্রীঃ)। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের (শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের পিতা) পৃষ্ঠপোষণধন্য গ্রন্থকার ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর শব্দকোষগ্রন্থ 'শরফ্‌নামা'য় "মালেকুশ শোয়ারা" (রাজকবি) বলে অভিহিত এক আমীর জৈনুদ্দীন হারাওয়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত গবেষকরা মনে করেন 'রসুলবিজয়'-রচয়িতা জৈনুদ্দীন ও আমীর জৈনুদ্দীন হারাওয়ী অভিন্ন লোক। কিন্তু এই মত সত্য হতে পারে না। কারণ "মালেকুশ শোয়ারা" জৈনুদ্দীনের "হারাওয়ী" বিশেষণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি পারস্যের হীরাটের লোক। পক্ষান্তরে 'রসুলবিজয়' খাঁটি বাঙালী কবির লেখা এবং এই কাব্যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। 'রসুলবিজয়' কাব্যের ভাষা বিচার করেও বলা যেতে পারে যে, এই কাব্য পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা হতে পারে না।

শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমীনের মতে 'রসুলবিজয়' ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের রচনা এবং কবির পৃষ্ঠপোষক 'ইছপ খান' গৌড়েশ্বর তাজ খান কররানীর পুত্র য়ুসুফ খান (মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৭১, পৃঃ ৭১০ দ্রঃ)।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সৈয়দ সুলতান তাঁর 'শবে মেরাজ'-এ লিখেছেন যে তখনও পর্যন্ত (বাংলার মুসলমানদের মধ্যে) "খোদা রসুলের কথা কেহ না সঙরে" এবং "দেশী ভাসে এই কথা (অর্থাৎ খোদা রসুলের কথা) কেহ না কহিল"। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সৈয়দ সুলতানের আগে জৈনুদ্দীন বা আর কেউ—রসুল হজরৎ মুহম্মদের জীবনচরিত অবলম্বনে কোন কাব্য রচনা করেন নি। সুতরাং জৈনুদ্দীন সৈয়দ সুলতানের পরবর্তী কবি।

॥ আটাশ ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অধিকাংশ পুঁথির শেষে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেহহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

সিন্ধু=৭, অগ্নি=৩, বাণ=৫, ইন্দু=১ ধরে প্রায় সকলে ১৫৩৭ শকাব্দই চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল বলে মনে করেন। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে 'সিন্ধু' শব্দের অর্থ ৪। সংস্কৃত সাহিত্যে ৪ অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হত। অতএব 'শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ'র অর্থ ১৫৩৪ শকাব্দও হতেপারে। ১৫৩৭ শকে সৌর মত ও গৌণচান্দ্র মত অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি রবিবারে পড়েছিল আর ১৫৩৪ শকে মুখ্য চান্দ্র মত অনুযায়ী ঐ তিথি রবিবারে পড়েছিল। অতএব 'চৈতন্যচরিতামৃত' ৭ই জুন, ১৬১২ বা ৭ই মে, ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়েছিল। আমরা পরে দেখাব যে, এর মধ্যে প্রথম তারিখটিই গ্রহণযোগ্য।

'প্রেমবিলাসে'র ২৪শ বিলাসে উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটির একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়। তাতে 'সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ'র জায়গায় 'অগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ' (১৫০৩) লেখা আছে। কিন্তু এই পাঠান্তরের কোন মূল্য নেই। কারণ প্রথমত, এই ২৪শ বিলাস জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৫০৩ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি রবিবারে পড়েনি। তৃতীয়ত, তখনও জীব গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' সম্পূর্ণ হয়নি। 'গোপালচম্পূ'র পূর্বভাগ ১৫১০ শক বা ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং উত্তরভাগ ১৫১৪ শক বা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' 'গোপালচম্পূ'র উল্লেখ আছে।

অবশ্য কয়েকটি যুক্তি থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় 'চৈতন্যচরিতামৃত' ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়েছিল। সেগুলি এই :—

(১) প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের মতে শ্রীনিবাস আচার্য যখন বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণবগ্রন্থ নিয়ে বাংলায় আসেন (আঃ ১৫৬৬ খ্রীঃ) তখন 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও এনেছিলেন. বীর হাম্বীরের লোকেরা তা লুঠ করে এবং এই খবর শুনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রাণত্যাগ করেন।

(২) পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি গ্রন্থের মতে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার সময় রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামী জীবিত ছিলেন। এঁরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক বা তার আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এ দের জীবিত থাকা অসম্ভব।

(৩) 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কৃষ্ণদাসের ভাষা থেকে মনে হয়, তিনি 'চৈতন্যভাগবত'-কার বৃন্দাবনদাস ও ভূগর্ভ গোস্বামীর আদেশ পেয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস অতদিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না এবং ভূগর্ভ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগমন করেছিলেন। এছাড়া কৃষ্ণদাস গদাধর পণ্ডিতেরশিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্তী ও রূপগোস্বামীর সঙ্গী যাদবাচার্য গোস্বামীর আজ্ঞা পেয়েছিলেন। এঁদেরও অতদিন বাঁচা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

(৪) 'চৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীনিবাস আচার্যের কোন উল্লেখ নেই। অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শ্রীনিবাসের প্রভাব ও খ্যাতি চরমে পেঁাছেছিল।

প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে বলা যায়, 'প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দে'র আলোচ্য উক্তি যে সর্বৈব মিথ্যা, তা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করেছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ৩২৩-৩২৬)। 'ভক্তিরত্নাকরে' এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই,* বরং এর বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে (ঐ, পৃঃ ৩২৪-৩২৫)।

দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা যায়, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামী যদি ঐ সময়ে জীবিত থাকতেন, তাহলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করার আগে কৃষ্ণদাস তাঁদের আজ্ঞা নিতেন। তিনি তাঁর আজ্ঞাদানকারীদের নামের যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে ছয় গোস্বামীর কারও উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, তাঁরা তার আগেই পরলোকগমন করেছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র "সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার" উক্তি থেকে বোঝায় না, রঘুনাথ দাস ঐ সময় জীবিত ছিলেন। গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্যের লোক, সুতরাং তিনি 'চরিতামৃত' রচনার সময় জীবিত থাকলে 'চরিতামৃতে' মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ বর্ণনায় স্থান নির্দেশে অত গোলযোগ ঘটত বলে মনে হয় না। বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত পাতড়ার (এই বইএর ৫৯ পৃষ্ঠায় 'রূপ-সনাতন' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) মতে জীব গোস্বামী ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস ১৬১০ খ্রীঃর পরেও চরিতামৃত রচনা সুরু করতে পারেন।

* ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে ভ্রমবশত লিখেছেন যে 'ভক্তিরত্নাকরে' এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। আমরা 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' বইয়ে (পৃঃ ৩২৬) তাঁর ভুলের কথা সুস্পষ্টভাবে বলি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডঃ সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ঐ ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন (বা সা ই, ১। পৃ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৫৪)।

তৃতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা চলে, কৃষ্ণদাস কয়েক জায়গায় বৃন্দাবনদাসের আজ্ঞার উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু এ আজ্ঞা সাক্ষাৎ আজ্ঞা নয়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান। তাঁর আজ্ঞা লয়ে লিখি যাহাতে কল্যাণ॥" ধ্যানযোগে আজ্ঞা নিতে বৃন্দাবন দাসের জীবিত থাকার দরকার হয় না। ভূগর্ভও কৃষ্ণদাসকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। "পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি। গৌরকথা বিনা যাঁর মুখে অন্য নাই॥" লিখেই কৃষ্ণদাস ভূগর্ভের শিষ্য চৈতন্যদাসের আজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যদাসের গুরু হিসাবেই এখানে ভূগর্ভের উল্লেখ বলে মনে হয়। এই উল্লেখে কৃষ্ণদাস বর্তমানকালের ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না, কারণ তিনি চৈতন্য-পরিকরদের নিত্যত্বে বিশ্বাস করতেন। শিবানন্দ চক্রবর্তী ও যাদবাচার্য গোসাঞি সম্ভবত অত্যন্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন।

চতুর্থ যুক্তি সম্বন্ধে বলা চলে, শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। চৈতন্যদেবের তিরোধানের অনেক পরে তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেতা হয়েছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যদেবেরই জীবনকাহিনী, চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কথাও তার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। চৈতন্য-পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস বর্ণনা তার লক্ষ্য ছিল না। এই কারণে শ্রীনিবাস আচার্য তার মধ্যে উল্লিখিত হন নি। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের শিষ্যদের নামের তালিকা দিয়েছেন, কিন্তু শ্রীনিবাস ছিলেন গোপাল ভট্টের শিষ্য। এজন্যেও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তাঁর উল্লেখ নেই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'গোপালচম্পূ'র উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া তিনি স্মার্ত রঘুনন্দনের 'একাদশীতত্ত্ব' ও 'উদ্বাহতত্ত্ব' থেকেও শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন (চৈ. চ. ১।১৫।৩ শ্লোক ও ১।২।১৪ শ্লোক)। ঐ দুই বই সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের আগে সুদূর বৃন্দাবনে এই অবৈষ্ণব গ্রন্থকারের গ্রন্থ এত উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এই সব বিষয় বিচার করলে ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দকেই 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাসমাপ্তিকাল বলে নির্দেশ করা যায়।

এখন কৃষ্ণদাসের জীবৎকাল সম্বন্ধে অন্যান্য যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করার সামঞ্জস্য থাকে কিনা দেখা যাক্। প্রথমে বয়সের প্রশ্ন বিবেচনা করা যাক্। 'চরিতামৃতে'র আদি লীলার ৫ম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস বলেছেন যে, তাঁর ভাইয়ের শ্রীচৈতন্যের উপর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের

উপর ছিল না। কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুরে। তাঁর বাড়ীতে এক দিন অহোরাত্র সংকীর্তন হয়েছিল। সেইদিন তাঁর ভাই নিত্যানন্দের শিষ্য মীনকেতন-রামদাসের সঙ্গে তর্ক করেন। কৃষ্ণদাস তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভাইকে ভৎর্সনা করেন এবং রামদাসের কোপে তাঁর "ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥" (সম্ভবত তাঁর ভ্রাতা আকস্মিকভাবে মারা যান।) ঐ রাত্রেই কৃষ্ণদাস স্বপ্নে নিত্যানন্দের দেখা পান এবং তাঁর আদেশেই তিনি বৃন্দাবনে চলে আসেন। বৃন্দাবনে এসে তিনি রূপ, সনাতন এবং অন্যান্য গোস্বামীদের সান্নিধ্য লাভ করেন। সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর রচনাকাল ১৪৭৬ শক = ১৫৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। তার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। রূপ গোস্বামী সনাতনের মৃত্যুর পরে মারা যান। যাহোক্, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ২৪।২৫ বছরের মত বয়সে বৃন্দাবনে এসেছিলেন ধরলে কোন দিক্ দিয়ে কোন অসঙ্গতি হয় না। তিনি শ্রীচৈতন্যের দর্শন পেয়েছিলেন বলে ঘুণাক্ষরেও জানান নি। তার কারণ এই মনে হয়, তাঁর শৈশব বা বাল্যেই শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু হয়েছিল। ২৪।২৫ বছর বয়সে কৃষ্ণদাসের পক্ষে বাড়িতে অহোরাত্র সঙ্কীতন দেওয়া, ভাইয়ের সঙ্গে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের মহিমা নিয়ে বিতর্ক ও গৃহত্যাগ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, ঐ বয়সে চৈতন্যদেব কি করেছিলেন তা মনে রাখলেই এ কথা বোঝা যাবে।

১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম ধরলে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তাঁর বয়স ৮৫ বছরের উপর হয়। ঐ বয়সে এরকম একখানি উচ্চাঙ্গের বই লেখা সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললে বলব, প্রতিভাবান্ লোকের পক্ষে এ কাজ করা সম্পূর্ণ সম্ভব। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অনেক বই ৮০ বছর পার হবার পরে লেখা। বিশেষ করে কৃষ্ণদাস নিজেই যখন বলেছেন গ্রন্থরচনার সময় তিনি 'জরাতুর', তখন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। এই জরার জন্যেই চৈতন্যদেবের মধ্যলীলার মাঝখানে তিনি খাপছাড়া ভাবে অন্ত্যলীলার সূত্রগুলি বর্ণনা করেছেন এবং অন্ত্যলীলার উপক্রমে সে কথার উল্লেখ করে এই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন,

* ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির'—কৃষ্ণদাসের এই উক্তি সত্ত্বেও চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ পরিচ্ছেদে পর্যন্ত যে অবধানের ও মনস্বিতার পরিচয় আছে তাহা সত্তর পঁচাত্তর বছরের লোকের লেখা বলিতে কুণ্ঠা হয়।" (বা. সা. ই. ১। পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৪২) ডঃ সুকুমার সেনের বদ্ধমূল সংস্কার এই যে, 'চৈতন্যচরিতামৃত' বৃদ্ধের রচনা হতে পারে না। এই সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি কারও কথা শুনবেন না, স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথাও না।

আমি জরাতুর—নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্য লীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন॥

সুতরাং কবির বয়স ঐ সময় ৮০ বছরের বেশি ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কবির অতিবার্ধক্যের জন্যই সম্ভবত তাঁর কাব্যের স্থানে স্থানে ছন্দপতন দেখা যায়।

১৬১২ ও ১৬১৫—এই দু'টি তারিখের মধ্যে ১৬১২ কেই যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাকাল হিসাবে গ্রহণ করা উচিত, তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থেকে বোঝা যাবে।

(ক) 'শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ' ইত্যাদি শ্লোকটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত সাহিত্যে 'সিন্ধু' ও তার সমার্থবাচক শব্দগুলিকে সুপ্রাচীন কাল থেকে 'চার' অর্থেই প্রয়োগ করা হয়ে এসেছে। 'সাত' অর্থে 'সিন্ধু'র প্রয়োগ নিতান্তই অর্বাচীন রীতি এবং বিশেষভাবে বাংলা দেশেই তার প্রচলন দেখা যায়। অতএব বৃন্দাবনে বসে সংস্কৃত ভাষায় এই শ্লোকটি রচনা করার সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চার' অর্থেই 'সিন্ধু' শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে ধরা উচিত। সুতরাং "শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ" = ১৫৩৪ শকাব্দ = ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ।

(খ) "শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ" = ১৫৩৭ শকাব্দ ধরলে বলতে হয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এখানে সৌর মত বা গৌণ চান্দ্র মত অনুযায়ী তিথি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুখ্য চান্দ্র মত অনুযায়ীই সাধারণত হিন্দুরা তিথি উল্লেখ করে থাকে। মুখ্য চান্দ্র মত অনুযায়ী ১৫৩৪ শকাব্দ বা ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দেই জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি রবিবারে পড়েছিল।

(গ) 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধে ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে পাটনার গৌরাঙ্গ মঠের একটি 'চৈতন্যচরিতামৃত'র পুথিতে লিপিকাল ১০২০ সাল (১৬১৩ খ্রীঃ) বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং পুথিটিতে লেখা আছে "শ্রীরাধারমণজি শ্রীগোপালভট্টজি ভৃত্য বংশিদাসকি অয়ং গ্রন্থঃ।" পরলোকগত ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার পাটনাতেই থাকতেন। তাঁকে আমি এই পুথিটি সম্বন্ধে খোঁজ নিতে অনুরোধ করেছিলাম। ডঃ মজুমদার আমার অনুরোধ রক্ষা করেন এবং পাটনার গাইঘাটে অবস্থিত গৌরাঙ্গ মঠে গিয়ে পুথিটি দেখে ১।৩।৬০ তারিখের এক চিঠিতে আমায় লেখেন, "পুঁথির শেষে তাং ৭ আশ্বিন ॥ ১০২০ ॥ লেখা আছে; উহাতে 1613 A. D. হয় বটে, কিন্তু হাতের লেখা ও কাগজ মোটেই অত প্রাচীন নহে। আমার মনে হয় ১০২০ মল্লাব্দ; সাহিত্য পরিষদের অনেক পুথিতে মল্লাব্দের year দেওয়া আছে। তাহা হইলে 1020 + 694 = 1714 A. D. হয়। অবশ্য কাগজ ও লেখা ও তারিখের পক্ষেও fresh।"

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর এক প্রবন্ধেও এই পুথিটি সম্বন্ধে লিখেছেন, "উহার

কাগজ বা হাতের লেখা দেখিয়া মনে হয় না যে উহা প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন। সালটি মল্লাব্দ হইতে পারে।...৩৫০ বৎসরের প্রাচীন কাগজের চেহারা ঐ পুথিতে দেখা যায় না।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ২, পৃঃ ১২২, পাদটীকা)।

ডঃ মজুমদারের এই অভিমত প্রকাশের পরে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আলোচ্য পুথিটি ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত হয়েছিল বলে মনে করা চলে না। ডঃ মজুমদার "১০২০ সাল" কে "মল্লাব্দ" বলে গ্রহণ করতে চান; কিন্তু পুথিটি যে ১০২০ মল্লাব্দ বা ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে লিখিত হওয়াই সম্ভব, আমাকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশের সর্বশেষ বাক্যে সে কথাও আছে। আমাদের মনে হয়, পুথিটি ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দেরও পরে লিখিত, কিন্তু তাতে উল্লিখিত "১০২০ সাল" বঙ্গাব্দই, মল্লাব্দ নয়। পুথির "স্বত্বাধিকারী" হিসাবে গোপালভট্টের ভৃত্য বংশীদাসের উল্লেখ থাকার জন্য আমরা এইরকম ধারণা করছি। আসলে "১০২০ সাল" এই পুথিটির লিপিকাল নয়—এর আদর্শ পুথির লিপিকাল। ১০২০ বঙ্গাব্দ বা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে যদি 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র একটি পুথি লেখা হয়ে থাকে, তাহলে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ এই গ্রন্থের রচনাকাল হতে পারে না। এ দিক দিয়েও ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দকে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাসমাপ্তিকাল বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হয়।

অতএব 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচনা ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে তিনি নিজে 'চৈতন্যচরিতামৃত' আদি লীলা ৫ম পরিচ্ছেদে যা লিখেছেন (আগে দ্রষ্টব্য), তার অতিরিক্ত আর কিছুই তাঁর সম্বন্ধে প্রামাণিকভাবে জানা যায় না। রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট—এই ছ' জন গোস্বামী কৃষ্ণদাসের শিক্ষাগুরু ছিলেন। কৃষ্ণদাস এঁদের একসঙ্গে নাম উল্লেখ করেছেন বলেই এঁদের "ষট্ গোস্বামী" বলা হয়। কৃষ্ণদাস তাঁর দীক্ষাগুরুর নাম করেন নি, শুধুমাত্র "শ্রীগুরুঃ" বলে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ রঘুনাথ ভট্টকে, কেউ রঘুনাথ দাসকে, আবার কেউ নিত্যানন্দকে কৃষ্ণদাসের দীক্ষাগুরু বলেছেন; এঁদের সিদ্ধান্ত যে সব সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি আদৌ প্রামাণিক নয়। প্রবাদ অনুসারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের আত্মবিবরণ থেকে দু'টি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

প্রথমত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দেখার বিবরণ দেবার সময়ে

নিত্যানন্দের চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে—তিনি নিত্যানন্দকে ইতিপূর্বে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন ; ঐ বর্ণনা আমরা নীচে উদ্ধৃত করলাম,

শ্যাম-চিকণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর॥
সুবলিত হস্ত পদ কমল লোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়ান॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ সম দন্ত তাম্বূল-চর্ব্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে॥
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যদি নিত্যানন্দকে কেবলমাত্র একবার স্বপ্নে দেখতেন, তা হলে নিত্যানন্দের চেহারার এত বিশদ বর্ণনা দিতে পারতেন না। স্বপ্নে আমরা কোন লোককে এত অল্পক্ষণের জন্য দেখি যে, শুধুমাত্র সেই দেখার উপর নির্ভর করে তার চেহারার বিবরণ দেওয়া যায় না। অবশ্য এরকম কথা বলা যেতে পারে যে কৃষ্ণদাস প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে নিত্যানন্দের চেহারার বিশদ বর্ণনা শুনেছিলেন, স্বপ্নের বিবরণ দেবার সময়ে তিনি সেই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন ; কিন্তু তা হলে তিনি নিত্যানন্দের চেহারার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলির এত পরিপাটি বিবরণ দিতে পারতেন না। সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দকে সশরীরে দর্শন করেছিলেন—এই সিদ্ধান্ত না করে উপায় নেই। নিত্যানন্দকে চোখে দেখার সময়ে কৃষ্ণদাস নিতান্ত বালক ছিলেন না, কারণ তিনি নিত্যানন্দের চেহারা মনে রাখতে পেরেছিলেন। নিত্যানন্দ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পরলোকগমন করেছিলেন। অতএব কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে জন্মগ্রহণ করেন নি।

দ্বিতীয়ত, স্বরূপ দামোদর তাঁর জীবনের শেষ পর্বে বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন

এবং কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দেখার পর বৃন্দাবনে চলে এসে স্বরূপ দামোদরের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন—এ কথাও কৃষ্ণদাস কবিরাজের আত্মবিবরণ থেকে জানা যায়; কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি (চৈ. চ., ১।৫।১৭৯-৮০) থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়,

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥

আশ্চর্যের বিষয়, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার উপরে উদ্ধৃত ছত্রগুলির সুস্পষ্ট অর্থকে উপেক্ষা করে লিখেছেন, "ইহা পড়িলে মনে হয় তিনি (কৃষ্ণদাস) বৃন্দাবনে আসিয়া স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১।১০।৯১ পয়ারে রঘুনাথদাসের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।*
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥

এখানে দেখা যায় যে স্বরূপ নীলাচলে বাস করিতেন ও সেইখানেই তাঁহার অন্তর্দ্ধান ঘটে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১।৫।১৮০ পয়ারে তত্ত্বতঃ স্বরূপের আশ্রয় পাওয়ার কথা বলিয়াছেন।"

এক্ষেত্রে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, রঘুনাথ দাসকে নীলাচলে রেখে স্বরূপ দামোদর বৃন্দাবনে চলে আসতে পারেন না!

আসলে চৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছুকাল পরে স্বরূপ দামোদর বৃন্দাবনে চলে আসেন। রঘুনাথ দাস কিন্তু নীলাচলেই থেকে যান। এর কিছু দিন বাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে আসেন; এসে তিনি স্বরূপ দামোদরের আশ্রয় লাভ করেন, কিন্তু রঘুনাথ দাসের সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় ঘটে নি; নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলি থেকে এ কথা জানা যায়—

যাঁহা হৈতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥

* "অন্তরঙ্গ সেবন" বলতে স্বরূপ দামোদরের অন্তরঙ্গ সেবন নয়, চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সেবন বোঝাচ্ছে। এই ছত্রটির ঠিক আগেই লেখা আছে, "(রঘুনাথ দাস) প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে।"

এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন যে তিনি বৃন্দাবনে প্রথম এসে স্বরূপ, রূপ-সনাতন এবং একজন "রঘুনাথ মহাশয়"-এর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। এই "রঘুনাথ মহাশয়" নিঃসন্দেহে রঘুনাথ ভট্ট, কারণ তিনি চৈতন্যদেবের জীবিত থাকার সময় থেকেই বৃন্দাবনে বাস করছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, রঘুনাথ দাস তখনও বৃন্দাবনে আসেন নি (জীব ও গোপাল ভট্টও আসেন নি)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৃন্দাবনে আসার কিছুকাল পরে স্বরূপ দামোদর বৃন্দাবনে পরলোকগমন করেন এবং রঘুনাথ দাস তখন নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে চলে আসেন। "(রঘুনাথ দাস) স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন" বলে কৃষ্ণদাস এই কথাই বুঝিয়েছেন।

সুতরাং কৃষ্ণদাস যে তাঁর বৃন্দাবনবাসের প্রথম পর্বে কিছুদিনের জন্য আক্ষরিক অর্থেই স্বরূপের আশ্রয় পেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে তিনি যে তত্ত্বত স্বরূপের আশ্রয় পাওয়ার কথা লেখেন নি, তা খুব সহজেই দেখানো যায়; তত্ত্বত আশ্রয় পাওয়ার কথা লিখলে চৈতন্যদেব, অদ্বৈত, হরিদাস প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে একা স্বরূপের আশ্রয় পাওয়ার কথা কৃষ্ণদাস কখনই লিখতেন না। রঘুনাথ দাসের 'মুক্তাচরিত্র' গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোকে স্বরূপের শেষ জীবনে বৃন্দাবনে বাস করার ইঙ্গিত আছে বলে ডঃ সুশীলকুমার দে মনে করেন (Early History of the Vaiṣṇava Faith and Movement in Bengal, 2nd Ed., p. 41)।

॥ ঊনত্রিংশ ॥

গদাধর দাস

গদাধর দাস কাশীরাম দাসের অনুজ। তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গল' নামে একটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে। কাশীরাম দাস নিজের বংশ ও বাসস্থান সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়েছেন, গদাধর দাস তার চেয়ে বেশি খবর দিয়েছেন ('কাশীরাম দাস' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

'জগন্নাথমঙ্গলে'র রচনাকাল গদাধরদাস এইভাবে নির্দেশ করেছেন,

চতুঃষষ্টি শকাব্দ সহস্র পঞ্চশত।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত ॥
রাজচক্রবর্ত্তী শাহজাঁহা দিল্লিপতি।
ধর্ম্মন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতী ॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ।
মহান্ প্রতাপী হয় বৈরিজয়যশ ॥

সুতরাং শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে ও ১৫৬৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথমঙ্গল সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এখানে ১৫৬৪ শকাব্দ ও ১০৫০ সনের একত্র উল্লেখ থাকাতে একটু গোলযোগ হচ্ছে। কারণ শকাব্দকে অতীতাব্দ হিসাবেই সর্বত্র ব্যবহার করা হয় এবং বাংলা সনের সঙ্গে তার ব্যবধান ৫১৫ বছর। শকাব্দ কখনও কখনও Current year হিসাবেও ব্যবহৃত হয় এবং তখন বাংলা সনের সঙ্গে তার ব্যবধান হয় ৫১৬ বছর। কিন্তু এখানে শকাব্দের সঙ্গে বাংলা সনের ব্যবধান ৫১৪ বছর। তাহলে কি এই উল্লেখে কিছু ভুল আছে? তা যে নেই, তার প্রমাণ পেয়েছি। আমরা আরও দু'টি দৃষ্টান্ত পেয়েছি, তাতেও শকাব্দের সঙ্গে বাংলা সনের ৫১৪ বছরের ব্যবধান।

প্রথমটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০৮৬ নং পুথির পুষ্পিকা। এটি অবিকল উদ্ধৃত করছি,

"শকাব্দ ১৬৩৮ ॥ শক ॥ সন ১১২৪ সাল ॥ মাহ ১৭ আষাঢ় রোজ রবিবার বেল ১ এক প্রহরের কালে সমাপ্ত হইল মোকাম রাধানগর পঁড়ুয়া পরগনে ভুরশীট তালুক শ্রীযুত কিত্তিচন্দ রায়ের। আমীন বাবুলাল বেহারি। তস্য ভেজুয়া আমীন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বাদসাহা শ্রীল শ্রীযুত ফররকসাহাজি (ফারুকশিয়র) ॥"

১৬৩৮ শকের ১৭ই আষাঢ় রবিবারেই পড়েছিল।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে পরশুরামের 'শ্রীবৎসচিন্তা উপাখ্যানে'র রচনাকাল। একটি পুথিতে রচনাকালটি এইভাবে পাওয়া যায়,

শকাব্দ পঞ্চদশ চৌরাশী ভাদ্র মাস।
তিথি দশমী কৃষ্ণপক্ষে পরকাশ॥
অষ্টাবিংশতি দিন বৃহস্পতিবারে।
সন হাজার সত্তরি সাল·········॥

(বা. সা. ই. ১।অ, ২য় সং, পৃঃ ৬৮ দ্রঃ)

১৫৮৪ শকের ভাদ্রমাসের ২৮শে তারিখে কৃষ্ণাদশমী তিথি ও বৃহস্পতিবার ছিল।

এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে :—

(১) জগন্নাথমঙ্গলে শক ও সনের উল্লেখে কোন ভুল নেই।

(২) আগে এদেশে অন্তত কোন কোন অঞ্চলে এমন এক "সন" প্রচলিত ছিল, যার সঙ্গে শকাব্দের ব্যবধান ছিল ৫১৪ বছর এবং খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধান ছিল ৫৯২ বছর।

যাহোক ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দেই যে গদাধরদাস 'জগন্নাথমঙ্গল' সম্পূর্ণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্কন্দপুরাণের উৎকল-খণ্ড অবলম্বনে জগন্নাথমঙ্গল রচিত হয়। স্কন্দপুরাণ অর্বাচীন হলেও তা যে ষোড়শ শতাব্দীর পরে রচিত নয়, তা এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

॥ ত্রিশ ॥

দৌলৎ কাজী (কাজী দৌলৎ)

দৌলৎ কাজী ও আলাওল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দুই স্তম্ভ। প্রাচীন যুগের বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে এঁরাই শীর্ষস্থানীয়। শুধু তাই নয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধর্ম-অসম্পৃক্ত রচনার যে সামান্য কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তার মধ্যে এদের দানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দুই বাঙালী মুসলমান কবি আরাকান দেশের অবাঙালী ও অমুসলমান রাজাদের অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করে বাংলা কাব্য রচনা করেছিলেন।

এই দুই কবির মধ্যে কি সময়ের দিক্ দিয়ে, কি কবি হিসাবে দৌলৎ কাজীই অগ্রগণ্য। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও দেশ সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না। আরাকানরাজ শ্রীসুধর্ম বা থিরি থু থম্মার রাজত্বকালে (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ) তাঁর অমাত্য ও সেনাপতি লস্কর-উজীর আশরফ খানের আজ্ঞায় দৌলৎ কাজী 'সতী ময়নামতী' কাব্য রচনা করেন—সাধন নামক উত্তর ভারতীয় কবির অবধী ভাষায় লেখা কাব্য 'মৈনা সৎ'-এর আধার অবলম্বনে। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতে দৌলৎ কাজী ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাব্য রচনা করেছিলেন। 'সতী ময়নামতী' কাব্যের 'রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি'র মধ্যে দৌলৎ কাজী আশরফ খানের হাতে শ্রীসুধর্মের রাজকার্যের ভার অর্পণের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

মহারাজা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধ মন।
তান হস্তে রাজনীতি কৈল্য সমর্পণ ॥

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল এর সঙ্গে হার্ভের History of Burma থেকে সংগৃহীত একটি তথ্যের সংযোগসাধন করেছেন। তথ্যটি তাঁর ভাষায় এই, "শ্রীসুধর্ম তাঁহার ষোলবৎসর রাজত্বকালের মধ্যে প্রায় বারোবৎসর কাল রাজা থাকিয়াও রাজা হন নাই, অর্থাৎ অনভিষিক্ত নরপতি ছিলেন। ইহার কারণ, এক গণৎকার নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, রাজ্যাভিষেকের এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। সে জন্য ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়, নরবলি প্রভৃতি নানা ভয়াবহ অনুষ্ঠান সহযোগে।"

এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ডঃ ঘোষাল সিদ্ধান্ত করেছেন যে দৌলৎ কাজীর কাব্য ১৬৩৫ খ্রীঃর আগেই রচিত হয়েছিল (বিশ্বভারতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮-৯ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। সংস্কারান্ধ শ্রীসুধর্ম কখন মনে করতে পারেন যে তাঁর আয়ু শেষ হয়েছে? অভিষেকের আগে না পরে? নিশ্চয়ই অভিষেকের পরে, কারণ অভিষেকের এক বছরের মধ্যেই গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর মারা যাওয়ার কথা। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শ্রীসুধর্ম তাঁর অভিষেকের পরেই আশরফ খানের হাতে 'রাজনীতি অর্পণ করেন। সব দেশেরই রাজারা অভিষেকের আগে থাকতেই রাজ্যশাসন করতে থাকেন, অভিষেক একটা সাড়ম্বর আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। শ্রীসুধর্ম যে এর আগে নিজে রাজকার্য নির্বাহ করতেন, তার প্রমাণ দৌলৎ কাজীর উক্তির মধ্যেই আছে। আশরফ খানের হাতে শ্রীসুধর্মের ক্ষমতা-হস্তান্তরের প্রসঙ্গ অবতারণা করবার আগে তিনি লিখেছেন,

নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার ॥
প্রতাপে প্রভাত-ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥

১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাভিষেকের পরে শ্রীসুধর্ম "আয়ুশেষ" জেনে "প্রজার পালন" করার ভার আশরফ খানের হাতে তুলে দেন। তারপর দৌলৎ কাজী সতী ময়নামতী লেখেন ও তাতে ঐ ব্যাপারের উল্লেখ করেন। দৌলৎ কাজী তাঁর গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রেখেই দেহত্যাগ করেন, তখনও শ্রীসুধর্ম জীবিত ও রাজপদে অধিষ্ঠিত। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দৌলৎ কাজীর 'সতী ময়নামতী' রচিত হয়েছিল।

যে অবস্থার মধ্যে দৌলৎ কাজীর কাব্য রচিত হয়েছিল, তা দৌলৎ কাজী বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়,

শ্রীযুক্ত আশরফ খান অমাত্য প্রধান।
যোল কলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান ॥

এই আশরফ খান তাঁর সভায় বসে আরবী, ফারসী, গুজরাটী, ঠেঠ প্রভৃতি ভাষার নানা প্রসঙ্গ ও তত্ত্ব-উপদেশ শুনতেন। একদিন তিনি রাজা লোর ও ময়নামতীর উপাখ্যান শুনতে চান: তিনি বলেন,

কোন্ মতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী ॥
ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিল সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ॥

(ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের ভাষায়) "উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রে বলা হইয়াছে যে গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় বলিলে এই কাহিনী কাহারও কাহারও নিকট অবোধ্য রহিবে। তৃতীয় ছত্রের পাঠ হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে এই একই কাহিনী দৌলৎ সাধন নামক কোনো হিন্দী কবির রচনায় দেখিয়া থাকিবেন। এই সাধনের 'মৈনা সত' বা 'সতী ময়না' নামক কেবলমাত্র একখানি অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র হিন্দী কাব্যের পুথির অস্তিত্বের কথা জানা গিয়াছে। কবির রচনা বা অস্তিত্বের সঠিক কাল জানা যায় নাই। যাহাই হোক্, গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় লিখিত সাধন নামক কবির এই কাহিনী মূল ভাষায় বলিলে বঙ্গভাষাভাষীর দল ইহা বুঝিবেন না। তাই দৌলৎ ইহা বাংলা ভাষায় বলিতেছেন। আলাওলের উক্তিতেও ইহার সমর্থন আছে :

হিন্দুস্থানী ভাষে সেই চৌপাইয়া ঠেট।
কেহ কেহ বুঝে কেহ ভাবয় সঙ্কট ॥
এ লাগিয়া আশরফে কৈল অঙ্গীকার।
লোর চন্দ্রানীর কথা রচিতে পয়ার ॥
আশরফ আজ্ঞায় দৌলৎ কাজি ধীর।
রচিল চন্দ্রানী কথা অতি সুরুচির ॥"

দীর্ঘকাল ধরে সাধনের লেখা 'মৈনা সৎ' কাব্যের অস্তিত্বের কথা সকলে জানতেন Tessitoriর A Descriptive Catalogue of Bardic and Historical Manuscripts গ্রন্থ থেকে। ঐ গ্রন্থে (Pt. I, p. 33) এই কাব্যের একটি পুথির উল্লেখ আছে। পরে অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারি সাধনের 'মৈনা সৎ'-এর পুথি আবিষ্কার করেন।

'মৈনা সৎ' কয়েক বছর আগে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিন্দী-বিদ্যাপীঠ-গ্রন্থ-বীথিকা'য় মুদ্রিতও হয়েছে। প্রকাশিত অংশে ছাতনের দূতী মালিনীর ময়নাকে প্রলুব্ধ করার অংশটুকু মাত্র পাওয়া যায়, এর মধ্যে 'বারমাস্যা'ও আছে। এত ছোট একটি কাব্য দৌলৎ কাজীর পৃষ্ঠপোষক আশরফ খানকে উদ্দীপিত করেছিল বলে মনে হয় না। সেইজন্য মনে হয়, সাধনের মূল কাব্যটি আরও অনেক বড় ছিল এবং এর বেশির ভাগ অংশই এখনও পাওয়া যায় নি।

যা হোক্, সাধনের কাব্যের প্রকাশিত অংশের সঙ্গে দৌলৎ কাজীর কাব্য মেলালেই বোঝা যায়, দৌলৎ কাজী সাধনের কাব্য অবলম্বনেই তাঁর কাব্য রচনা করেছেন ; তিনি সাধনের অনেক ছত্রের আক্ষরিক অনুবাদ এবং অনেক ছত্রের ভাবানুবাদ করেছেন। এর কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সাধনের কাব্যের প্রকাশিত অংশের প্রথম চার ছত্র এই,

এক এক করত জীব দেউঁ।
জগ দোসরকো নাঁব না লেউঁ॥
ফাটহি তাসু নারিকো হিয়া।
এক ছাড়ি জেহি দোসর কিয়া॥

দৌলৎ কাজী এর আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন এইভাবে,

এক এক করি মুই দিমু নিজ প্রাণ।
জগতে দোসর নাম না লইমু আন॥
ফাটউক সে নারীর হৃদয় দারুণ।
এক ছাড়ি ভাবয় যে দোসরক গুণ॥

এর পরবর্তী কোন কোন ছত্রেও সাধনের লেখার অনুবাদ মেলে।

'সতী ময়নামতী' কাব্যের 'বারমাস্যা'র সুরু হয়েছে আষাঢ় মাসের বর্ণনা দিয়ে। দৌলৎ কাজী বৈশাখ মাসের বর্ণনা সম্পূর্ণ করে ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা সুরু করে পরলোক-গমন করেন। একটি পুথিতে দৌলৎ-রচিত অংশের শেষে লেখা আছে,

"একাদস মাস রচি দৌলত কাজী নিধন হইলেন। পরে য়ালাওলে দ্বায়াদস মাস পূর্ণ করি কহেন—

মালিনী রত্না দূতি নিজ মনে ভাবি উক্তি
বহি গেল একাদস মাস।"

(আবদুল করিম সঙ্কলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি-পরিচিতি', পৃঃ ৫২৩-২৪)

এ সম্বন্ধে আলাওল নিজে লিখেছেন,

বৈশাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অসাঙ্গ রহিলা।
তবে কাজি দৌলৎ স্বর্গেত হইল লীন।
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চিরদিন॥

দৌলৎ কাজী 'বারমাস্যা'য় বৈশাখ মাসকে "মাধবী মাস" বলেছেন। বৈশাখ মাসের নামান্তর 'মাধব', দৌলৎ একেই "মাধবী" বানিয়েছেন। চৈত্র মাসের নামান্তর "মধু", দু'একজন কবি তাকে "মাধ্বী মাস" বলেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে লিপিকর "মাধ্বী"-কে "মাধবী" করেছে। "মাধবী মাস" বলতে কখন্ চৈত্র মাস আর কখন্ বৈশাখ মাস বোঝাবে, তা সব সময়ে পরিপ্রেক্ষিত দেখে বিচার করা উচিত।

"দৌলৎ কাজী" ও "কাজী দৌলৎ"—এই দুইভাবেই কবির নামটি তাঁর নিজের ভনিতায় ও আলাওলেরউক্তিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক রাজা থিরি-থু-ধম্মার নামের সংস্কৃত রূপ হওয়া উচিত 'শ্রীসুধর্মা', কিন্তু দৌলৎ তাকে 'শ্রীসুধর্ম-'রূপে

লিখেছেন। আলাওল 'সুধর্মা' লিখেছেন (বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী', পৃঃ ৯ দ্রঃ)।

দৌলৎ কাজী তাঁর কাব্যে পৃষ্ঠপোষক আশরফ খান ও সমসাময়িক রাজা শ্রীসুধর্মা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এত বড় একজন কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কোন তথ্যই জানা যায় না। সে সময়ে বাংলা-ভাষী অঞ্চল চট্টগ্রাম আরাকানরাজের রাজ্যভুক্ত ছিল, এই কারণে দৌলৎ কাজী চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

দৌলৎ কাজী "সুফী মতাবলম্বী" ছিলেন বলে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল নিশ্চিত হয়েছেন। দৌলৎ কাজীর পৃষ্ঠপোষক আশরফ খান "হানাফী মোঝাব ধরে চিস্তি খান্দান"—এই উক্তি দৌলৎ কাজী নিজেই করেছেন। মুইনুদ্দীন মুহম্মদ চিস্তীর অনুগামীরা "চিস্তা খানদান" বলে পরিচিত এবং তাঁরা সুফী সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। সুফী আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষিত কবি দৌলৎ কাজী নিজেও সুফী ছিলেন বলে অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। সুফীদের মধ্যে অনেকেই ধর্মবিষয়ে উদার ছিলেন এবং হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ঐতিহ্যকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন। এই দুই বৈশিষ্ট্য যে দৌলৎ কাজীর মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল, তাঁর কাব্যের নানা স্থান থেকে তার প্রমাণ মেলে; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' (পৃঃ ৪৮) থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি,

> ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
> সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর॥
> নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
> ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান॥
> নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।
> নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান॥
> নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
> নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর॥
> তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল।
> নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জল॥
> নানা পুষ্পে শোভে যেন বৃন্দাবন শোভা।
> লোকেরা শোভন করে মহাজন সভা॥

লোক হস্তে লোক কীর্তি রহে পৃথিবীত।
চলি গেল রাজ্য সব রহিলেক কৃত ॥
সুকৃতি যাহার না রহিল ভুবনে।
নাহিক তাহার জীব মরণ সমানে ॥
সাফল্য জীবন যার রহিল সুনাম।
নামে চিরজীবী হৈল জানকী শ্রীরাম ॥

শ্রীসুধর্মার সেনাপতি আশরফ খান ছিলেন দৌলৎ কাজীর পৃষ্ঠপোষক। শ্রীসুধর্মার সঙ্গে দৌলৎ কাজীর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল বলে দৌলৎ কাজী লেখেন নি। কিন্তু এ সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়। শ্রীসুধর্মা একবার সদলবলে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। নৌকায় চড়ে বনে গিয়ে

বনপাশে নগর এক দ্বারাবতী নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অভিরাম ॥
তথাতে রচিয়া সভা রহিল নৃপতি।

এই সভার যে বর্ণনা দৌলৎ কাজী দিয়েছেন (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭) তা একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। বর্ণনাটি আমরা উদ্ধৃত করছি,

ময়ুর গঠন যেন সভার আকৃতি ॥
অপূর্ব নৃপতি সভা বিনোদের স্থল।
অমাত্য সহিতে রাজা করে কুতূহল ॥
... ...
নৃপের সভাতে নানা যন্ত্র সুললিত।
নানা পাখী নাদে যেন বন কল্লোলিত ॥
মগধ রাজ্যের যত যন্ত্র অনুপাম।
কহিতে আছিএ এই সে সকল নাম ॥
তার আদি মৃদঙ্গ মোচঙ্গ তবলা।
সে সব মধুর নাদে শ্রবণ চঞ্চলা ॥
গীতে নৃত্যে বারাঙ্গনা সুশীতল রব।
শুনিতে প্রত্যেক মনে জাগে মনোভব ॥
রাজার সভাতে নিত্য গাহন্ত সুস্বরে।

এর থেকে বোঝা যায়, আশরফ খানের সঙ্গে দৌলৎ কাজীও শ্রীসুধর্মার মৃগয়া-যাত্রার সহযাত্রী হয়েছিলেন এবং দ্বারাবতীতে রাজার সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন।

॥ একত্রিশ ॥

আলাওল

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনেক কবির সম্বন্ধে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রধান কারণ, তাঁদের সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আলাওল সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। তিনি তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থে নিজের সম্বন্ধে অনেক সংবাদই দিয়েছেন। তবুও তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট সমস্যা আছে। আলাওলের গ্রন্থগুলির নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়ার ফলে এবং গবেষকরা কল্পনার প্রভাব কাটাতে না পারার ফলেই এই সব সমস্যা সৃষ্ট হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য ডঃ আহমদ শরীফ এই সব সমস্যার জট অনেকখানি ছাড়িয়েছেন (১৩৬৪ সালের শীত সংখ্যা 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত আলাওলের 'তোহ্‌ফা'র সম্পাদকীয় ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। তবুও সব বিষয় সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

প্রথম সমস্যা—কবির নাম কী ছিল? কবির সমস্ত গ্রন্থেই 'আলাওল' নাম পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেনের মতানুযায়ী এটি যদি আরবী "অল্ অব্‌ব্‌ল্" শব্দের অপভ্রংশ হয়, তা হলে এর অর্থ 'প্রথম'; কিন্তু এটি কি কারও নাম হতে পারে? স্বর্গীয় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে কবির আসল নাম 'আলাউল'—'আলাওল' বিকৃতিমাত্র*। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতে জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যে এক জায়গায় যে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীকে 'আলাওল' বলা হয়েছে, তার থেকেই কবি এই নামটি নিজের ছদ্মনাম হিসাবে নিয়েছেন†। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। আমরা কবিকে 'আলাওল' নামেই অভিহিত করব।

দ্বিতীয় সমস্যা, কবির দেশ কোথায় ছিল? আলাওল তাঁর অন্তত চারখানি গ্রন্থে—'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল', 'সতী ময়নামতী'র শেষাংশ ও 'সেকান্দরনামা'য়—বলেছেন যে তিনি আরাকানে আসার আগে ফতেহাবাদ মুলুকে ('পদ্মাবতীতে' লিখেছেন ফতেহাবাদ মুলুকের জালালপুরে) থাকতেন এবং তাঁর পিতা

* সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৬

† প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৬৮, পৃঃ ৬০৭

ফতেহাবাদের স্বাধীন ভূস্বামী মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন। মজলিস কুতুবের* উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, এই ফতেহাবাদ বর্তমান ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ ও বাখরগঞ্জ জেলার অংশ-বিশেষ নিয়ে গঠিত সে যুগের ফতেহাবাদ মুলুকের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও প্রধানত স্বদেশপ্রেমের বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ এই ফতেহাবাদকে চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেছেন; এঁদের ধারণার অনুকূলে এঁরা বলেন (১) এক সময়ে চট্টগ্রামের নামান্তর ছিল ফতেহাবাদ, এখনও চট্টগ্রাম থেকে আট মাইল দূরে ফতেহাবাদ গ্রাম বর্তমান, (২) আলাওলের সময়ে (১৬৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত) চট্টগ্রাম আরাকানরাজের অধীনে ছিল, (৩) আলাওল আরাকানের রাজধানীতে এসে সেখানকার রাজার অধীনে চাকরী নিয়েছিলেন; সুতরাং আলাওলের ফতেহাবাদ চট্টগ্রামই। কিন্তু এই তিনটি বিষয়ের যোগাযোগ নিতান্তই আকস্মিক। আলাওল তাঁর পূর্বোক্ত চারটি গ্রন্থে খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে দৈবক্রমে পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ফলেই তিনি আরাকানে এসে উপনীত হয়েছিলেন; সুতরাং আরাকানের সঙ্গে তাঁর ভূতপূর্ব নিবাসভূমির রাজনৈতিক সম্পর্কের জন্য তিনি আরাকানে এসেছিলেন বলার কোন কারণ নেই। আলাওল যেভাবে তাঁর বইগুলিতে গর্বের সঙ্গে ফতেহাবাদের উল্লেখ করেছেন এবং তার ভৌগোলিক বিবরণ, হিন্দু-সমাজ ও মুসলিম-সমাজের বিবরণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন, তার থেকে মনে হয় ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) শুধুমাত্র তাঁর পিতার কর্মভূমি ছিল না, তাঁর স্বদেশও ছিল।

তারপর, কবির কয়েকটি গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধেও সমস্যা রয়েছে। সে সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে আমরা—আলাওল তাঁর পূর্বোক্ত চারটি গ্রন্থে নিজের সম্বন্ধে যে সব সংবাদ দিয়েছেন,—সেগুলি অবলম্বনে তাঁর জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই।

একদিন আলাওল ও তাঁর পিতা জলপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে হার্মাদ অর্থাৎ পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাঁদের আক্রমণ করে। আলাওলের পিতা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। আলাওল কোন রকমে অব্যাহতি লাভ করেন এবং (সাঁতার কেটে?) আরাকানের কূলে এসে ওঠেন। এরপর আলাওল আরাকানের রাজধানী "রোসাঙ্গ" শহরে এসে রাজার অশ্বারোহী বাহিনীতে নিযুক্ত

---

* ফরিদপুর-ফতেহাবাদের স্বাধীন ভূস্বামী মজলিস কুতুব ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তি। মীর্জা নাথানের 'বহারিস্তান-ই-গায়বী'তে তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় (History of Bengal, D. U., Vol. II, pp. 195, 253-54, 259-60 এবং সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃ. ৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য।)

হন।* আলাওলের পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতনৈপুণ্য এবং নানা সদ্‌গুণের জন্য তাঁর খ্যাতি অচিরেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্যের মুখ্য পাত্র মাগন ঠাকুর আলাওলকে তাঁর (গানের ?) "গুরু"† হিসাবে বরণ করেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষণ করতে থাকেন। এই মাগন ঠাকুর ছিলেন সিদ্দিক বংশীয় মুসলমান এবং আরাকানের ভূতপূর্ব সমরমন্ত্রী শ্রীবড় ঠাকুরের পুত্র; ভূতপূর্ব রাজা নরপদিগিয়া যখন সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, তখন তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা শিশু যশস্বিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার মাগনেরই উপর অর্পণ করেন; নরপদিগিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র থদো-মিন্তার রাজা হন এবং যশস্বিনী আরাকানের পাটরানী হয়ে মাগনকেই রাজ্যের মুখ্য পাত্রের পদে নিযুক্ত করেন।‡ থদো-মিন্তার এবং যশস্বিনা ভাই-বোন হলেও তাঁদের বিবাহ হয়েছিল।

আরাকানদেশের কোন কোন "ঐতিহাসিক" বিবরণীতে লেখা আছে যে থদো মিন্তার নরপদিগিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ফেয়ার, হার্ভে প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই মতকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন; আলাওলের সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরাও ফেয়ার ও হার্ভে প্রভৃতির অভিমতকেই স্বীকার করেছেন এবং আলাওলের উক্তিকে (অর্থাৎ থদো-মিন্তার নরপদিগিয়ার পুত্র ও যশস্বিনীর ভাই) ভুল বলে মনে করেছেন। কিন্তু আলাওল থদো-মিন্তার ও যশস্বিনীর সমসাময়িক, উপরন্তু তিনি ছিলেন আরাকানরাজের প্রজা ও তাঁর অধীনস্থ সৈনিক এবং রাজার প্রধান অমাত্য ও মহারানীর "শৈশবের পাত্র" মাগন ঠাকুরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ। তাছাড়া,

*'সেকান্দারনামা'তে এই ঘটনার বর্ণনা দেবার সময়ে আলাওল লিখেছেন, "না পাইলুঁ শহীদ পদ ছিল আয়ুলেশ। রাজ-আসোয়ার হৈলুঁ আসি এই দেশ।" বটতলা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে "শহীদ পদ" এর জায়গায় "সদ পদ" এবং "আয়ুলেশ" এর জায়গায় "আঙ্গলেশ" ছাপা হয়েছিল। এই ভ্রান্ত পাঠের উপর নির্ভর করে ডঃ শহীদুল্লাহ যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন, ডঃ আহমদ শরীফ (সাহিত্য পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৫-৮৮ তে) তা খণ্ডন করেছেন; এখানে তার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

† 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামালে' দেখি মাগন আলাওলকে বলছেন, "গুরু কর অবধান" এবং সৈয়দ মুসা আলাওলকে বলছেন, "পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন। আছিল তোহ্মার শিষ্য মোর বন্ধুজন॥" কিন্তু এই বই থেকেই জানা যায় যে, মাগনের আধ্যাত্মিক গুরু বা পীর ছিলেন পীর মাসুম শাহ অতএব আলাওল মাগনের গানের গুরু ছিলেন বলে মনে হয়।

‡ কন্যার শৈশব দেখি ভাবে নরপতি। এথেক সম্পদ সমর্পিব কার প্রতি॥
এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে। মহাসত্য মুসলমান সিদ্দিকের বংশে॥
নানা গুণে পারগ মহন্ত কুলশীল। তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল॥
বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী। এই কন্যা হৈল জান মুখ্য পাটেশ্বরী॥
শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি। মুখ্য পাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী॥
এবে তার নামগুণ কর অবধান। কিঞ্চিৎ কহিব কথা শুন বুদ্ধিমান॥
রাজ-সৈন্য মন্ত্রী ছিল শ্রীবড় ঠাকুর। প্রভাতে মাগিয়া পাইল কুলদীপ শূর॥
প্রভু স্থানে মাগি পাইল প্রার্থনা করি। তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি॥—পদ্মাবতী

আলাওল ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও সাবধানী লেখক, শুজার শেষ পরিণতির কথা তিনি কীরকম সাবধানে লিখেছেন, তা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব। পক্ষান্তরে আরাকানের আলোচ্য পর্বের "ঐতিহাসিক" বিবরণীগুলির অধিকাংশই সমসাময়িক নয়, সেগুলি বিজ্ঞানসম্মত রীতিতেও রচিত নয়; তাদের মধ্যে ক্রমভঙ্গ, অলৌকিক বিবরণ ও সত্য-বিকৃতির অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং তাদের উক্তির সঙ্গে আলাওলের উক্তির কোন বিরোধ দেখা দিলে আলাওলের উক্তিকেই প্রামাণিক বলে ধরতে হবে। ভাই-বোনের বিবাহ আধুনিক মানুষের সংস্কারে বাধে বলে পূর্বোক্ত গবেষকরা এক্ষেত্রে আলাওলের উক্তিকে ভ্রান্ত বলে মনে করেছেন। কিন্তু আলাওল ঠিকই লিখেছেন। আলাওলের দু'টি গ্রন্থ—'পদ্মাবতী' এবং 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' থেকে নীচে উদ্ধৃত দু'টি অংশ মিলিয়ে পড়লেই তা' বোঝা যাবে।

সলিম শাহার বংশ যদ্যপি হইল ধ্বংস নৃপগৃহ হইল রাজ্যপাল।
রাজ্যসুখভোগ মূল কি দিব তাহার তুল রসভোগে গোঙাইল কাল॥
এক পুত্র এক কন্যা সংসারেতে ধন্য ধন্যা জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্যদান যারে দেখি লজ্জিত বাসব॥
সাদউ মেঙদার নাম রূপে গুণে অনুপাম মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেখ।

... ...

যখনে আছিল বৃদ্ধ নৃপ অধিপতি। যশস্বিনী কন্যা রাজগৃহে উপনীতি॥

... ...

বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী। এই কন্যা হৈল জান মুখ্য পাটেশ্বরী। —পদ্মাবতী

নৃপতিগিরির কন্যা পরমা সুন্দরী। সাদউ মেঙ নৃপের ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী॥
সাদউ মেঙদার যদি গেল পরলোকে। ব্রতধর্ম আচরি রহিল স্বামীশোকে॥
—সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল

[উপরের দু'টি উদ্ধৃতিতে আমরা সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪ (পৃঃ ৮১)-তে প্রকাশিত ডঃ আহমদ শরীফ প্রদত্ত পাঠ অনুসরণ করেছি।]

আরাকানের রাজ-পরিবারে যে সে সময়ে ভাই-বোনে বিবাহ হত* তার অকাট্য প্রমাণ আছে। থদো-মিন্তার ও যশস্বিনীর পুত্র শ্রীচন্দ্রসুধর্মার রাজত্বকালে ঔরঙ্গজেবের

* প্রাচীন মিশরীদের মধ্যে ভাইবোনে বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। আধুনিক কালে পেরুর ইন্‌কাদের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এবং হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। এদের সভ্যতা কোন কোন দিক দিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানীদের তুলনায় উন্নত ছিল।

অন্যতম কর্মচারী ও ইতিহাস-লেখক শিহাবুদ্দীন তালিশ চট্টগ্রামে ছিলেন; আরাকানরাজের অধিকার থেকে শায়েস্তা খানের বাহিনীর চট্টগ্রাম জয় করার ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। আরাকানের রাজাদের সম্বন্ধে নানা সংবাদ দেওয়ার পরে তিনি লিখেছেন, "Of their off-spring that base-born son is considered the proper heir to the throne whom they have begotten on the person of their own sister." (Jadunath Sarkar, Studies in Mughal India, 1919, p. 119) থদো-মিন্তার ও যশস্বিনীর একাধারে ভাই-বোন ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। শ্রীচন্দ্রসুধর্মা যে থদো-মিন্তারের বোনের গর্ভজাত পুত্র হওয়ার জন্যই থদো-মিন্তারের মৃত্যুর পরে সিংহাসন পেয়েছিলেন—সে কথাই উদ্ধৃত বাক্যে শিহাবুদ্দীন তালিশ প্রকারান্তরে বলেছেন।

থদো-মিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-৫২ খ্রী:) আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তাঁর প্রথম কাব্য 'পদ্মাবতী' রচনা করেন; এটি জায়সীর লেখা অবধী কাব্য 'পদমাবৎ'-এর (রচনাকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) স্বাধীন অনুবাদ।

এর কিছু পরে থদো-মিন্তার পরলোকগমন করেন; তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী শ্রীচন্দ্রসুধর্মা (আরাকানী ভাষায় থিরি-সান্দ-থু-ধম্মা) তখন শিশু বলে তাঁর মা মহারানীই রাজ্যশাসন করতে থাকেন মুখ্যপাত্র মাগন ঠাকুরের সাহায্যে।

আলাওল লিখেছেন,

সাদউ মেঙদার যদি গেল পরলোকে। (মহারানী) ব্রতধর্ম্ম আচরি রহিল স্বামী-শোকে ॥

শ্রীচন্দ্রসুধর্ম্মা নৃপতিক শিশু দেখি।	সকল অমাত্যগণ হইল একমুখী ॥
দণ্ডবৎ হইয়া মহাদেবীর গোচর।	কহিতে লাগিলা সবে বিনয় উত্তর ॥
ঈশ্বর-দুহিতা তুমি ঈশ্বর-বনিতা।	তোহ্মা বিনু কেবা আছে ঈশ্বর-পালয়িতা ॥
রাজ্যকর্তা পুনি নৃপ হইব যখন।	ব্রতধর্ম্ম আচরি দেবী রহিও তখন ॥
এথেক বিনয় যদি কৈলা পাত্রগণ।	পুত্রতুল্য করে দেবী রাজ্যের পালন ॥
তাহান অমাত্য শ্রেষ্ঠ শ্রীযুত মাগন।	শিশুকালে বৃদ্ধ রাজা কৈলা সমর্পণ ॥
যথেক সম্পদধন দুহিতাক দিল।	তান হস্তে আনিয়া সকল সমর্পিল ॥
মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হৈলা যশস্বিনী।	মুখ্য পাত্র হইলা মাগন গুণমণি ॥

—সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল

এই সময়েই (অর্থাৎ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার নাবালক অবস্থায়) মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল ফারসী ভাষায় লেখা রূপকথা কাহিনী অবলম্বনে 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল'

কাব্য লিখতে সুরু করেন, কিন্তু মাগনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে এই কাব্যটি অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। 'সয়ফুলমুলুক'-এর রচনার ইতিহাস বর্ণনা করার সময়ে আলাওল মাগনের বন্ধু—আরাকানরাজের মহাপাত্র সোলেমানের উল্লেখ করেছেন। আলাওল সোলেমানেরও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। সোলেমানের অনুরোধে আলাওল দৌলৎ কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করলেন এবং 'তোহ্‌ফা' নামে একটি বই লিখলেন; শেষোক্ত বইটি ইউসুফ গদার লেখা ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠান ও কৃত্য বিষয়ক আরবী গ্রন্থ 'তোহ্‌ফা'র বাংলা অনুবাদ।

এদিকে, আলাওল ঘটনাচক্রে এক বিপদে পড়লেন। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজা ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলার কাছে পরাজিত হয়ে আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র-সুধর্মার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কোন কারণে শুজা আরাকানরাজের বিরাগভাজন হলেন। তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় হ'ল এবং তাঁর সঙ্গী মুসলমানরা সকলেই নিহত হ'ল। শুজার সঙ্গে কি আলাওলের মেলামেশা ছিল? তাই মীর্জা নামে আলাওলের জনৈক শত্রু আলাওলের নামে মিথ্যা অপবাদ দিল যে তিনি আরাকানরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন। রাজা তা শুনে আলাওলকে কারাগারে পাঠালেন। কারাগারে পঞ্চাশ দিন ধরে আলাওল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করলেন। তারপর রাজা তাঁর নির্দোষিতার প্রমাণ পেয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁর শত্রুর প্রাণদণ্ড বিধান করলেন। কিন্তু মুক্তি পেয়ে আলাওল অপরিসীম দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হলেন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাজরোষভাজন হবার সময়ে রাজার লোকরা আলাওলের সমস্ত সম্পত্তি লুঠ করেছিল এবং মুক্তি পাবার পরেও আলাওল তা ফেরৎ পান নি।

দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে নয় বছর কাটবার পর আলাওল সৈয়দ মুসা নামে একজন সদাশয় ব্যক্তির অনুরোধে অসম্পূর্ণ 'সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল' কাব্য সম্পূর্ণ করেছিলেন আর এগারো বছর কাটবার পর তিনি মজলিস নবরাজ নামে একজন মুসলমান রাজ-অমাত্যের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। এই মজলিস নবরাজ ছিলেন শ্রীচন্দ্রসুধর্মার মহাপাত্র বা মহামাত্য এবং তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল পরলোকগত মাগন ঠাকুরের মতই; শ্রীচন্দ্রসুধর্মার অভিষেকের সময়ে মজলিস নবরাজই রাজাকে সুশাসনের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন এবং রাজা সর্বপ্রথমে মজলিসকে সেলাম করে পরে মাতৃকুলকে প্রণাম করেছিলেন। এই মজলিস নবরাজের দানে আলাওল তাঁর বকেয়া রাজকর শোধ করলেন এবং দুশ্চিন্তা-মুক্ত হলেন। এরপর অমরত্বলোভী মজলিস নবরাজ তাঁর নাম যুক্ত করে

একটি কাব্য রচনা করার জন্য আলাওলকে অনুরোধ জানালেন। আলাওল বার্ধক্য ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য কাব্য রচনায় অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু অন্নদাতার অনুরোধ এড়াতে না পেরে তিনি নিজামীর লেখা ফার্সী কাব্য 'সেকান্দরনামা'কে বাংলায় অনুবাদ করলেন* এবং তাতে মজলিস নবরাজের নাম যুক্ত করলেন।

পূর্বোল্লিখিত বইগুলি ছাড়া আলাওল 'সপ্তপয়কর' নামে একটি রূপকথা-গ্রন্থ, 'রাগনামা'† নামে একটি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ এবং কিছু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। 'সপ্তপয়কর' নিজামীর লেখা ফার্সী কাব্য 'হপ্তপয়কর'-এর অনুবাদ; আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার সেনাপতি সৈয়দ মহাম্মদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করে তাঁর আদেশে আলাওল এই বইটি লিখেছিলেন।

এখন আমরা আলাওলের বিভিন্ন গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আলাওলের দু'টি গ্রন্থের রচনাকাল সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে তাঁর লেখা 'সতী ময়নামতী'র শেষাংশ। এর শেষে আলাওল এই রচনাসমাপ্তিকাল দিয়েছেন,

মুসলমানী শব্দ সংখ্যা শুন দিয়া মন। অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু শূন্য দেখিয়া আপনে দুই দিগে। সুত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে॥
মগধির সনের শুনহ বিবরণ। যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন॥‡

অতএব ১০৭০ হিজরায় (১৬৫৯-৬০খ্রীঃ) এবং ১০২০ মঘী সনে (১৬৫৮-৫৯ খ্রীঃ) অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশে আলাওল 'সতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন উপরে উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে কোন পুরোনো পুঁথির লিপিসমাপ্তির তারিখ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ তারিখ যে গ্রন্থরচনাসমাপ্তিরই, তার প্রমাণ, আলাওল তাঁর লেখা অংশের সূচনায় "শ্রীচন্দ্রসুধর্ম্ম সে নৃপ মহাশয়"-এর উল্লেখ করেছেন।

---

* নিজামীর মত আলাওলেরও কাব্যের নাম 'সেকান্দরনামা' কিন্তু আধুনিক গবেষকরা আলাওলের বইকে ভ্রমবশত 'দারা সেকেন্দারনামা' নামে অভিহিত করে থাকেন।

† মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ লিখেছেন, 'রাগনামা'র লেখক "সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল সাহেব কিনা, তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।" (বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১১৮।) ডঃ আহমদ শরীফ কিন্তু 'রাগনামা'কে সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওলের রচনা বলেই গ্রহণ করেছেন। আলাওলের 'সেকান্দরনামা' গ্রন্থের সূচনায় কবি লিখেছেন, "বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর। পাঠ গীত সঙ্গীত শিখাইলুঁ বহুতর॥" সুতরাং আলাওল সঙ্গীতনিপুণ ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অতএব 'রাগনামা' যে তাঁরই লেখা, তাতে সন্দেহ না করাই উচিত। 'রাগনামা'তে লেখক গ্রন্থরচনায় কারও অনুজ্ঞার কথা বলেন নি বলে তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল হতে পারেন না, এ রকম ভাবা যুক্তিসঙ্গত নয়।

‡ আলাওল সব সময়ে 'যুগ' শব্দকে ২ ('যুগল' অর্থে) হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

আলাওলের পরবর্তী গ্রন্থ 'তোহ্‌ফা' ইউসুফ গদা রচিত 'তোহ্‌ফা' নামে আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমানী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ। এর সূচনায় আলাওল এইভাবে রচনাকাল নির্দেশ করেছেন,

সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক। রচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মাণিক॥
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর বহিল। আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল॥

এর থেকে বোঝা যায় ৭৯৫ হিজরা বা ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে মূলগ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং তার ২৭৮ বছর পরে অর্থাৎ ১০৭৩ হিজরা বা ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল এর অনুবাদ আরম্ভ করেন।

'তোহ্‌ফা'র রচনাসমাপ্তিকালও আলাওল সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্য দিয়ে,

পুস্তক সমাপ্ত সর্ব্ব সন মুছলমানি।
রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমাণি॥
পক্ষ সাবানের চতুর্দ্দশ দিন সোমবার।
সমুখে বরাত নিশি শুভযোগ সার॥
তরুণ অরুণ সমে বেলা দুই যাম।
তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম॥
মগদের সন সর্ব্ব বুঝহ নির্ণএ।
রিতু জোগ অভ্র এক বসন্ত সময়॥

(আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ৫১-৫২ থেকে উদ্ধৃত। সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪-তে ডঃ আহমদ শরীফের সম্পাদনায় 'তোহ্‌ফা' প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও শ্লোকগুলি যথাস্থানে পাওয়া যায়।)

উদ্ধৃত শ্লোকের শেষ দুই ছত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, "ঋতু যুগ অভ্র এক" বা ১০২৬ মঘী সনে 'তোহ্‌ফা'র রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। প্রথম দুই ছত্রে মুসলমানী সন অর্থাৎ হিজিরা জানানো হয়েছে, কিন্তু লিপিকরপ্রমাদের জন্য এর অর্থ করা যাচ্ছে না। যাহোক্ এতে রচনাসমাপ্তির তারিখ পাওয়া যাচ্ছে "পক্ষ সাবানের চতুর্দ্দশ দিন সোমবার"। ১০২৬ মঘী সন=১০৭৫ হিজরা। ১০৭৫ হিজরার ১৪ই সাবান তারিখ সোমবারেই পড়েছিল এবং ঐদিন ইংরেজী তারিখ ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'তোহ্‌ফা'র রচনা ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়।

আলাওলের 'পদ্মাবতী', 'সপ্তপয়কর' এবং 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল'-এর কোন, কোন পুথি ও ছাপা বইতে রচনাকালবাচক (?) কিছু কিছু শ্লোক পাওয়া যায়। কোন কোন গবেষক অনুমানের সাহায্যে এইসব শ্লোকের হেঁয়ালী ভাঙবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁদের অভিমত কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলে তা গ্রহণ করা যায় না। শ্লোকগুলির পাঠ এতই বিকৃত যে তাদের সমাধান করা অসম্ভব বলে আমাদের মনে হয়।* যাঁরা এইসব শ্লোকের "রহস্যভেদ" করেছেন, তাঁরা হয় কিছু ধরে নিয়ে, না হয় শ্লোকগুলির পাঠের কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিজেদের ব্যাখ্যাকে দাঁড় করিয়েছেন; এই অনুমানপ্রসূত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে তাঁরা আরও অনেক "সিদ্ধান্ত" করেছেন, যার ফলে আলাওল সংক্রান্ত সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব আমরা এই শ্লোকগুলি বাদ দিয়ে অন্য উপায়ে আলাওলের অন্যান্য বইয়ের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

আলাওলের 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামালে'র প্রথমাংশ যে মাগন ঠাকুরের আজ্ঞায় রচিত হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। এই অংশের সূচনায় আলাওল লিখেছেন,

তাতে বিধি দুঃখনাশ করিতে কারণ। ঠাকুর মাগন সঙ্গে হৈল দরশন ॥
মধুর পীরিতি-রসে বশ মোর মন। তান সভাসদ হইয়া থাকোঁ অনুক্ষণ ॥
আজ্ঞা পাই রচিলুঁ পুস্তক পদ্মাবতী। যথেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি ॥
বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তি টুটি আসে। যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে ॥

---

* শ্লোকগুলি আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি।

'পদ্মাবতী'র একটি পুথিতে এই শ্লোকটি মেলে,

যুগ ভুগ ভাব রস শব্দ নিত্য দশা।
যে জন তাহাত রত পুরিবেক আশা ॥

(ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি-পরিচিতি', পৃঃ ৩৩১ থেকে উদ্ধৃত। এটি আদৌ রচনাকালবাচক শ্লোক কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।)

'সপ্তপয়কর' এর রচনাকালবাচক এই শ্লোকটি ডঃ আহমদ শরীফ উদ্ধৃত করেছেন,

মুসলমানি সন কহি শুন গুণিগণ।
চন্দ্র যোগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন ॥
(সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃঃ ১১০)

(চন্দ্র=১, 'যোগ' অর্থাৎ যুগ=২, কলানিধি=১, গ্রহ=৯। আমাদের মনে হয় এটি 'সপ্তপয়কর'-এর রচনাকালনির্দেশক নয়, পুথির লিপিকালনির্দেশক। তাহলে এর সমাধান হয়—১২১৯ হিজরা= ১৮০৪-৫ খ্রী।)

'সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামালে'র শেষাংশের রচনাকালবাচক বিকৃত শ্লোক—

কলা অব্দ হস্তে কহি শুন গুণিগণ।
মৃগাঙ্ক গগন রস করিয়া স্থাপন ॥
(সাহিত্য পত্রিকা, ঐ সংখ্যা, পৃঃ ১০৯)

'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' মাগনের মৃত্যুর ফলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তারপর শুজা আরাকানে আসেন,

আদেশএ মুখ্য পাত্র শ্রীযুত মাগন। সয়ফুলমুলুক গ্রন্থ করাইল রচন ॥
সাঙ্গ না হইতে পুথি পাইল পরলোক। কতকাল মনে মোর আছিলেক শোক।
তার পাছে শাহ শুজা নৃপকুলেশ্বর। দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর ॥

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শুজা রোসাঙ্গে আসেন। সুতরাং তার আগেই এই বইয়ের প্রথমাংশ লেখা শেষ হয়েছিল।

সূক্ষ্মভাবে তথ্য-প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করলে 'সয়ফুলমুলুক'-এর প্রথমাংশের রচনা-কালের নিম্নতম সীমা আরও দুই বছর পিছিয়ে দেওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি, শ্রীচন্দ্রসুধর্মার নাবালক অবস্থায় তাঁর মা মহারানী যশস্বিনী যখন মুখ্য পাত্র মাগন ঠাকুরের সাহায্যে রাজ্যশাসন করছিলেন, তখন 'সয়ফুলমুলুক'-এর প্রথমাংশ রচিত হয়। কিন্তু ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আলাওল যখন 'সতী ময়নামতী'র শেষাংশ লিখেছেন, তখন তিনি বলেছেন,

তবে পুন রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়। শ্রীচন্দ্রসুধর্ম্ম সে নৃপ মহাশয় ॥

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই সময়ে শ্রীচন্দ্রসুধর্মা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় রাজ্য শাসন করছিলেন। শ্রীচন্দ্রসুধর্মা যদি এর মাত্র কয়েক মাস আগে রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করে থাকেন, তা' হলেও তাঁর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার সময় ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী হয় না। তারপর, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে শ্রীচন্দ্রসুধর্মা যখন সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, সেই সময়ে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, আলাওলের "সেকান্দারনামা'র একটি পুথিতে তার এই বর্ণনা পাওয়া যায়,

যুবরাজে আইসে জবে পাটে বসিবার। দণ্ডা (ইল) পুরুব মুখে তক্তের বাহিরে ॥
মজিলিস পার দিব্য বস্ত্র আবরণ। সম্মুখে দাণ্ডাই আগে দরাই বচন ॥
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর। ন করিব ছল বল রাজ্যের উপর ॥
শাস্ত্র নিতি রাজকার্য্যে হৈবা ন্যায়বন্ত। নির্ব্বলীরে বল না করোক বলবন্ত ॥
দয়াল চারিত্র হৈবা সত্য ধর্ম্মবন্ত। সুজনেরে সন্তুষিবা নাশিবা দুরন্ত ॥
ক্ষমাধর্ম্ম আচরিবা চঞ্চল না হৈবা। পূর্ব্ব অপরাধে কার মন্দ না করিবা ॥
আর নানা বিধি প্রকাশন্ত রাজনীতি। সত্য করিআ জদি দরাইল নৃপতি ॥
প্রথমে মজিলিসে তবে ছালাম করএ। শেষে মাতৃকুলযাদি প্রণাম করএ ॥

(ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি-পরিচিতি', পৃঃ ৫৯৫ দ্রষ্টব্য)

এই বর্ণনায় মাগন ঠাকুরের কোনই উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, শ্রীচন্দ্রসুধর্মার

অভিষেকের সময়ে যেভাবে মজিলিস (অর্থাৎ মজলিস-নবরাজ) রাজাকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন, রাজার প্রথম অভিবাদন গ্রহণ করছেন এবং সর্বতোভাবে কর্তৃত্ব করছেন, তার থেকে স্থির বিশ্বাস হয়, এই সময়ে মাগন ঠাকুর পরলোকে এবং মজলিস নবরাজ তাঁর স্থান গ্রহণ করেছেন। অতএব ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই যে মাগন ঠাকুর পরলোকগমন করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং 'সয়ফুলমুলুকে'র প্রথমাংশের রচনা নিঃসন্দেহে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই শেষ হয়েছিল।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তারও আগে আলাওল নিজেকে বৃদ্ধ বলেছেন। 'পদ্মাবতী' যে তাঁর যৌবনের রচনা, তা'ও তিনি খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। মানুষের যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝখানে সুদীর্ঘ সময় থাকে। 'পদ্মাবতী' থদো-মিন্তারের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে থদো-মিন্তারের রাজত্ব সুরু হয়। 'পদ্মাবতী' ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল ধরলে 'সয়ফুলমুলুকে'র রচনাকালের সঙ্গে তার ব্যবধান হয় ১৩ বছরেরও কম। ঐ ব্যবধান এর চেয়েও কম ধরলে প্রথম গ্রন্থ যৌবনে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ বার্ধক্যে রচিত হওয়ার কথা অস্বীকার করতে হয়। অতএব ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়েই 'পদ্মাবতী' রচিত হয়েছিল, তার পরে নয়।

আর একটি বিষয় থেকে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। নরপদিগিগ্যির মৃত্যুর পরে থদো-মিন্তার যখন রাজা হন, তখন যে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক,—তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ 'পদ্মাবতী' তে আলাওল লিখেছেন যে নরপদিগিগ্য—

চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্যদান
যারে দেখি লজ্জিত বাসব ॥

অতএব সিংহাসনে আরোহণের সময়ে থদো-মিন্তার যে অন্ততপক্ষে প্রথম যৌবনে উপনীত হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 'পদ্মাবতী' রচিত হওয়ার সময়েই যে থদো-মিন্তারের "প্রথম যৌবন কাল" ছিল তা আলাওল ঐ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। থদো-মিন্তারের রাজত্বের শেষ দিকে 'পদ্মাবতী' রচিত হলে রাজার বয়স "প্রথম যৌবন" বলে নির্দিষ্ট হত না, তা অনেকটা জোর করেই বলা যায়। এ দিক দিয়েও আনুমানিক ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মাবতী'র রচনাকাল নির্ধারণ করা সমীচীন হয়।

আলাওলের 'সপ্তপয়কর' গ্রন্থ শুজার আরাকানে আগমনের (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের) পরে কোন এক সময়ে লেখা হয়েছিল, কেননা এই বইএ কবি আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার প্রশস্তি-প্রসঙ্গে বলেছেন,

দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার শরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা ॥

'আরাকান রাজসভায়-বাংলা সাহিত্যে'র লেখকেরা এর থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে "কবি যখন 'হপ্ত পয়কর' রচনা করিতেছিলেন, তখন শাহ সুজা রোসাঙ্গে নির্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছিলেন।......সুতরাং আলাওলের 'হপ্ত পয়কর' ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল।" এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে দুটি বাধা আছে। প্রথমত, (বটতলার ছাপা বইয়ের পাঠ অনুসারে) 'সপ্তপয়করে' কবি নিজের জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য খেদ করেছেন,

তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত। যত্তপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুলচিত ॥

কিন্তু ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরেও বহু বছর কবি জীবিত ছিলেন। এর বহু বছর পরে লেখা 'সেকান্দারনামা'তে কবি শুধুমাত্র বলেছেন, "বৃদ্ধকাল হৈল এবে"।

দ্বিতীয়ত, 'সপ্তপয়কর' রচনার সময় আলাওলের আশ্রয়দাতা ছিলেন শ্রীচন্দ্রসুধর্মার প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মহাম্মদ। তাঁরই আদেশে এই বই লেখা হয়,

হেন মহা রাজ্যেশ্বর অখণ্ড-সম্পদ। তান মুখ্য সেনাপতি মহম্মদ সৈয়দ ॥
আমিহ সভাতে তান থাকি অবিরত। অন্ন বস্ত্র দানে আমা পোষেন্ত সতত ॥
আমা প্রতি আজ্ঞা কৈলা হরষিত মনে। উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে ॥

অথচ আমরা জানি যে অন্তত ১৬৫৯ ('সতী ময়নামতী'র শেষাংশের রচনাকাল) থেকে ১৬৬৫ ('তোহ্ ফা'র রচনাসমাপ্তিকাল) খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরাকানরাজের মহাপাত্র সোলেমান।

কিন্তু এই দু'টি বাধা অলঙ্ঘনীয় নয়। 'সপ্তপয়করে'র "যত্তপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুলচিত" চরণটির একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়—"যত্তাপ পিঁজরা জীর্ণ চিন্তাএ পীড়িত" (সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৪)। এই পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে, আলাওল এখানে নিজেকে জরাগ্রস্ত বলেন নি, বলেছেন এ সময়ে তাঁর "পিঁজরা জীর্ণ" অর্থাৎ দেহ রুগ্ন ছিল। এইটিই সঠিক পাঠ বলে আমাদের মনে হয়।

দ্বিতীয় বাধা সম্বন্ধে বলা যায়—কারারুদ্ধ হওয়ার আগে আলাওল কোন সময়ের জন্যই কারও কাছে সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত হন নি। তিনি প্রথমে মাগন ঠাকুরের কাছে ছিলেন, মাগনের মৃত্যুর পর সোলেমানের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন এবং সোলেমানের কাছে থাকা কালে অন্য কারও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করতে পারেন না—ইত্যাদি ধারণা ভুল। তিনি একই সময়ে মাগন, সোলেমান এবং অন্যদের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছেন এবং সকলেরই নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন, এঁদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল প্রীতির সম্বন্ধ, অর্থের বিনিময়ে সর্বক্ষণের জন্য আবদ্ধ থাকার সম্বন্ধ নয়। আমরা দেখি

'সেকান্দারনামা'তে আলাওল তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে বলেছেন,

বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ।
রণঘাতে রোসাঙ্গে আইলুঁ মহাপাপ॥
না পাইলুঁ শহীদ পদ ছিল আয়ুলেশ।
রাজ-আসোয়ার হৈলুঁ আসি এই দেশ॥
রোসাঙ্গেত মুসলমান যথেক আছন্ত।
তালিম আলিম বলি আদর করেন্ত॥
বহু গ্রন্থ রচিলুঁ মোহন্ত সব নামে।
মোর বাক্য এথা প্রকাশিলুঁ সর্ব ঠামে॥
এই মতে সুখে গোঞাইলুঁ কথ কাল।
বিধি বশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল॥
শাহসুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাত্রসব দিল হতমতি॥

সুতরাং ১৬৫৯ থেকে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমানের পৃষ্টপোষণ লাভ করা সত্ত্বেও ঐ সময়েরই মধ্যে আলাওলের সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করতে কোন বাধা নেই। 'সপ্তপয়করে' আরাকানরাজের সঙ্গে শুজার বিরোধের যখন কোন উল্লেখ নেই, তখন বিরোধের আগেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের সঙ্গে শুজার বিরোধ বেধেছিল। সুতরাং ১৬৬০ বা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'সপ্তপয়কর' রচিত হয়েছিল।

আলাওলের 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল'-এর শেষাংশ এবং 'সেকান্দারনামা'র রচনাসমাপ্তিকাল নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও রচনারম্ভকাল নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তা করতে গেলে শুজার সঙ্গে আরাকানরাজের সংঘর্ষের এবং আরাকান-রাজের হাতে শুজার লোকজনদের নিহত হওয়ার তারিখ প্রথমে নির্ণয় করতে হবে।*

বাটাভিয়ায় (বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা) রক্ষিত "ডাঘরেজিস্টার" বা ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৈনিক রেজিস্টারে

* পরবর্তী অনুচ্ছেদে যে সমস্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে ও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি 'সাহিত্য পত্রিকা', শীত সংখ্যা, ১৩৭৪-এ (পৃঃ ৯৩-১৬৬) প্রকাশিত জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক খানের লেখা 'শাহ্ শুজার জীবন-সন্ধ্যা' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

সংগৃহীত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক নথিপত্র থেকে এই সময়কার আরাকানের অনেক ব্যাপার জানা যায়। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের "ডাঘরেজিস্টার" থেকে প্রামাণিক-ভাবে জানা যায় যে, ১৬৬১র ফেব্রুয়ারী মাসের একেবারে প্রথমে শুজা ও আরাকানরাজের সংঘর্ষ বেধেছিল। এই সংঘর্ষের জন্য পাশ্চাত্ত্য লেখকরা আরাকানরাজকে দায়ী করেছেন, আবার আরাকানীরা শুজাকেই দায়ী করেছেন। আরাকানরাজের প্রজা আলাওলও শুজাকেই দোষ দিয়ে বলেছেন, "আপনার দোষ হোন্তে পাএ অবসাদ"। শুজার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ওলন্দাজ বণিকেরা চূড়ান্তভাবে কিছু বলতে পারেনি। ডাঘরেজিস্টারে প্রথমে শুজার ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হওয়ার কথা লেখা হয়েছে, আবার এর কয়েক মাস পরে লেখা হয়েছে, "২২শে ফেব্রুয়ারীতে প্রাপ্ত আরাকানী সূত্রে বলা হইয়াছে যে শাহজাদা চাসৌসা (শুজা) পলাতক আছেন এবং তাঁহাকে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থাতেই পাওয়া যায় নাই।" এটা ঠিক যে, ১৬৬১-র ৭ই ফেব্রুয়ারীর পরে শুজার জীবিত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু সত্যিই তিনি ঐ তারিখে নিহত হয়েছিলেন, না পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, এই সম্বন্ধে সেই সময়েই নানারকম পরস্পরবিরোধী মতবাদ ও গুজবের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের বহু বছর পরেও ভারতে ও আরাকানে অনেক লোক বিশ্বাস করতেন যে শুজা তখনও জীবিত আছেন। এ সম্বন্ধে আলাওলের সঠিক সংবাদ জানা ছিল না বলে মনে হয়। তাই তিনি 'সয়ফুলমুলুক' ও 'সেকান্দারনামা'—দুটি গ্রন্থেই বলেছেন যে, আরাকানরাজের সঙ্গে বিসংবাদের ফলে শুজা "অবসাদ" প্রাপ্ত হয়েছিলেন ("আপনার দোষ হোন্তে পাএ অবসাদ"),* শুজার নিহত হওয়ার কথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেন নি। যাহোক্, শুজার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই যে আরাকান-রাজের আদেশে নিহত হয়েছিল এবং তাদের নিহত হওয়ার সময়েই যে আলাওলকে মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয়, সে কথা আলাওল সুস্পষ্ট-ভাবে বলেছেন। শুজার সঙ্গীরা কিন্তু শুজার সঙ্গে আরাকানরাজের সংঘর্ষ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়নি। এ সম্বন্ধে আরাকানের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ সান শোয়ে বু লিখেছেন, "দুই বৎসর শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম হইয়া গেল। কিন্তু ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শুজার অনুচরবৃন্দ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

---

* কেউ যেন না মনে করেন যে আলাওল 'মৃত্যু' অর্থে "অবসাদ" শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'সেকেন্দারনামা'তে আলাওল নিজের সম্বন্ধেও বলেছেন, "অজ্ঞানে পড়িয়া পাইলুঁ বহু অবসাদ"।

সম্ভবতঃ তাহারা কোন লোভের বশবর্তী হইয়া অথবা তাহাদের প্রভুর প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে একদিন রাত্রিযোগে রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিল। হট্টগোলের মধ্যে ম্রওক-উর গভর্নর মানঅ থিরি (Manaw Thiri) অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইলেন এবং রাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ কোনও ক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। তাঁহাদের এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় শাহজাদা ও তাঁহার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্বেষবশতঃ তিনি তাঁহার প্রধান শত্রু মুঘলদের ধৃত ও হত্যা করিবার আদেশ দিলেন।"

সুতরাং এই সময়েই অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের আদেশে আলাওল কারারুদ্ধ হন। এই ঘটনা যে এইরকম সময়েই ঘটেছিল, আলাওলের নিজের লেখা থেকেও তার প্রমাণ মেলে। আগেই আমরা দেখিয়েছি, আলাওলের 'তোহ্‌ফার' রচনা ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ এবং ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। 'তোহ্‌ফা'র সূচনায় আলাওল লিখেছেন, "মুই আলাওল হীন দৈববশ অনুদিন বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।"

(আবদুল করিম সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২৯ দ্রষ্টব্য।)

এই উক্তির মধ্য দিয়ে আলাওল তাঁর ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের কারাবাস ও নির্যাতন ভোগের কথাই বলেছেন বলে আমরা মনে করি।

যা হোক্, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এই ঘটনার নয় বছর পরে অর্থাৎ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল'-এর শেষাংশের রচনা সুরু করেন। ১৬৬৩ খ্রীঃর এগার বছর পরে অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাওলের ভাগ্যরবি আবার উদিত হয় এবং তিনি মজলিস নবরাজের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন; অতঃপর তিনি মজলিস নবরাজের আদেশে 'সেকেন্দারনামা' রচনা আরম্ভ করেন। সুতরাং ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ বা তার দু' এক বছরের মধ্যেই যে আলাওল 'সেকান্দারনামা' রচনা সুরু করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যা হোক্, আলাওল যে অন্তত ১৬৭৪ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর জন্মকালও মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা খুব দুরূহ নয়। আলাওল তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁর পিতা ফতেহাবাদের "রাজ্যেশ্বর" মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মজলিস কুতুব অন্তত ১৫৭৬ থেকে ১৬১১ খ্রীঃ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (History of Bengal, D. U.,

Vol. II, pp. 195, 253-54, 259-60 দ্রষ্টব্য)। তাঁর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময়েই আলাওলের জন্ম হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আলাওলের জন্ম ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে হয়েছিল ধরলে ১৬৪৫ খ্রীঃর মত সময়ে 'পদ্মাবতী' রচনার সময়ে তাঁর বয়স হয় ৩৭ বছর এবং ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ('সয়ফুলমুলুক' রচনার আরম্ভের নিম্নতম সময়সীমা) তাঁর বয়স হয় ৫০ বছর, তা'হলে যৌবনে 'পদ্মাবতী' রচনা করা এবং বার্ধক্যে 'সয়ফুলমুলুক' রচনা করা সম্বন্ধে আলাওলের উক্তির মধ্যে সঙ্গতি থাকে। যাহোক্, অন্তত ১৬০৮ থেকে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলাওল নিশ্চিতভাবে জীবিত ছিলেন।

পরিশিষ্ট

আলাওল সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাঁরা গবেষণা করেছেন, তারা যেমন অনেক ক্ষেত্রে সত্য উদ্ধার করেছেন, তেমনি কোন ক্ষেত্রে ভুলও করেছেন, মানুষ মাত্রেরই এরকম ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা তাঁদের ভুলের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু দু'জন লেখক এ সম্বন্ধে একটু বেশি পরিমাণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। এঁদের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এঁদের মধ্যে একজন ডঃ সুকুমার সেন। ডঃ সেনের মতে আলাওলের প্রথম পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর নন, সুলেমান এবং 'পদ্মাবতী' নয়,—'সতী ময়নামতী'র শেষাংশই আলাওলের প্রথম রচনা (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৩, পৃঃ ৩২৭)। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ 'পদ্মাবতী' রচিত হয়েছিল থদো-মিন্তারের রাজত্বকালে, আর 'সতী ময়নামতী'র শেষাংশ রচিত হয়েছিল থদো-মিন্তারের পুত্র শ্রীচন্দ্রসুধর্মার রাজত্বকালে। সুলেমানকে আলাওলের প্রথম পৃষ্ঠপোষক বলবার যে কোন কারণ নেই, তা ডঃ আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন (সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃঃ ১০৩-১০৪ দ্রষ্টব্য)। ডঃ সুকুমার সেন আর একটি অভিনব কথা লিখেছেন, "থদো-মিন্তারের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য কন্যা ও পুত্র কর্তৃক যৌথভাবে শাসিত হইতে থাকে। কন্যা বয়সে বড় বলিয়া তিনি 'মুখ্য পাটেশ্বরী' গণ্য হইয়াছিলেন" (বা. সা. ই., ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৩, পৃঃ ৩২৯-৩৩০)। এ সব কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, থদো-মিন্তারের কোন কন্যা ছিল বলেই জানা যায় না; আমরা আগেই দেখে এসেছি যে—থদো-মিন্তারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্রসুধর্মা

এককভাবে রাজ্য পান, কিন্তু তিনি তখন শিশু ছিলেন বলে তাঁর জননী মাগন ঠাকুরের সাহায্যে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। 'পদ্মাবতী'র বটতলায় ছাপা সংস্করণে নরপদিগিগ্যির ('নৃপগৃহ' বা 'নৃপদগ্রী' রূপে উল্লিখিত) মৃত্যু-প্রসঙ্গে লেখা আছে, "চলিতে ত্রিদিস স্থান পুত্র কন্যা রাজ্যদান যারে দেখি লজ্জিত বাসব॥" এর থেকেই কি সুকুমারবাবু কন্যা ও পুত্রের যৌথভাবে রাজ্য শাসন করার কথা পেয়েছেন? কিন্তু এ-ও তো নরপদিগিগ্যির মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা, থদো-মিন্তারের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা নয়। যা হোক্‌, উপরে উদ্ধৃত পাঠের "পুত্র কন্যা রাজ্য দান" যে ভুল, তা বোঝা যায় এর শেষাংশের "যারে দেখি লজ্জিত বাসব" উক্তি থেকে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিতে এর এই পাঠ পাই, "চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্যদান যারে দেখি লজ্জিত বাসব॥" (সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃঃ ৮১)। এইটিই সঠিক পাঠ। বটতলার মুদ্রাকররা 'কৈলা' কে 'কন্যা' বানিয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ডঃ সুকুমার সেনের ঐ সব উক্তিকে কোন কোন গবেষক যাচাই না করেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

তারপর,—আলাওলের পিতা হার্মাদদের হাতে নিহত হবার পর আলাওল যে অবস্থায় রোসাঙ্গে এসেছিলেন, সে সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃঃ ৩০) লিখেছেন, "পুত্রকে (অর্থাৎ আলাওলকে) হার্মাদরা বন্দী করে রোসাঙ্গে নিয়ে এসে রাজার ফৌজে বিক্রি করলে।" এ কথাও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তেমনি কাল্পনিক এ বইতে ডঃ সেনের আর একটি উক্তি, "ফৌজ থেকে নাম কাটিয়ে কবি স্থান পেলেন রাজা শ্রীচন্দ্রসুধর্মার মহাপাত্র সোলেমানের পরিষদে।" এই জাতীয় ভিত্তিহীন আপ্তবাক্য ডঃ সেন অনেক লিখেছেন।

দ্বিতীয় যে লেখক আলাওল সম্বন্ধে গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নাম আবদুল গফুর সিদ্দিকী। আলাওল সম্বন্ধে তাঁর লেখা এক প্রবন্ধে তিনি আলাওলের 'সেকান্দারনামা' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে এই শ্লোকটি আছে, "আসলেতে শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা নাম হয়। নব মজলিস বলি সর্বলোকে কয়॥" (সা. প. প, ১৩৩৩, পৃঃ ৭৭)। এই শ্লোকটি থেকে মনে ধারণা জন্মায় যে, মজলিস নবরাজ ও শ্রীচন্দ্রসুধর্মা একই লোক। কিন্তু আলাওলের 'সেকান্দার-নামা'র যে সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আমরা দেখেছি, তাদের একটিতেও এই শ্লোকটি পাইনি। শ্লোকটি জাল বলে মনে হয়। 'মজলিস নবরাজ' যে মুসলমান

ছিলেন, তার প্রমাণ আলাওলের 'সেকান্দারনামা'তে তাঁর প্রতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের এই উক্তি, "আনন্দের স্থল মাত্র তোমার সমীপ। মোছলমানি দীনে তুমি উজ্জ্বল প্রদীপ॥ মছজিদ পুষ্কর্ণী দিয়া কৈলা বহু কাম। স্বদেশে বিদেশে পুণ্য তোমা কীর্ত্তি নাম॥" অতএব তিনি আরাকানরাজের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না, কারণ আরাকানরাজ মুসলমান ছিলেন না।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "মজলিস নবরাজের দানে কবি রাজকর শোধ করিয়াছিলেন, সুতরাং মজলিস রাজা ছিলেন না।"

শ্রীচন্দ্রসুধর্মার অভিষেক সম্বন্ধে আলাওলের যে বিবরণটি আমরা 'সেকান্দারনামা'র একটি পুথি থেকে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি, তাতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে,

> সুচারু রোসাঙ্গ স্থান নানা ভাতি শোভমান সচন্দ্র সুধর্ম্ম নরপতি।
> অস্ত্রে শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রত [ধর্ম্মে] সুচরিত খলনাশ দুঃখিতের গতি॥···
> হেন ধর্ম্মশীল রাজা অতুল মহত্ত্ব।
> মজলিস নবরাজ তান মহামাত্য॥

(আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত ও ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি-পরিচিতি', পৃঃ ৫৯৫)।

সুতরাং শ্রীচন্দ্রসুধর্মা ও মজলিস নবরাজের ভিন্নতা তথা পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটির কৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহোদয় আলাওলের সুপরিচিত ও বর্তমানলভ্য গ্রন্থগুলি ভিন্ন আরও চারটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন ; এদের নাম—ইউসুফ-জোলায়খা, শিঁরি-খোসরোনামা, লায়লা-মজনুন ও আজিজকুমার-রসবতী (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩, পৃঃ ৭০-৭২ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাঁর উক্তি ভিন্ন আলাওলের লেখা এই চারটি বইয়ের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। নিজামীর (যাঁর দু'টি বই আলাওল ভাষান্তরিত করেছিলেন) লেখা কয়েকটি বই আলাওল "অনুবাদ করেছিলেন অনুমান করেই ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী আলাওলের গ্রন্থের তালিকা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর অপরাপর অনেক অনুমানের মত এটাও সত্য-ভিত্তিক নয়।" (ডঃ আহমদ শরীফ)

॥ বত্রিশ ॥

রূপরাম চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গলকাব্য বাংলার মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা হলেও এই ধারাটির খুব প্রাচীন কোন রচনা এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ধর্মমঙ্গলকাব্যের আদি লেখক হিসাবে পরবর্তী কবিরা ময়ূরভট্টের নাম করেছেন। কিন্তু এঁর মূল রচনার নিদর্শন এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অনেকে মনে করেন, খেলারাম চক্রবর্তী নামে একজন কবি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু খেলারামের এই প্রাচীনত্ব যে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করে দেখাব। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলকাব্যে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে, কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায় নি এবং তাঁর আবির্ভাবকালটিও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি।

এঁদের বাদ দিলে আর যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধর্মমঙ্গলকার, তাঁদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী অন্যতম। এই রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের রচনাকাল জানিয়েছেন একটি দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে। হেঁয়ালিটি আমরা পরে উদ্ধৃত করব।

ঐ হেঁয়ালি বাংলার বিশিষ্ট গবেষকদের গলদ্ঘর্ম করেছে। বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় প্রথমবার গণনা করে পেয়েছিলেন ১৫২৬ শক (=১৬০৪-৫ খ্রীঃ), দ্বিতীয়বারে ১৫৮৬ শক (=১৬৬৪-৬৫ খ্রীঃ), ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী পেয়েছেন ১৫১২ শক (=১৫৯০ খ্রীঃ), শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন ১৬৪১ শক (=১৭১৯-২০ খ্রীঃ), ডঃ সুকুমার সেন পেয়েছেন ১৫৭১ বা ১৫৭২ শক (=১৬৪৯-৫০ খ্রীঃ বা ১৬৫০-৫১ খ্রীঃ)। কিন্তু যেভাবে এঁরা এই হেঁয়ালির ব্যাখ্যা করেছেন তাতে আমাদের মন সায় দেয় না। এঁরা কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বলে মনে হয়। আমাদের বিবেচনায় এই ভাবে হেঁয়ালিটির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা অসম্ভব। কষ্টকল্পনার সাহায্যে এর প্রতিটি চরণের অসংখ্য অর্থ করা যেতে পারে এবং তার ফলে হেঁয়ালির সমাধানও অসংখ্য রকমের হবে।

সুতরাং প্রথমে আমরা এই হেঁয়ালিটি বাদ দিয়ে অন্যভাবে রূপরামের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করব। তারপর তার আলোকে হেঁয়ালিটির সমাধান করার

চেষ্টা করব। প্রথমে দেখা যাক্, রূপরামের কাব্যে তাঁর সময় নির্ধারণের কোন স্পষ্ট সূত্র পাওয়া যায় কিনা। সৌভাগ্যক্রমে তা'ও পাওয়া গেছে। ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল দেখিয়েছেন, একটি পুথিতে রূপরামের আত্মকাহিনীর শেষাংশে এই ক'টি ছত্র আছে,

রাজমহালের মধ্যে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণে যত আছিল প্রজা॥
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর।
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর॥

যে পুথিতে এই অংশটি পাওয়া গিয়েছে, তার আলোকচিত্রও ডঃ সুকুমার সেন প্রকাশ করেছেন। (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৫১৯ দ্রঃ)

আচার্য যদুনাথ সরকারের History of Aurangzib ও History of Bengal (Vol. II) থেকে জানা যায় যে, শাহজাহানের ছেলে শুজা ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজমহলে থেকে বাংলা শাসন করেছিলেন। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি থেকে রূপরামের সময় নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে। শুজা যখন রাজমহলে ছিলেন, সেই সময় থেকে কবি ধর্মের গান গাইতে সুরু করেন।

কিন্তু এর দ্বারা বোঝায় না যে, শুজার শাসনকালেই রূপরামের ধর্মমঙ্গলের রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। কীভাবে রূপরাম প্রথম আসরের ভিতরে ধর্মের গান গেয়েছিলেন, তার বর্ণনা তিনি নিজেই বিশদভাবে দিয়েছেন। সেই বর্ণনা এখন আমরা উদ্ধৃত করব।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে রূপরামের ধর্মমঙ্গলের একটি পুথি ছিল। এই পুথি থেকে বসন্তবাবু রূপরামের আত্মকাহিনীটি পুথির বানান অক্ষুণ্ণ রেখে ছেপে দিয়েছিলেন। (সা. প. প., ১৩৩৬, পৃঃ ৩৫-৩৬ দ্রষ্টব্য)। আমরা এর থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি নীচে উদ্ধৃত করছি,

দীঘলনগর গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
তাঁতীঘরে ধর্ম্ম বড় পথেতে শুনিল॥
ধাওাধাই তাঁতীঘরে দিল দরশন।
চিড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন॥
মনে হল্য পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই।
তাঁতীঘরে ধর্ম্ম ঠাকুর নাঞি দিল খই॥

দক্ষিণা আনিয়া দিল দশ গণ্ডা কড়ি।
দৈবের ঘটনে তার কাণা ডেড বুড়ি॥
পাঁচ দিন উপবাসে দৈবের ঘটন।
বাহাদুর এড়ানে দিলাম দরশন॥
গোওালাভূমের রাজা গণেশ তার নাম।
রিপুকুলচূড়ামণি বড় ভাগ্যবান॥
তারে গিয়া সপনে কহিলা মায়াধর।
প্রভাতে গিয়া ভূপতি দিলা মন্দির চামর॥
সেই হত্যে গীত গাই ধর্ম্মের আসরে।
অদ্যাবধি পুথি তোলা রহিলেন ঘরে॥

এখন, যে পুথিতে "রাজমহালের মধ্যে যবে ছিল শুজা" প্রভৃতি চরণগুলি পাওয়া যায়—তার থেকে উপরে উদ্ধৃত অংশটির শেষ দশ চরণের পাঠান্তর আমরা উদ্ধৃত করছি (ডঃ সুকুমার সেন প্রকাশিত পুথির আলোকচিত্র থেকে এই পাঠ নেওয়া হয়েছে),

দক্ষিণা য়ানিয়া দিলা দস গণ্ডা কড়ি।
বিধির কারণে তার কাণা ডেড় বুড়ি॥
তবে গিয়া এড়াল্যে দিলাম দরসন।
মহারাজা গণেশ রায় দেখিল সপন॥
চামর মন্দীরা দিল নানা বর্ণ সাজ।
আনন্দে গাইলা গিত ধর্ম্মের সমাজ॥
রাজমহালের মধ্যে জবে ছিল সুজা।
পরম কল্যাণে জত য়াছিল প্রজা॥
বর্দ্ধমানে জবে ছিল খালিপে হাকিম।
....য় হইল দক্ষিণ মহিমে॥
সেই হইতে গিতে গাই আসর ভিতর।
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর॥

রূপরামের আত্মকাহিনী থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, গুরুগৃহ পরিত্যাগের ঠিক পর (কবির দাবী অনুযায়ী) ধর্মঠাকুরের কাছে ধর্মমঙ্গল ("বার দিনের গীত") রচনার আদেশ পাবার (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য) অব্যবহিত পরেই রূপরাম গোপভূম বা গোয়ালাভূমের রাজা গণেশ রায়ের কাছে

গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে চামর ও মন্দিরা পেয়ে সর্বপ্রথম ধর্মের আসরে গান করেছিলেন (উপরের উদ্ধৃতি দু'টি দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে কবি সমগ্র ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করে 'গণেশ রায়ের আসরে' গান করেন নি। ধর্মমঙ্গলের সামান্য কিছু অংশ মুখে মুখে রচনা করে তিনি ঐ আসরে গেয়েছিলেন*—তাতে কোন সন্দেহ নেই। উপরে উদ্ধৃত দু'টি পাঠের পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রূপরামের 'গণেশ রায়ের আসরে' প্রথম ধর্মের গান গাওয়ার ঘটনাটিই ঘটেছিল শুজার রাজমহলে অবস্থানকালে। এর পর কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করতে শুরু করেন এবং বলা বাহুল্য—রচনা সম্পূর্ণ করতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। কাব্য রচনা শেষ করার পরে কবি আত্মকাহিনী রচনা করেন এবং তাতে প্রথম ধর্মের আসরে গীত গাওয়ার সময়টি কোন কোন পুথিতে উহ্য রেখে দিয়েছেন, আবার কোন কোন পুথিতে "রাজমহালের মধ্যে যবে ছিল শুজা" বলে তার সময় নির্দেশ করেছেন। "ছিল"—এই অতীতকালের ক্রিয়াপদ থেকে বোঝা যায় যে, শুজার শাসন তখন স্মৃতিতে পর্যবসিত। সুতরাং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, রূপরামের কাব্যরচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল রাজমহল থেকে শুজার বিদায় গ্রহণের পরে—অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে নয়। সুতরাং কাব্য ও আত্মকাহিনী রচনা শেষ করার পরে রূপরাম যে হেঁয়ালিটির মধ্য দিয়ে রচনাসমাপ্তির তারিখ জানিয়েছেন, তার সমাধান ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৫৮১ শকাব্দের পূর্ববর্তী হবে না।

এখন হেঁয়ালিটির সমাধানের চেষ্টা করা যাক্। হেঁয়ালিটি এই,

> শাকে সিমে জড় হইলে যত শক হয়।
> তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়॥
> রসের উপরে রস তায় রস দেহ।
> এই শকে গীত হইল লেখা কর‍্যা নেহ॥

[রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১৩৫১, ভূমিকা, পৃঃ ৶৹ এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩, পৃঃ ১৫৭ দ্রঃ।]

হেঁয়ালিটির উপরে উদ্ধৃত পাঠ ছাড়া আরও তিনটি পাঠ পাওয়া গিয়েছে।

* রূপরামের আত্মকাহিনীতে দেখি ধর্মঠাকুর রূপরামকে ধর্মমঙ্গল রচনার আদেশ দেবার সময় বলেছেন, "যে বোল বলিবে তুমি সেই হব গীত"। এর থেকে বোঝা যায়, রূপরাম প্রথম দিকে আসরে extempore গান গাইতেন।

একটি পাঠ পেয়েছিলেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত পুথি থেকে। পাঠটি তিনি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ৩৬ শ খণ্ডে (পৃঃ ৩৬) প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। উপরে উদ্ধৃত পাঠের সঙ্গে বসন্তবাবুর প্রকাশিত পাঠের কিছু পার্থক্য থাকলেও "তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়" চরণটি বসন্তবাবুর পাঠে অবিকৃতভাবে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মেদিনীপুর জেলার জাড়া গ্রামে প্রাপ্ত এক পুথিতে এই হেঁয়ালির আর একটি পাঠ পেয়েছিলেন (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, পৃঃ ৩৫২ দ্রঃ)। ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত এবং ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল'-এর আত্মকাহিনী-অংশে (পৃঃ ২১ দ্রঃ) হেঁয়ালিটির চতুর্থ এক পাঠ দেওয়া হয়েছে। শেষোক্ত দু'টি পাঠ মোটামুটিভাবে উপরে উদ্ধৃত পাঠের মত হ'লেও সামান্য পার্থক্য আছে।*

উপরে আমরা হেঁয়ালিটির যে পাঠ উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যে "তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়"—চরণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর থেকে ১৫৮৪ (তিন বাণ=৩×৫=১৫, চারি যুগ**=৪×২=৮, বেদ=৪) পাওয়া যায়। ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ নিঃসন্দেহে রূপরামের জীবৎকালের অন্তর্ভুক্ত। শুজার রাজমহলে অবস্থানের সময়ের সঙ্গেও এর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। সুতরাং এই বছরটিই রূপরামের গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ এবং হেঁয়ালিটির মধ্য দিয়ে সেই কথাই জানানো হচ্ছে বলে মনে হয়।

এখন আমরা হেঁয়ালিটি ব্যাখ্যা করে আমাদের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করব।

ইতিপূর্বে যাঁরা হেঁয়ালিটির সমাধান করার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরা নিজেদের খেয়ালখুশিমত "শাকে সিমে জড় হইলে"র একটা অর্থ করেছেন এবং বিভিন্ন

* শেষোক্ত দু'টি পাঠে "তিন বাণ চারি যুগ"-এর জায়গায় "চারি বাণ তিন যুগ" পাঠ পাওয়া যায়। "চারি বাণ তিন যুগ বেদে যত রয়" সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং এই পাঠ গ্রহণ করে কোন কোন গবেষক অনর্থক যোগ ও গুণের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন, " 'তিন বাণ' পাঠই শুদ্ধ মনে হয়।" ('কি লিখি', পৃঃ ১১৯ দ্রষ্টব্য)।

** এক্ষেত্রে 'যুগ' শব্দকে ২ অর্থে না ধরে ৪ অর্থে ধরে অনেক গবেষকই বিভ্রান্ত হয়েছেন, ৪ অর্থে ধরলে চরণটির কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (যা রূপরামের সময়) বাঙালী কবিরা যে ২ অর্থে 'যুগ' শব্দ ব্যবহার করতেন, তার প্রমাণ আলাওল রচিত 'সতী ময়নামতী'র শেষাংশে ও 'তোহ্‌ফা'র রচনাসমাপ্তিকালবাচক শ্লোক থেকে পাওয়া যায়।

চরণের সংখ্যাবাচক শব্দগুলিকে ইচ্ছামত* যোগ, বিয়োগ ও গুণ করে একটা সাল বার করেছেন। কিন্তু কবির ভাষা থেকে মনে হয়, তিনি চরণ থেকে চরণান্তরে প্রবাহিত কোন জটিল হিসাবের দিকে পাঠকদের চালিত করেন নি। আসলে, তিনি কৌতুক করে হেঁয়ালিটির প্রথম তিনটি চরণের প্রত্যেকটিতেই তির্যক্ ভঙ্গিতে কাব্যের রচনাকাল জানিয়েছেন; প্রত্যেক চরণ থেকে একই সমাধান পাওয়া যায়—১৫৮৪ শকাব্দ। আমরা এখন তা'ই প্রমাণ করব।

গোড়ায় প্রথম চরণটি বিশ্লেষণ করা যাক্।

"শাকে সিমে জড় হইলে যত শক হয়।"

"শাকে সিমে জড় হইলে" কত হয়, তা জানার মত সূত্র পাওয়া গিয়েছে।

হুগলী জেলার দশঘরা নিবাসী রাধামাধব ঘোষ কবিতায় 'বৃহৎ সারাবলি' নামে একটি পুরাণসারসংগ্রহ গ্রন্থ লিখেছিলেন, এর রচনাসমাপ্তিকাল যে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ, তা গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন,

ম্লেচ্ছ শাস্ত্র অনুসারে সন সংখ্যা হয়।
অষ্টাদশ পৃষ্ঠে বেদ বসু বিরাজয়॥

গ্রন্থের সমাপ্তি যে আশ্বিন মাসে হয়েছিল, তা'ও তিনি বলেছেন। সুতরাং 'বৃহৎ সারাবলি'র রচনাসমাপ্তিকাল ১৭৭০ শকাব্দ। রাধামাধব ঘোষ শকাব্দের সালটি জানিয়েছেন রূপরামেরই মত হেঁয়ালিভরা একটি শ্লোক দিয়ে; তাঁর শ্লোকটি এই,

শাকে সিমে জড় করি যত শক হয়।
চারি বেদ ব্রহ্মবস্তু তাহে যুক্ত রয়॥
রস ভাসে রস গুণে তায় যোগ দেও।
এই শকে পুঁথী হলো লেখা করি লও॥

('কি লিখি', যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত, পৃঃ ১১৪)

এই শ্লোকে রাধামাধব ঘোষ রূপরামের মতই (সম্ভবত রূপরামকে সজ্ঞানে অনুসরণ করে) "শাকে সিমে জড়" করেছেন।

রাধামাধব ঘোষের শ্লোকের প্রথম ছত্রের অর্থ বোঝা না গেলেও দ্বিতীয় ও

* কখনও কখনও তাঁরা সুপরিচিত আঙ্কিক শব্দের সর্বজনস্বীকৃত অর্থকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী অস্বীকার করে অন্য অর্থ ধরেছেন—যেমন, 'রস' শব্দের অর্থ ৬ না ধরে ৯ ধরেছেন।

তৃতীয় ছত্রের অর্থ বোঝা কঠিন নয়। ঐ দুই চরণে উল্লিখিত বেদ = ৪, ব্রহ্মবস্তু* = ১, রস = ৬, ভাস† = ৭, গুণ = ৩। রাধামাধব "শাকে সিমে জড়" করে পাওয়া অঙ্কের (একে x ধরা যাক্) সঙ্গে প্রথমে "চারি বেদ-ব্রহ্মবস্তু = ৪ × ৪১ = ১৬৪, এবং তারপর "রস ভাস রস গুণ" = ৬ + ৭ + ৬ + ৩ = ২২ যোগ করতে বলেছেন। এর যোগফল হবে ১৭৭০।

সুতরাং, x + ১৬৪ + ২২ = ১৭৭০

অথবা, x + ১৮৬ = ১৭৭০

∴ x = ১৭৭০ − ১৮৬

= ১৫৮৪

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি—"শাকে সিমে জড় হইলে" ১৫৮৪ হয়।

রূপরামের শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ ("তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়") থেকে যে ১৫৮৪ পাওয়া যায়, সে কথা আগেই বলেছি। এখন তৃতীয় চরণটি বিশ্লেষণ করা যাক্। চরণটি এই—

"রসের উপরে রস তায় রস দেহ।"

পূর্ববর্তী গবেষকরা সকলেই এই চরণের 'দেহ'কে 'দাও' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'দেহ' যে ৪ অর্থে§ ব্যবহৃত হতে পারে, তা তাঁদের মাথায় আসে নি। আলোচ্য চরণের অর্থ—"রসের উপরে রস" (অর্থাৎ ৬৬) কে "রস" (৬) ও "দেহ" (৪) দিয়ে গুণ কর। ৬৬ × ৬ × ৪ = ১৫৮৪।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, রূপরামের রচনাকালবাচক শ্লোকের প্রত্যেকটি চরণ থেকেই ১৫৮৪ পাওয়া যাচ্ছে। শ্লোকের প্রথম ও শেষ চরণে কবি 'শক' অব্দের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং রূপরামের ধর্মমঙ্গলের রচনা-সমাপ্তির কাল নিঃসন্দেহে ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

---

* 'ব্রহ্ম' ও 'বস্তু'কে দু'টি স্বতন্ত্র সংখ্যাবাচক শব্দ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। 'বস্তু' শব্দের কোন আঙ্কিক অর্থও নেই। 'ব্রহ্ম' ও 'ব্রহ্মবস্তু' একই কথা। "চারি বেদ ব্রহ্মবস্তু" অর্থাৎ "বেদ-ব্রহ্মবস্তু"র (৪১) চারগুণ।

† 'ভাস' = দীপ্তি = সূর্যের রশ্মি = ৭।

সূর্য 'ভাস' বিকীরণ করেন বলেই তাঁর নাম 'ভাস্কর'। সূর্যরশ্মির অপর প্রতিশব্দ 'অর্চিস্'-এর অর্থ যখন ৭, তখন 'ভাস'-এর অর্থ স্বতই ৭ হবে।

§ সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দকোষগ্রন্থে 'দেহ' শব্দের অর্থনির্দেশ প্রসঙ্গে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে দেহ চার রকমের—জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ।

১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ রাজমহল থেকে শুজার বিদায়গ্রহণের তিন চার বছর পরবর্তী। সুতরাং শুজা রাজমহল ছেড়ে চলে যাওয়ার কিছু পরে রূপরাম ধর্মমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন বলে আমরা আগে যে সিদ্ধান্ত করেছি, তার সমর্থন এর থেকেও পাওয়া যাচ্ছে।

রূপরামের কাব্যের বিভিন্ন ভনিতা থেকে জানা যায় যে, তাঁর নিবাস ছিল দক্ষিণ বর্ধমান অঞ্চলের শ্রীরামপুর গ্রামে এবং তাঁর মাতার নাম ছিল দৈমন্তী অর্থাৎ দময়ন্তী। একটি অর্বাচীন পুথির একটিমাত্র ভনিতায় পাওয়া যায় যে— রূপরামের পিতার নাম ছিল শ্রীরাম চক্রবর্তী।

রূপরামের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, কবিরা তিন ভাই—কবি মধ্যম; তাঁর বড় ভাই ও ছোট ভাই-এর নাম যথাক্রমে রত্নেশ্বর ও রামেশ্বর; সোনা ও হীরা (পাঠান্তর রূপা) নামে কবির দু'টি বোনও ছিল। কবির পিতা বড় পণ্ডিত ছিলেন, বহু পড়ুয়া তার টোলে পড়ত। নিজের বাড়িতে অনেকদিন পড়ার পরে কবি বড় ভাইয়ের দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে পাষণ্ডায় রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোলে পড়তে যান। কিছুদিন এখানে পড়ার পরে গুরুর সঙ্গে রূপরামের বচসা বাধে, গুরু রূপরামকে পুথির বাড়ি মেরে বিদায় দেন। রূপরাম নবদ্বীপের টোলে পড়বার উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হন। কিন্তু মার কথা মনে পড়ায় তিনি বাড়ির দিকে ফেরেন। পথে (কবি দাবী করেছেন যে) পলাশনের মাঠে ধর্মঠাকুর তাঁকে নানা অলৌকিক দৃশ্য দেখান এবং ব্রাহ্মণের বেশে তাঁকে দেখা দিয়ে ধর্মমঙ্গল রচনা করতে বলেন। এরপর রূপরাম বাড়িতে ফিরে আসেন, কিন্তু বড় ভাই তাঁকে মার সঙ্গে দেখা করতে দিল না। তখন রূপরাম আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে—শানিঘাট ও দীঘলনগর গ্রাম হয়ে—নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পথ চলে এড়াল গ্রামে পৌঁছোলেন। সেখানে থাকতেন গোপভূমির ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ রায়। তিনি স্বপ্নে ধর্মঠাকুরের আদেশ পেয়েছিলেন। কবিকে তিনি চামর মন্দিরা দিলেন। রূপরামও আসরে ধর্মের গান গাইলেন।

বলা বাহুল্য, রূপরামের ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ও তাঁর কাছে "ধর্মমঙ্গল" রচনার আদেশ পাওয়ার কথা সত্য হতে পারে না। সম্ভবত ধর্মঠাকুরের কাছে গণেশ রায়ের স্বপ্নাদেশ পাওয়ার কথাটুকুই সত্য। রূপরাম "রাজকবি"র পদ পাবার জন্যই ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন ও আদেশ লাভের কথা বানিয়ে বলেছিলেন বলে মনে হয়।

॥ তেত্রিশ ॥

রামদাস আদক

রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল আর রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল একই বছরে লেখা হয়। রামদাসের কাব্যের রচনাকাল সব পুথিতে নেই, দু'একটি মাত্র পুথিতে রয়েছে,

বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য পক্ষ আট দিবস তাহার ॥

এর থেকে পাওয়া যায় ১৫৮৪ শক বা ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ। এইটিই যে কাব্যের প্রকৃত রচনাকাল, তা বোঝা যায় রামদাসের "আত্মকাহিনী"তে ভুরশিটের রাজা প্রতাপনারায়ণের উল্লেখ থেকে,

ভুরশিটের রাজা নাম প্রতাপনারাণ।
দানে দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান ॥

এই প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। 'রসমঞ্জরী'তে ভারতচন্দ্র লিখেছেন,

ভুরশিট রাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ।

কুলগ্রন্থ থেকে দেখা যায় প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্দ্রের তিন পুরুষ পূর্ববর্তী। ভারতচন্দ্র যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন, তখন ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ প্রতাপনারায়ণের স্বাভাবিক সময় হয়।

তারপর, ভরত মল্লিক তাঁর 'চন্দ্রপ্রভা' গ্রন্থে লিখেছেন যে তিনি প্রতাপ-নারায়ণের সভাসদ ছিলেন ("ইতি প্রজাধীশ্বরবীরপ্রতাপনারায়ণসৎসদস্যঃ")। 'চন্দ্রপ্রভা' ১৫৯৭ শকে বা ১৬৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ১৫৮৪ শকাব্দের সঙ্গে এর মাত্র ১৩ বছরের তফাৎ। সুতরাং এদিক দিয়েও রামদাসের পুথির তারিখ সমর্থিত হচ্ছে।

কিন্তু রামদাসের ধর্মমঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করণের ('অনাদিমঙ্গল' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত) সঙ্গে রূপরামের ধর্মমঙ্গলের তুলনা করলে দেখা যায় যে দুটি কাব্যের অধিকাংশ স্থানই হুবহু এক, কেবল ভনিতায় তফাৎ। এর থেকে মনে হয় রামদাস তাঁর সমসাময়িক কবি রূপরাম রচিত ধর্মমঙ্গলের

ভনিতার এবং অল্প কয়েক স্থানে ভাষার পরিবর্তন করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। কাব্যের রচনাকাল-নির্দেশেও রামদাস রূপরামকেই অনুসরণ করেছেন, অর্থাৎ রূপরাম তাঁর কাব্যের যে রচনাকাল লিপিবদ্ধ করেছেন—সেই ১৫৮৪ শকাব্দকেই রামদাসও তাঁর কাব্যের রচনাকাল বলে জানিয়েছেন। তবে রূপরাম জটিল হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে কাব্যের রচনাকাল জানিয়েছিলেন, আর রামদাস তা জানিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায়।

রামদাস রূপরামের অনুকরণ করেন নি, রূপরামই রামদাসের অনুকরণ করেছেন, এমন কথা যেন কেউ না বলেন। কারণ রূপরামের ধর্মমঙ্গলের শত শত পুথি পাওয়া যায়, কিন্তু রামদাসের ধর্মমঙ্গলের মাত্র কয়েকটি পুথি মেলে। মানিকরাম গাঙ্গুলী রূপরামকে "আদি রূপরাম" বলেছেন এবং ময়ূরভট্টের সঙ্গে তাঁরও বন্দনা করে নিজের ভনিতা দিয়েছেন। অন্য কোন কোন কবির লেখা ধর্মমঙ্গলেও রূপরামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রামদাস আদকের নাম কেউ করেন নি। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রূপরামই আসল কবি এবং রামদাস তাঁর অনুকারী।

॥ চৌত্রিশ ॥

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গল-রচয়িতা। ক্ষেমানন্দ কবির নাম, 'কেতকাদাস' নামের বিশেষণ। 'কেতকা' মনসারই আর এক নাম। ক্ষেমানন্দই লিখেছেন "কিআ পাতে জন্ম লইল কেতকা সুন্দরী।" তাই ক্ষেমানন্দ নিজেকে 'কেতকাদাস' বলেছেন।* আর একটা কথা, অনেকের ধারণা, ক্ষেমানন্দ ভিন্ন আর কোন কবি মনসার 'কেতকা' নামের

---

* 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ' নামের এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রায় সব গবেষকই একমত। কেবল বাংলা সাহিত্যের দু'জন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও ডঃ সুকুমার সেন—এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দু'জন পৃথক লোক, তাঁরা মিলিতভাবে এই মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। কিন্তু দু'টি নাম যে একই লোকের, তা কাব্যের ভাষার ঐক্য থেকেই বোঝা যায়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন, "কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ এক কবিরই নাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃঃ ৪১১)। ডঃ সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড অপরার্ধে (১৯৬৩, পৃঃ ২৫৩) লিখেছেন, "'ক্ষেমানন্দ' ভনিতা আরও দুই তিন জন মনসামঙ্গলের কবি ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ 'কেতকা' মনসার নামান্তর জানা সত্ত্বেও আর কোন কবি 'কেতকাদাস' ভনিতারূপে ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং কেতকাদাসই কবির আসল নাম বলিয়া গণ্য করা উচিত।" এ মত গ্রহণ করলে বলতে হবে 'ক্ষেমানন্দ' এই কবির উপাধি অথবা মনসামঙ্গলকারদের সাধারণ উপাধি। কিন্তু এ রকম উপাধির তাৎপর্য কী হতে পারে, তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত এ মত গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া, আলোচ্য কবির আত্মকাহিনীতে এক জায়গায় লেখা আছে,

শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ কতেক করিব বন্ধ
খড় কাটিবারে বলে মাতা।

তার পর শিশুদের কাছ থেকে মাছ কেড়ে নেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে কবি লিখেছেন,

গালাগালি দেই তারা মৎস্য ছিল হাঁড়িভরা
সকলি লইল ক্ষেমানন্দ।

এই দুই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 'ক্ষেমানন্দ'ই কবির নাম। উদ্ধৃতি দু'টিতে বর্ণিত ঘটনার সময়ে কবির বয়স খুবই অল্প ছিল এবং তখনও তিনি মনসামঙ্গল লেখেন নি। কাজেই ঐ সময়ে তাঁর কোন উপাধি পাওয়ার কথা ওঠে না। অতএব ডঃ সুকুমার সেনের আলোচ্য অভিমত স্বীকার করা যায় না।

কথা বলেন নি। কিন্তু এ ধারণা ভুল। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের দিগ্‌বন্দনায় আছে,

কিয়াপাতে বন্দি গাইব কেতুকাসুন্দরী।
উন কোটি নাগের মাতা জয় বিষহরি ॥

ক্ষেমানন্দের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট সূত্র পাওয়া যায় নি। ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যের মধ্যে রচনাকাল উল্লেখ করেননি। তাঁর আত্ম-কাহিনীর মধ্যে উল্লিখিত কয়েকজন লোকের নাম থেকে তাঁর সময় নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।

অধিকাংশ পুথিতেই এই ছত্রটি পাওয়া যায়,

রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে পড়িল গাঁ
মনে যুক্তি করেন জনক।

এই 'বারা খাঁ'র সময় সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "তিনি ১৬৪০ খ্রীঃ (১০৪৭ বাং সনে) কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্য্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জমি প্রদান করেন। কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত দানপত্রখানি কতকদিনের জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন। ১৬৪০ খ্রীঃ অব্দের পরে বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হন এবং তৎপর কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল বিরচিত হয়"। এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "শিবরামের দলিলে যাঁহার স্বাক্ষর আছে তিনি বারা খাঁ নন, কুতব খাঁ। সুতরাং বারা খাঁর সাহায্যে ক্ষেমানন্দের কাল নির্ণয় করা চলে না।" আসলে এই দলিলটিতে বারা খাঁ ও কুতুব খা—দুজনেরই নাম আছে। 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা দলিলটির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছি। এর তারিখ ১০৪৭ বঙ্গাব্দই। (পৃঃ ১৬১ দ্রঃ)

এই দলিলের বারা খাঁ ও ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত বারা খাঁ অভিন্ন বলে মনে হয়। তাহলে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরেই ক্ষেমানন্দ কাব্য রচনা করেছিলেন বলতে হবে।

এছাড়া অনেকগুলি পুথিতে দেখি আত্মকাহিনীতে আছে,

রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভেটিতে যাই
নাম তাঁর ভারামল্ল।

এই ভারামল্ল ক্ষেমানন্দের পরিবারকে গুয়া পান এবং তিনখানি গ্রাম "লিখাপড়া বসতের স্থল" দান করেন। তখন বারা খাঁ পরলোকগত। ইতিহাসে এক

বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্লের নাম পাওয়া যায়। ইনি তারকেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেছিলেন। কিন্তু এঁর তারিখ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ কোথাও পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী অনুসারে এঁর পিতার নাম হাজারী-কেশবমল্ল ; ইনি তোড়রমল্লের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১৯৪৯, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদকীয় ভূমিকা, পৃঃ ১৪-১৫ দ্রষ্টব্য)। তোড়রমল্ল ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম আসেন ; বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল যদি ঐ সময়ে অল্প বয়সে পিতার সঙ্গে বাংলায় এসে থাকেন, তাহলে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ভারামল্ল অতিবৃদ্ধ অবস্থায় জীবিত থাকতে পারেন। এই কিংবদন্তী যে সত্য হওয়া সম্ভব, তা পরবর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

তারকেশ্বরের প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে তারকেশ্বরস্থ দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের মঠের তৎকালীন মোহন্ত মায়া গিরিকে ভারামল্ল জমি দান করেছিলেন, এই কথা পরবর্তী মোহন্ত মোহন গিরি প্রদত্ত বিবরণে পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন,

"তারকেশ্বর দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণ ১২০৯ সালে মোহন্ত মোহন গিরি বর্ধমান কালেক্টরীতে দাখিল করেন, এই বিবরণ বা তায়দাদ অধুনা হুগলী কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে। (১৯৩১ নং)।....তায়দাদে তিনটি দানপত্রের উল্লেখ আছে—(১) ভারামল্ল রাজা কর্তৃক ৺ (মা) য়া গির ধুম্মুরানকে প্রদত্ত, (২) "কৃত্তিচন্দ্র" কর্তৃক বলভদ্রগীরকে প্রদত্ত এবং (৩) চিত্রসেন কর্তৃক "শীবচন্দ্র" গীরকে প্রদত্ত।" (মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৬২, পৃঃ ৮০০)

দীনেশবাবু লিখেছেন যে এর পর "১২৩৯ সালে দেবোত্তর সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপক্রম হইলে দীর্ঘজীবী মোহন্ত মোহন গিরি একটি মূল্যবান জওাব দাখিল করেন।...মোহন্তের তালিকা এই—মায়াগিরি, বলভদ্র, শিবানন্দ, অরুণাচল, প্রসাদ ও 'আমার গুরু ৺পরশুরাম গীরি।' (মাসিক বসুমতী, ঐ, পৃঃ ৮০০)

মোহান্ত মোহন গিরির এই দুই বিবরণে উল্লিখিত সংবাদগুলি থেকে ভারামল্লের মোটামুটি সময় সহজেই নির্ধারণ করা যায়। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের (মোহন্ত মোহন গিরির বিবরণের "কৃত্তিচন্দ্র") রাজত্বকাল ১৭০৩-৩৭ খ্রীঃ। মোহন্ত বলভদ্র গিরি তাঁর সমসাময়িক ও তাঁর কাছে দানপত্র পেয়েছিলেন। সুতরাং বলভদ্র গিরির পূর্ববর্তী মোহন্ত মায়া গিরির

সময় হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। কিন্তু এমনও হতে পারে যে কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বের গোড়ার দিকেই তাঁর কাছে বলভদ্র গিরি দানপত্র পেয়েছিলেন ও তার অনেক আগে থাকতেই তিনি মোহন্তের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে মায়া গিরি ও ভারামল্লের সময় হবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

হুগলী কালেক্টরীতে রক্ষিত তায়দাদ থেকে ভারামল্ল ও তাঁর অগ্রজ বিষ্ণুদাসের আবির্ভাবকাল নির্ধারণের অন্যান্য সূত্রও পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা থেকে এইসব সূত্রের বিবরণ নীচে উদ্ধৃত করছি,

"(১) 'সাবেক জমিদার রাজা বিষ্ণুদাস' বালিগড়ী পরগণায় চাঁদপুর গ্রামে 'ঘটম রায়'কে ৭৷৷০ বিঘা খানাবাটী দান করিয়াছিলেন—১২০৯ সালে দখলকার বিনোদ সিং প্রভৃতি তাঁহার '৭।৮ পুরুষ' অধস্তন ছিলেন (হুগলী কালেক্টরীর ৬৪৮৫ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)।…(২) বালিগড়ীর 'বিষ্টুদাস' ঐ পরগণার অন্তর্গত খলিসানি গ্রামে কর্পূর সিংহরায়কে ৩দ৩ কাঠা পরিমাণ 'বাস্তু ও বাগান ও গং' খানাবাটী করিয়া দিয়াছিলেন—১২০৯ সালে দখলকার গৌরাঙ্গ ও 'বদ্দীনাথ' দানগ্রহীতার অধস্তন 'আট-দশ পুরুষ' (ঐ, ২৬৫১১ নং তায়দাদ)…'ভারামল্ল রায়' প্রদত্ত অপর একটি দানপত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (১৭২৮২ নং তায়দাদ) —দানগ্রহীতা রামগিরি নামক এক সন্ন্যাসী।" (মাসিক বসুমতী, ঐ, পৃঃ ৮০০-৮০১)

১২০৯ সাল (বঙ্গাব্দ)=১৮০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ সময়ে বিষ্ণুদাস প্রদত্ত জমির যে সব দখলকার বর্তমান ছিলেন, তাঁরা মূল দানগ্রহীতাদের "৭।৮ পুরুষ" ও "আট-দশ পুরুষ" অধস্তন বংশধর বলে তায়দাদে উল্লিখিত হয়েছেন। প্রতি পুরুষে ২৫ বছর ধরে হিসাব করলে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ব্যক্তির উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে; অষ্টম পুরুষ তার কিছু আগে এবং দশম পুরুষ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বর্তমান থাকেন। এই হিসাবে বিষ্ণুদাস ও ভারামল্লকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক্ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়-মধ্যে জীবিত পাওয়া যায়।

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীতে যে বারা খাঁর উল্লেখ আছে, তিনি শিবরাম চক্রবর্তীর দলিলে উল্লিখিত ও ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত বারা খাঁ-ই এবং তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে ক্ষেমানন্দের পরিবার ভারামল্লের কাছে ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন ও তার অল্প পরে ক্ষেমানন্দ 'মনসা-

মঙ্গল' রচনা করেছিলেন। মোটের উপর, ক্ষেমানন্দের "মনসামঙ্গল" সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল বলে স্থির করা যেতে পারে।

একটি বিষয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবন্ধক। সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করছি। তারকেশ্বরের মন্দির সংক্রান্ত একটি মামলার সময়ে মায়া গিরিকে প্রদত্ত ভারামল্লের "দানপত্র" আদালতে দেখানো হয়েছিল—তার তারিখ ৭৮৫ সন। এ সম্বন্ধে বিচারপতি রায় দেন যে, দানপত্রটি খাঁটি হলেও তার তারিখটি জাল—আসলে এর তারিখ ছিল ১৭৮৫ সংবৎ, "১" অক্ষরটি তুলে দিয়ে একে "৭৮৫" বানানো হয়।

কিন্তু ১৭৮৫ সংবৎ বা ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ ভারামল্লের জীবৎকালের একটি তারিখ হলে তা' পূর্বোক্ত বারা খাঁর জীবৎকালের অনেক পরবর্তী হয়ে পড়ে এবং ক্ষেমানন্দের পক্ষে ঐ বারা খাঁ ও এই ভারামল্ল—দু'জনেরই সমসাময়িক হওয়া কঠিন হয়। যাহোক্, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের গবেষণা এই সমস্যার সমাধান করেছে। দীনেশবাবু দেখিয়েছেন যে, ভারামল্লের "দানপত্র"টির শুধু তারিখ জাল নয়, সমগ্র দানপত্রটিই জাল। পূর্বোক্ত বিচারপতির রায়ের সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন,

"বিচারালয়ের আসন হইতে ঐতিহাসিক গবেষণার এই ব্যঙ্গচিত্র অতীব শোচনীয়! সনদটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম—ইহাতে ভূমির পরিমাণ লিখিত নাই এবং একই সনদে দেবতা ও মোহন্ত উভয়কে সম্বোধন করা হইয়াছে। 'সন ৭৮৫ সাল' কোন প্রকারেই বিক্রমাব্দ কিম্বা শকাব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না—ইহা বঙ্গাব্দ উল্লেখের চিরপ্রচলিত পরিভাষা। ৭৮৫ সনে বঙ্গাব্দের উৎপত্তিই হয় নাই, কৃত্রিমকারী তাহা জানিতেন না।" (মাসিক বসুমতী, ঐ, পৃঃ ৮০০)

সুতরাং ভারামল্ল তথা ক্ষেমানন্দের জীবৎকালকে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি টেনে আনার কোন প্রয়োজন নেই।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ যে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের—এমন কি ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দেরও আগে বর্তমান ছিলেন, তার কিছু প্রমাণ আছে। বর্ধমান সাহিত্য সভায় ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের একটি খণ্ডিত পুথি আছে (পুথি নং ৪০৪)। এর লিপিকাল ১১২৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭২০-২১ খ্রীঃ। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণে (পৃঃ ৪৭৭-৪৮১)

এই পুথিটি থেকে ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীটি অবিকল প্রকাশ করেছিলেন। তার থেকে দেখি যে এই পুথিতে ক্ষেমানন্দের পৃষ্ঠপোষকের নাম এইভাবে লেখা আছে,

বিষ্ণুদাসের ভাই তাহারে ভেটিতে যাই
নাম তার রামতারণ মণ্ডল।

এ পাঠ নিতান্তই ভ্রান্ত; অন্য কোন পুথিতে এর সমর্থনও মেলে না; সর্বত্র "ভারামল্ল" বা "রায় ভরামল" নাম পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, এই পুথির লিপিকর ক্ষেমানন্দের সমসাময়িক নন, তাঁর অনেক পরবর্তীকালের লোক; তাই ক্ষেমানন্দের পৃষ্ঠপোষকের নাম ও তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে এই লিপিকরের স্পষ্ট ধারণা ছিল না; সেই জন্য তিনি অনায়াসে 'রামতারণ মণ্ডল' লিখতে পেরেছেন।

ক্ষেমানন্দের গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন একটি "প্রমাণ" পেয়েছেন। "প্রমাণ"টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও চূড়ান্ত না হলেও উল্লেখযোগ্য। ডঃ সেন লিখেছেন,

" 'শশি বিন্দু চন্দ্র বেদ' অর্থাৎ ১০১৪ মল্লাব্দে (১৭০৮-০৯) সীতারাম মনসা-মঙ্গল লিখিয়াছিলেন।....দেবীর কৃপায় তিনি মনসামঙ্গল পুথি পাইয়া নূতন কাব্য রচনার দৈব আদেশ অনুভব করিয়াছিলেন।

দেখাত্যে সরণি যবে দিয়া গেলে পুথি।
আপনার গীত গুণ শুন গো জগতী॥

সীতারাম দাস কেতকাদাসের রচনার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাহার প্রমাণ প্রায় সর্বত্রই আছে। বিশেষ করিয়া যাত্রাপথের বর্ণনায়। সুতরাং যে পুথি সীতারামকে সরণি দেখাইয়াছিল তা নিশ্চয়ই কেতকাদাসের পুথি। অতএব সীতারাম দাসের মনসামঙ্গল রচনাকাল কেতকাদাসের রচনার সম্ভাব্য শেষ সীমা নির্ধারণ করিতেছে।"

ডঃ সেনের উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, সীতারাম দাস মনসাকে "জগতী" বলেছেন। ক্ষেমানন্দও তাঁর কাব্যের কোন কোন ভনিতায় 'মনসামঙ্গল'-কে 'জগতীমঙ্গল' বলেছেন (বা. সা. ই. ১।৪, অপরার্ধ, ১৯৬৩, পৃঃ ২৫৮)। অতএব ডঃ সেনের অনুমান (অর্থাৎ সীতারামের প্রাপ্ত পুথি কেতকাদাসের মনসামঙ্গলেরই পুথি) অযৌক্তিক নয়। এই অনুমান সত্য হলে—ক্ষেমানন্দ ১৭০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছুকাল আগেই যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্ষেমানন্দ একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মকাহিনী লিখে রেখে গিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথাই স্পষ্টভাবে জানা যায় না।

প্রথম প্রশ্ন, ক্ষেমানন্দের গ্রামের নাম কী ছিল ?

আত্মকাহিনীতে কবি লিখেছেন,

তিন পুত্র অল্পবয় প্রসাদ গুরু মহাশয়
তালুকের করে লেখাপড়া।
তাহার কলমবশে প্রজা নাহি চাষ চষে
শমননগর হইল কাঁথড়া ॥

চতুর্থ ছত্রের পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে, ক্ষেমানন্দের গ্রামের নাম ছিল "কাঁথড়া"। কিন্তু এই ছত্রটির "সোমনগর হইল কাঁথড়া", "স্বর্ণনগর হইল কাঁথড়া" পাঠও পাওয়া যায়। "কাঁথড়া" শব্দের অর্থ "পড়োঘরের ভাঙ্গা দেওয়াল"। সুতরাং কবির গ্রামের নাম "সোমনগর" বা "স্বর্ণনগর"-ও হতে পারে। তবে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহোদয় বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যে নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, তার থেকে মনে হয় কবির গ্রামের নাম "কাঁথড়া"-ই ছিল এবং কাঁথড়ার আধুনিক নাম 'কেতেরা'। ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীতে দেখি, ক্ষেমানন্দের পরিবার বারা খাঁর মৃত্যুর পরে নিজেদের গ্রাম ত্যাগ করে জগন্নাথপুরে গিয়ে বসতি করেন, রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্ল বা ভরামল তাঁদের তিনখানি গ্রাম দান করেন। পঞ্চানন বাবু দেখিয়েছেন "আধুনিক হুগলী জেলার তারকেশ্বর থানায় দামোদরের পূর্বতীরে এখনও 'কেতেরা' 'জগন্নাথপুর' 'ভরামলপুর',* গ্রাম বিদ্যমান।" সুতরাং কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ যে এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।† যে ভারামল্ল তারকেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরের জন্য জমি দান করেছিলেন, তাঁর কাছেই যে ক্ষেমানন্দের পরিবার তিনখানি গ্রাম দান হিসাবে পেয়েছিলেন,—তা'ও জগন্নাথপুর-ভরামলপুর-তারকেশ্বরের নৈকট্য থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে মনে করি।

* সম্ভবত 'ভরামলপুর' গ্রামেই ভরামল বা ভারামল্ল থাকতেন।

† ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীতে লেখা আছে যে বারা খাঁর মৃত্যুর পরে ক্ষেমানন্দের পিতাকে দেশ ছেড়ে পালাবার যুক্তি দিয়েছিলেন আস্কর্ণ রায়। লোকমুখে শোনা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল আস্কর্ণ রায়কে "শাহ সুজার সময়ের বালিগড়ি পরগণার পাঠান পকেটের অবাঙ্গালী তালুকদার" বলেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কবি কী অবস্থার মধ্যে কাব্য রচনা করেছিলেন? আত্ম-কাহিনীতে কবি লিখেছেন, ভারামল্লের কাছ থেকে জমি পাবার কিছুদিন পরে একদিন তিনি জননীর আদেশে ভাই অভিরামকে নিয়ে গ্রামের উত্তরে খড় কাটতে যান; সেখানে এক জলায় শিশুরা মাছ ধরছে দেখে তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চান; শিশুরা তাতে রাজী না হওয়ায় তিনি তাদের কাছ থেকে মাছ কেড়ে নেন এবং অভিরামকে দিয়ে মাছ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন; শিশুরা গালাগালি দিয়ে চলে যাবার পর ক্ষেমানন্দ খড়ের খোঁজ করতে থাকেন; এমন সময়ে দেবী মনসা মুচিনীর মূর্তি ধরে তাঁর সামনে আবির্ভূত হন; কিছুক্ষণ কবির সঙ্গে কথা বলার পর তিনি অন্তর্হিত হন। ক্ষণকাল পরে স্বরূপে দর্শন দিয়ে মনসা কবিকে তাঁর "মঙ্গল" রচনা করতে আদেশ দেন। এই বর্ণনার শেষাংশ অলৌকিক বলে গ্রাহ্য করা যায় না। ক্ষেমানন্দর আগে যে সব বাঙালী কবি আত্মকাহিনী লিখেছিলেন, তাঁরা বড় জোর সংশ্লিষ্ট দেবতার স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির উল্লেখ করেছেন, ক্ষেমানন্দ দেবতার সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়ার দাবী জানালেন। ক্ষেমানন্দের বিবরণ থেকে এইটুকু মনে করা যেতে পারে যে শিশুদের কাছ থেকে মাছ কেড়ে নেওয়ার পরে ক্ষেমানন্দ যখন একলা খড় খুঁজছিলেন, সেই সময়ে মনসামঙ্গল রচনার পরিকল্পনা প্রথম তাঁর মাথায় আসে। শিশুদের সঙ্গে মাছ নিয়ে ঝগড়া করা থেকে বোঝা যায়, ক্ষেমানন্দের বয়স ঐ সময়ে খুবই কম ছিল—সম্ভবত তখনও তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন নি।

তৃতীয় প্রশ্ন, কবির জাতি কী ছিল? ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "কেতকা-দাসেরা কায়স্থ ছিলেন। ভনিতায় তিনি এক-আধবার মনসার কাছে কায়স্থদের জন্য বর মাগিয়া গিয়াছেন।

ক্ষেমানন্দ জ্ঞানী রক্ষ ঠাকুরাণী
কায়েস্থ যতেক আছে।"

কিন্তু আত্মকাহিনীতে কবি লিখেছেন যে, তাঁর পিতার নাম ছিল শঙ্কর মণ্ডল। 'মণ্ডল' পদবীধারী লোক কায়স্থদের মধ্যে এখন নেই, কোনদিন ছিল বলেও জানা যায় না। অতএব, যে সমস্ত জাতির লোকদের মধ্যে 'মণ্ডল' পদবী দেখা যায়, ক্ষেমানন্দ তাদেরই কোনটির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। ভারামল্ল কিংবা ক্ষেমানন্দের আর কোন পৃষ্ঠপোষক হয়ত কায়স্থ ছিলেন, বোধ হয় সেইজন্যই কবি মনসাকে কায়স্থদের রক্ষা করতে নির্বন্ধ জানিয়েছেন।

ক্ষেমানন্দ শ্রেষ্ঠ কবি বা যুগপ্রবর্তক কবি না হতে পারেন, কিন্তু তিনি বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবিদের অন্যতম। তাঁর নিজের দেশ পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য, এখনও সে জনপ্রিয়তা কতকাংশে অক্ষুণ্ণ আছে। উপরন্তু, পূর্ববঙ্গে বহু বিশিষ্ট মনসামঙ্গল-রচয়িতা আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে—এমন কি সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের ব্যাপক প্রচার ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় (বা. সা. ই, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ১৯৬৩, পৃঃ ২৮৪-২৮৫)। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৬৯৮ শকাব্দ বা ১৭৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের পুথি পেয়েছিলেন। (বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৮ দ্রষ্টব্য)।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

ভবানন্দ

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে লেখা প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলির মধ্যে ভবানন্দের হরিবংশ অন্যতম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ভবানন্দের জীবৎকাল এতদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নি। হরিবংশের যে সমস্ত পুথি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনখানির লিপিকাল ১০৯৬ বঙ্গাব্দ বা ১৬৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যান্য পুথির সঙ্গে তুলনা করলে এই পুথিতে নানা অসঙ্গতি ও কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আবিষ্কার করা যায়। এই কারণে পুথির লিপিকালের অন্তত বছর ত্রিশ আগে অর্থাৎ অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভবানন্দের জীবৎকাল নির্ধারণ করতে হয়।

ভবানন্দ নিজেকে 'শিবানন্দসুত' বলেছেন। এছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কোন তথ্য হরিবংশ থেকে পাওয়া যায় না। তাঁর অন্য কোন বই-এর নামও আমরা শুনিনি।

কিন্তু ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Aspects of early Assamese Literature গ্রন্থে (p.248) U. C. Lekharu হরিবংশের লেখক হিসেবে "One Bhavānanda Miśra, son of Śivānanda"র নাম করেছেন। ভবানন্দের 'মিশ্র' উপাধির উল্লেখ এইখানেই প্রথম পেলাম। ঐ লেখক ভবানন্দের সময় সম্বন্ধে বলেছেন, "In his Govinda Carita the poet refers to the patronage of Candranārāyaṇa, king of Darrang (1565—1582 Śaka)." সুতরাং ভবানন্দ ১৬৪৩ থেকে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

॥ ছত্রিশ ॥

দৌলত-উজীর বাহরাম খান

দৌলত-উজীর বাহরাম খান লায়লা-মজন্থর অমর উপাখ্যান অবলম্বনে বাংলায় 'লায়লী-মজন্থ' কাব্য রচনা করেন। এর আগে অল্প বয়সে তিনি কারবালার কাহিনী নিয়ে আর একখানি কাব্য লিখেছিলেন।

'লায়লী-মজন্থ' কাব্যে দৌলত উজীর লিখেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) প্রধান উজীর ছিলেন। হোসেন শাহ হামিদ খানের গুণ ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে "দুই সিক" দান করেন এবং চাটিগ্রাম বা ফতেহাবাদের অধিকারীর পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর হামিদ খানের বংশধররা চট্টগ্রামেই বাস করতে থাকেন। বাহরাম খানের আমলে চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন "নৃপতি নেজাম শাহা সুর (শূর)"। তিনি প্রথমে কবির পিতাকে এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্বয়ং কবিকে "দৌলত উজীর"* খেতাব দেন, অর্থাৎ তিনি কবিকে রাজ্যের অর্থবিভাগের কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন।

দৌলত-উজীর বাহরাম খান যে ঔরংজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) 'লায়লী-মজন্থ' রচনা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ 'লায়লী-মজন্থ'র উপক্রমে "আওরঙ্গ শাহা দিল্লীশ্বর"-এর প্রশস্তি আছে এবং এই প্রশস্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলবার কোন কারণ নেই। বাহরাম খান যে ঔরংজেবের সমসাময়িক, তার অন্য প্রমাণও আছে। চট্টগ্রাম-নিবাসী কবি মোহাম্মদ খানের লেখা 'মক্তুল-হোসেন' কাব্যে (রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রীঃ) এক পীর সদর জাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁকে বারো ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁ সংবর্ধিত করেছিলেন। ঈশা খাঁ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে স্বাধীন রাজা হন এবং ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন (History of Bengal, D. U., II, p. 238 দ্রঃ)। এ দিকে চট্টগ্রামবাসী বাহরাম খানও 'লায়লী-মজন্থ'-তে

---

* "উজীর" আখ্যাধারী রাজকর্মচারীরা সেকালে রাজ্যের রাজধানীতে যেমন নিযুক্ত হতেন, তেমনি বাইরেও নিযুক্ত হতেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বহু শিলালিপিতে দেখা যায় "উজীর" আখ্যাধারী অনেক রাজকর্মচারীর কর্মক্ষেত্র রাজধানী থেকে বহু দূরে কোন স্থানে অবস্থিত ছিল।

লিখেছেন যে তাঁর পীর আসাউদ্দীনের প্রপিতামহের নাম সদর জাহাঁ। ("ছদর জাহান" বা "সদর জাহান")। সদর জাহাঁ যোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জীবিত থাকলে তাঁর প্রপৌত্রের শিষ্য বাহরাম খান খুব স্বাভাবিকভাবেই ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রীঃর মধ্যে জীবিত থাকবেন।

'লায়লী-মজনু'তে কবি বংশপরিচয় ও আত্মপরিচয় দেবার সময়ে বলেছেন তাঁর আমলে চট্টগ্রামের সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন "ধবল অরুণ গজেশ্বর" অর্থাৎ আরাকানের রাজা* (এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর', ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৫ দ্রষ্টব্য)। "ধবল অরুণ গজেশ্বর" বা এই জাতীয় বিরুদ আর কোন দেশের কোন রাজার কোনদিন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না)। কবির পৃষ্ঠপোষক "নেজাম শাহা সুর" যে আরাকানরাজই, তা বোঝা যায় দু'টি বিষয় থেকে; প্রথমতঃ "নেজাম শাহা সুর" ও আরাকান-রাজের নাম কবি একই সঙ্গে লিখেছেন,

চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নেজাম শাহা সুর ॥
একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী
ধবল অরুণ গজেশ্বর।
রজনী সময় হৈলে মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে
অপরূপ পুরীর অন্তর ॥

দ্বিতীয়ত, কবি "নেজাম শাহা"কে এক জায়গায় "মহারাজ" বলেছেন, যা মুসলমান কবি মুসলমান শাসককে সচরাচর বলেন না।। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আরাকানের রাজারা নিজেদের নামের সঙ্গে একটি করে মুসলমানী নামও নিতেন, "নেজাম শাহা"ও এইরকম একটি নাম।

যে সময়ে "নেজাম শাহা" কবিকে "দৌলত উজীর" খেতাব দেন এবং যে সময়ে কবি 'লায়লী-মজনু' রচনা করেন—এই দুই সময়ের মধ্যে বহু ব্যবধান। অধ্যাপক আলী আহমদ লিখেছেন, "(খেতাব পাবার সময়ে) বাহরামের বয়স এত অল্প ছিল যে, দৌলত-উজীরের পদ-প্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে আশা

* অধ্যাপক আলী আহমদ মনে করেন আরাকানরাজের অনুকরণে চট্টগ্রামের স্বাধীন রাজা নিজাম শাহ ''ধবল অরুণ গজেশ্বর'' উপাধি নিয়েছিলেন। তাঁর এই ধারণা তথ্য-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। সেজন্ত তাকে গ্রহণ করা যায় না।

করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু নিজাম শাহ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।

পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে মানি
বাপের খেতাব দিলা মোরে ॥

তিনি যখন লায়লী-মজনু কাব্য লিখেন তখন তাঁহার বয়স সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন :

এবে মোর বৃদ্ধ কাল হৈল উপস্থিত।
বুদ্ধি সুদ্ধি পরাক্রম সকল খণ্ডিত ॥"

প্রথম বয়সে—"দৌলত-উজীর" খেতাব পাবার কিছুকাল পরে কবি যখন কারবালার কাহিনী অবলম্বনে কাব্য লিখেছিলেন (কাব্যটিকে সম্পাদক আলী আহমদ সাহেবের দেওয়া নাম 'ইমামবিজয়' অনুসারেই অভিহিত করব), তখনও তিনি পীরের শিষ্য হন নি, তাঁর পীর আসাউদ্দীনের নাম ঐ কাব্যে কোথাও নেই ; পক্ষান্তরে 'লায়লী-মজনু'র প্রায় প্রতি ভনিতাতেই আসাউদ্দীনের নাম পাওয়া যায়। এ থেকেও 'দৌলত-উজীর' খেতাব প্রাপ্তি ও 'লায়লী-মজনু'র রচনার মধ্যে বিস্তৃত কালব্যবধান সূচিত হয়।

এই কালব্যবধান থাকার জন্যই—"নেজাম শাহা"র আসল নাম সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। দৌলত-উজীর ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কোন সময়ে 'লায়লী-মজনু' রচনা করেছিলেন, কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে রচনা করেছিলেন, তা বলা যায় না—আবার তার কত দিন আগে তিনি 'দৌলত উজীর' খেতাব পেয়েছিলেন, তা'ও জানা যায় না। সুতরাং কোন্ আরাকান-রাজের তিনি পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছিলেন, তা বলা যায় না। আরাকানের রাজাদের মধ্যে অনেকে মুদ্রায় তাঁদের মুসলমানী নাম উল্লেখ করেছেন, অনেকেই করেন নি—যেমন শ্রীসুধর্মা ; এঁর মুসলমানী নাম "দ্বিতীয় সেলিম শাহ" মুদ্রায় উল্লিখিত না হলেও মান্‌রিকের বিবরণীতে উল্লিখিত হয়েছে ('লায়লী-মজনু'র ২য় সংস্করণের ডঃ আহমদ শরীফ লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ১৫)। কোন্ আরাকান-রাজের "নেজাম শাহা" অর্থাৎ নিজাম শাহ নাম ছিল, তা আপাতত জানা যাচ্ছে না। দৌলত উজীরের 'লায়লী-মজনু' রচনার সময়ে যদি "নেজাম শাহা" জীবিত থেকে থাকেন, তবে ইনি আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মা। তবে "নেজাম শাহা" যে ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন, তার কোন প্রমাণ নেই।

কাব্যের মধ্যে 'চৌতিশা'য় দৌলত উজীর 'ক্ষ' দিয়ে শ্লোক রচনা করার

সময়ে "ক্ষিতিত নেজাম শাহা বীর" বলেছেন, কিন্তু এর থেকেও কিছু প্রমাণ হয় না; কারণ মৃত বীরদের বীরত্বের প্রশংসাও কবিরা ঐ ভাবে করে থাকেন। কবির 'ইমামবিজয়' নিজাম শাহের রাজত্বকালেই রচিত হয়েছিল, কারণ ঐ গ্রন্থে কবি বলেছেন,

"নৃপতি নিঝাম শাহ রাজ্যঅধিপতি।
যশবন্ত বলবন্ত শক্তিবন্ত অতি ॥"

ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ আবদুল করিম এবং অধ্যাপক আলী আহমদ স্বীকার করতে চান না যে, 'লায়লী-মজনু' ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। তাঁদের মতে ঐ কাব্য অনেক আগেকার রচনা। কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে এঁদের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে,

(১) 'লায়লী-মজনু'র পাঁচখানি পুথিতে এপর্যন্ত "আওরঙ্গ শাহা" বা ঔরঙ্গজেবের প্রশস্তি পাওয়া গিয়েছে; আরও চারটি পুথিতে এই প্রশস্তি ছিল বলে ডঃ আহমদ শরীফ মনে করেন ('লায়লী-মজনু', ২য় সং, ভূমিকা, পৃঃ ৮-৯)। এতগুলি পুথিতে একটি প্রক্ষিপ্ত প্রশস্তি স্থান পেয়েছে বলে কিছুতেই ভাবা যায় না।

(২) বাহরাম খানকে ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক ধরে নিলে তাঁর গুরুর প্রপিতামহ সদর জাহাঁকে যে সময়ে পাওয়া যায়, ঠিক সেই সময়েই মহম্মদ খানের মাতামহের পিতা সদর জাহাঁকে পাওয়া যায়; দু'জনেই চট্টগ্রামবাসী, দু'জনেই পীর; 'সদর জাহাঁ' উপাধিও* মোটেই সুলভ নয়। উপস্থিত ব্যাপারে আমরা 'সদর জাহাঁ'র ক্ষেত্রে একটি সুন্দর synchronism পাচ্ছি এবং ঐতিহাসিকদের কাছে এই জাতীয় প্রমাণ অত্যন্ত মূল্যবান্।† সুতরাং দুই সদর জাহাঁকে এক না ধরে উপায় নেই বলেই আমরা মনে করি।

---

* ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন, "বিভিন্ন লোকের এই উপাধি থাকা সম্ভব।" কিন্তু শিলালিপি, সাহিত্য ও অন্যান্য সূত্র—কোথাও এই উপাধির আর কোন অধিকারীর সন্ধান পাওয়া যায় না। সদর জাঁহা রাজকর্মচারী বা ভূস্বামী নন, পীর; পীরের পক্ষে এই জাতীয় উপাধি লাভ বিরল ঘটনা। একাধিক পীরের ক্ষেত্রে এই বিরল ঘটনা ঘটবে বলে ভাবা যায় না।

† কোন কোন গবেষক এই মত ব্যক্ত করেছেন যে এক সদর জাহাঁর পুত্রের নাম শাহা আহমদ (মোহাম্মদ খানের মাতামহ) এবং আর এক সদর জাহাঁর পুত্রের নাম শাহা জনুদ (আসাউদ্দীনের পিতামহ), অতএব তাঁরা পৃথক লোক। এই মত খুবই বিস্ময়কর। আর পাঁচ জনের মত সদর জাহাঁরও একাধিক পুত্র কেন থাকবে না, তার কোন কারণ এঁরা দেখান নি।

(৩) পূর্বোক্ত গবেষকরা দৌলত-উজীরকে ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলে মনে করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র ছিল (দিল্লী, পাটনা প্রভৃতি পুরোনো শহরের মত চাটিগ্রাম শহরের অবস্থানও বার বার বদলেছে) বর্তমান চট্টগ্রাম শহর থেকে আট মাইল দূরে 'ফতেহাবাদ'-এ অবস্থিত। এ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, দৌলত উজীরও লিখেছেন,

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।

কিন্তু ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন মোগলরা মগদের হাত থেকে চাটিগ্রাম জয় করে, তখন চাটিগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র এখনকার চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল*। দৌলত-উজীরের আমলেও চাটিগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম শহরেই ছিল† এবং ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট নাম ছিল 'জাফরাবাদ' **—তার প্রমাণ 'ইমামবিজয়' কাব্যে দৌলত-উজীরের এই উক্তি,

সহর জাফরাবাদ নামে চাটিগ্রাম।
তাহাতে বৈসএ পীর বদর আলাম॥

পীর বদর আলমের দরগাহ্ এখনকার চট্টগ্রাম শহরের মধ্যেই বরাবর ছিল ও আছে। মোগলদের চাটিগ্রাম বিজয়ের সময়ে যে পীর বদরের দরগাহ্ খাস চট্টগ্রাম শহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা শিহাবুদ্দীন তালিশের বিবরণ পড়লে জানা যায়। 'ইমাম-বিজয়'-এ দৌলত উজীর স্পষ্টই বলেছেন যে তাঁর সময়েও 'চাটিগ্রাম' শহরের মধ্যেই পীর বদর আলমের দরগাহ্ অবস্থিত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ দরগাহ এই একই ভূমিতে অবস্থিত থাকলেও সেই ভূমিকে চাটিগ্রাম থেকে কিছু দূরে অবস্থিত পার্বত্য ভূমি বলে গণ্য করা

* মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময়ে মগদের দুর্গ অবস্থিত ছিল বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের সিভিল হাসপাতালের জমি ও টেম্পেস্ট হিলের মাঝখানে। চট্টগ্রাম বিজয়ের অব্যবহিত পরে বিজেতা মোগল বাহিনীর অন্যতম নায়ক বুজুর্গ খান চট্টগ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি জামী মসজিদ নির্মাণ করান—এই মসজিদের সংলগ্ন এলাকাটি এখন চট্টগ্রামের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত এলাকা।

† দৌলত উজীরের পীর আসাউদ্দীনের বাড়ি ছিল ফতেহাবাদে। দৌলত উজীর তাঁর পীরের বাসভূমিকে শুধুমাত্র "নগর ফতেয়াবাদ নাম" বলেছেন—"চাটিগ্রাম" বলেন নি। এর থেকেও বোঝা যায়, দৌলত উজীরের আমলে চাটিগ্রাম শহর ফতেহাবাদ থেকে সরে গিয়েছে।

** এটি নতুন এবং অত্যন্ত মূল্যবান্ তথ্য।

হত। দৌলত উজীর ষোড়শ শতাব্দীর চাটিগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খানের প্রসঙ্গে লিখেছেন,

চৌদিকে পর্বত গড় অধিক উঞ্চলতর
তাত শাহা বদর আলাম ॥

(এক্ষেত্রে দৌলত উজীরের সূক্ষ্ম ইতিহাসজ্ঞান আমাদের মুগ্ধ করে।)

আমার মনে হয়—এর পরে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে দৌলত উজীর সপ্তদশ শতাব্দীর লোক।

(৪) সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে সৈয়দ সুলতান লিখেছেন যে তাঁর আগে "দেশী ভাসে" রসুলের কথা নিয়ে কেউ কাব্য রচনা করেন নি। রসুলের কথা নিয়ে কিছু লেখা হবার আগে ইমামদের কথা নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছিল বলে ভাবা যায় না। সুতরাং দৌলত-উজীরের 'ইমাম-বিজয়'-কে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলে ভাবা কঠিন। মোহাম্মদ খান যেভাবে 'মক্তুল হোসেন'-এর রচনার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তার থেকেও মনে হয় তাঁর আগে ইমামদের কাহিনী নিয়ে বাংলা ভাষায় কেউ কিছু লেখেন নি।

পূর্বোক্ত গবেষকদের মূল যুক্তিগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার মনে করি।

অধ্যাপক আলী আহমদের মতে ('ইমাম-বিজয়'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য) দৌলত-উজীরের পৃষ্ঠপোষক "নেজাম শাহা সুর" শের খান সুরের অর্থাৎ শের শাহের ভাই নিজাম খান সুরের সঙ্গে এবং পর্তুগীজ বিবরণীতে উল্লিখিত শের শাহের সেনাপতি নোগাজিলের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু দুই নিজামের মধ্যে এক নামসাদৃশ্য ছাড়া আর কোন মিল নেই ; শের শাহের ভাই নিজাম কোনদিন বাংলায় এসেছিলেন বলে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং "নিজাম"-এর সঙ্গে "নোগাজিল"-এর কোন ধ্বনিগত সাদৃশ্য নেই, কাজেই এ মত গ্রহণ করা যায় না।

ডঃ আহমদ শরীফের মতে দৌলত-উজীর ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'লায়লী-মজনু' রচনা করেন। তিনি চারটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন ('লায়লী-মজনু'-র ২য় সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ; তিনি বলেন,

(১) দৌলত উজীর ঔরঙ্গজেবের দেওয়া চট্টগ্রামের নতুন নাম ইসলামাবাদ-এর উল্লেখ করেন নি, অতএব তিনি ঔরঙ্গজেবের চট্টগ্রাম বিজয়ের পরে 'লায়লী-মজনু' লেখেন নি।

(২) 'বহারিস্তান গায়বী' গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের আমলে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী এক নিজামপুর পরগণার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় ; দৌলত-উজীরের পৃষ্ঠপোষক নিজাম শাহের নামে এই পরগণার নামকরণ হয়েছিল বলে ডঃ শরীফ মনে করতে চান।

(৩) দৌলত-উজীর লিখেছেন যে হামিদ খানের পরে চট্টগ্রামে

অনুক্রমে বংশ কথ গঞ্জিলেন্ত এই মত
গৌড়ের অধীন হইল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নেজাম শাহা সুর ॥

ডঃ শরীফের মতে "অনুক্রমে…এই মত" "অর্থে অল্পকালের মধ্যে গৌড় সিংহাসন ঘন ঘন হাত বদল হওয়া বোঝায়" এবং চট্টগ্রাম থেকে "গৌড়ের অধীনতা দূর হবার ঠিক পরেই নিজাম শাহ নৃপতি হয়েছিলেন।"

(৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মুহম্মদ মুকিম ও উনবিংশ শতাব্দীর কবি চুহর কয়েকজন সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী কবির নাম করেছেন, তার মধ্যে "নেই দৌলত উজিরের নাম। এতে মনে হয়, দৌলত উজির তাঁদের অনেক পূর্ববর্তী কবি।"

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য,

(১) ঔরঙ্গজেবের দেওয়া চট্টগ্রামের নতুন নাম 'ইসলামাবাদ' মোটেই চলে নি, তা ছাড়া কোন স্থানের নতুন নাম রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তা চালু হয় না ; কলকাতার বহু রাস্তার নতুন নাম বেশ কয়েক বছর চালু হবার পরেও লোকে এখনও ব্যবহার করে না ; তা ছাড়া দৌলত-উজীর 'লায়লী-মজনু'-তে হামিদ খানের আমলের "চাটিগ্রাম"-এর কথা লিখেছেন, তাকে 'ইসলামাবাদ' বলার কোন কারণ নেই।

(২) নিজামপুর পরগণার নামকরণ যে নিজামের নামে হয়েছিল সেই নিজাম কে, কী এবং কোন্ সময়ের লোক ছিলেন—তা যখন জানা নেই তখন তাঁকে এই প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না করাই বোধ হয় সমীচীন।

(৩) "অনুক্রমে বংশ কথ গঞ্জিলেন্ত এই মত"—এর অর্থ "অল্পকালের মধ্যে" কী করে হয়, বোঝা যাচ্ছে না। এর সহজ অর্থ—'অনেক পুরুষ পার হয়ে যাবার পরে', সুতরাং এটা স্পষ্টতই বহু দিনের ব্যাপার। "গৌড়ের অধীন …নেজাম শাহা সুর" উক্তি দ্বারা কবি—চট্টগ্রামে গৌড়ের অধীনতা দূর হয়ে

যাবার সঙ্গে সঙ্গেই "নেজাম শাহা" রাজা হলেন বলতে চাইছেন বলে মনে হয় না; 'গৌড়ের অধীনতা দূর হবার পরে কোন এক সময়ে নেজাম শাহা রাজা হলেন' বলাই কবির অভিপ্রেত বলে মনে হয়।

(৪) মুহম্মদ মুকিম ও চুহরের কবি-প্রশস্তিতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রত্যেকটি মুসলমান কবির নাম যখন নেই, তখন দৌলত উজীরের নাম না থাকা থেকে কিছু প্রমাণ হয় না। এমনিতেই কারও কোন বিষয়ের উল্লেখ না করা থেকে কিছু প্রমাণ হয় না।

ডঃ আবদুল করিম মনে করেন (বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০, পৃঃ ১-১৬ দ্রষ্টব্য), "নেজাম শাহা সুর" আরাকানরাজ নন, আরাকান-রাজের অধীনস্থ শাসনকর্তা; যেহেতু ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে আরাকানের রাজারা চট্টগ্রামে মগ শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন এবং যেহেতু ১৫৮৬ খ্রীঃ থেকে ১৬০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত চট্টগ্রামের কোন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায় না, অতএব "নেজাম শাহা সুর" ১৫৮৬ থেকে ১৬০৭ খ্রীঃর মধ্যে কোন এক সময়ে চট্টগ্রামের শাসন-কর্তা ছিলেন।

ডঃ করিমের এই মতে Begging the question নামে একটা fallacy আছে। অর্থাৎ তিনি প্রথমে "নেজাম শাহা"-কে আরাকানরাজের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে ধরে নিয়ে তারপরে তাঁর সময় অন্বেষণ করেছেন, এই ধরে নেওয়ার অনুকূলে কোন প্রমাণ তিনি দেন নি।

যা হোক্, ইতিপূর্বে আমরা যে আলোচনা করেছি, তার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত করছি—

(১) কবি বাহরাম খান "নিজাম শাহ" এই মুসলমানী নামধারী কোন আরাকানরাজের সমসাময়িক ছিলেন ও তাঁর কাছে অল্প বয়সে 'দৌলত-উজীর' খেতাব পেয়েছিলেন।

(২) ঐ খেতাব পাওয়ার কিছু পরে নিজাম শাহেরই রাজত্বকালে তিনি 'ইমাম-বিজয়' রচনা করেন।

(৩) এর অনেকদিন পরে শায়েস্তা খানের বাহিনীর চট্টগ্রাম-বিজয়ের (১৬৬৬ খ্রীঃ) পরে তিনি 'লায়লী-মজনু' রচনা করেন। তখন ঔরঙ্গজেবই বাহরাম খানের বাসভূমি চট্টগ্রামের সার্বভৌম অধীশ্বর; তাই কবি 'লায়লী-মজনু'-তে তাঁর প্রশস্তি রচনা করেছেন।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

কৃষ্ণরাম দাস

কৃষ্ণরাম দাস প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ও শক্তিশালী কবি। তিনি ছয়টি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন—চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল।

কৃষ্ণরামের বাড়ি ছিল কলকাতার কাছে নিমতায়। 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের সূচনায় কৃষ্ণরাম তাঁর বাসভূমি সম্বন্ধে লিখেছেন,

অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তায়।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যায়॥

আর এক জায়গায় কৃষ্ণরাম লিখেছেন,

ভাগীরথীর পূর্বতীর অপুরুব নাম।
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান॥

কৃষ্ণরামের সমস্ত কাব্যই জব চার্নকের কলকাতায় আসার আগে রচিত। সুতরাং কৃষ্ণরাম কর্তৃক 'কলিকাতা পরগণা'র উল্লেখ এবং 'কলিকাতা'র নাম করে নিজের জন্মস্থানের পরিচয় দেওয়া ইতিহাসের দিক্ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা এই বইয়ের পরিশিষ্টে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

কৃষ্ণরাম জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ভগবতী দাস।

কৃষ্ণরামের সমস্ত রচনার মধ্যে 'কমলামঙ্গল' (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল এর পুথি আবিষ্কার করে ডঃ সুকুমার সেনকে দিয়েছিলেন) সবচেয়ে আগে লেখা বলে মনে হয়। এ রকম ধারণার কারণ দু'টি। প্রথমত—'কমলামঙ্গলে' কবিত্বশক্তির নিদর্শন অল্প। দ্বিতীয়ত—কৃষ্ণরামের কাব্যের একটি বড় দোষ অশ্লীলতা; এই দোষ তাঁর গোড়ার দিকের রচনার তুলনায় পরবর্তী কালের রচনাতেই বেশি দেখা যায়; কিন্তু 'কমলামঙ্গলে' অশ্লীলতা আদৌ নেই।

তার পর 'কালিকামঙ্গল'। এটি আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ। এই কাব্যের

রচনাকালবাচক শ্লোকটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের ২৩৭৬ নং পুথিতে পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই,

সারসাসানের (সারসাসনের) নেত্র ভীমাক্ষিবর্জ্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল (শক) বিচারিয়া তবে॥

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই হেঁয়ালির সমাধান এইভাবে করেছেন,

"সারসাসন=পদ্মাসন অর্থাৎ ব্রহ্মা। তাঁহার চতুর্মুখে নেত্রসংখ্যা হইল ৮। মহাদেবের প্রসিদ্ধ নামাষ্টক মধ্যে একটি হইল 'ভীম'।...সুতরাং ভীমাক্ষি হইল ৩। আর মিত্র অর্থে দ্বাদশ সূর্য্য; ৩ বাদ দিয়া হইল ৯। ঋষির অর্থাৎ ৭ সংখ্যার পক্ষ অর্থাৎ ২ ত্যাগ করিলে পাওয়া যায় ৫ [বিধু=১]। সুতরাং শকাঙ্কটি হইল ১৫৯৮ (অর্থাৎ ১৬৭৬–৭৭ খ্রীঃ)।" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০, পৃঃ ৬৪)।

দীনেশচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন কোন উন্নাসিক গবেষক একে "কষ্টকল্পিত" বলেছেন। কিন্তু কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল যে ১৫৯৮ শকাব্দেই রচিত হয়েছিল, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার পশ্চিম বেলিয়া গ্রামে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের এক পুথি পেয়েছেন। এটি ১১৬৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। এই পুথিতে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পাওয়া যায় (অক্ষয়বাবুর অনুগ্রহে পুথিটি দেখার ও ছত্রগুলি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি),

সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাতা নাম তার
পরগণা অনুপম ক্ষিতি।
সাবর্ণি চৌধুরী জায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
পশ্চিমে আপনি ভাগিরথী॥
বলে কবি কৃষ্ণরাম নির্মিতা তাহার গ্রাম
জথা হৈল কালির মঙ্গল।
বসু নব বাণ ইন্দু সক এই গুণসিন্ধু
বিচারিয়া বুঝহ সকল॥

এখানে কৃষ্ণরাম স্পষ্টভাবে কালিকামঙ্গলের রচনাকাল জানিয়েছেন। "বসু নব বাণ ইন্দু সক" = ১৫৯৮ শক।

রচনাকালবাচক শ্লোকটির অব্যবহিত আগে কৃষ্ণরাম তৎকালীন "ক্ষিতিপাল" "অরং সাহা" অর্থাৎ ঔরংজেব এবং "নবাব সারিস্তা খাঁ" অর্থাৎ শায়েস্তা খানের নাম উল্লেখ করেছেন। ঔরংজেব সম্বন্ধে কৃষ্ণরাম লিখেছেন, "রাম রাজা সর্ব্বজনে বলে।" সব সমসাময়িক হিন্দুই যে ঔরংজেবকে অপছন্দ করত না, তা এর থেকে প্রমাণ হয়।

'কালিকামঙ্গল'-এর সূচনায় কৃষ্ণরাম বলেছেন যে এই বই লেখবার সময় অর্থাৎ ১৫৯৮ শকাব্দে তাঁর বয়স ছিল কুড়ি বছর,

সেই গ্রাম মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থকুলেতে উতপতি।
তাঁহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি॥

বাংলা রীতি অনুযায়ী কুড়ি বছর বয়স মানে জীবনের বিংশ বর্ষ। অতএব কৃষ্ণরাম ১৫৭৯ শকাব্দে (১৬৫৭-৫৮ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়; তা করে থাকলে ১৫৯৮ শকাব্দে তাঁর জীবনের বিংশ বর্ষ সুরু হয়। অবশ্য তিনি ১৫৭৮ শকাব্দের (১৬৫৬-৫৭ খ্রীঃ) শেষ দিকেও জন্মগ্রহণ করে থাকতে পারেন; তা করলে তাঁর বিংশ বর্ষের শেষাংশ ১৫৯৮ শকাব্দের গোড়ায় পড়ে। মোটের উপর, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরামের জন্ম হয়েছিল মনে করলে ভুল হবার সম্ভাবনা খুব কম।

কৃষ্ণরামের 'ষষ্ঠীমঙ্গল'-এর রচনাকাল "মহী শূন্য ঋতু চন্দ্র শক সংবৎসর" অর্থাৎ ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর 'রায়মঙ্গল'-এর রচনাকাল "বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র শকের বৎসর" অর্থাৎ ১৬০৮ শকাব্দ বা ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

'রায়মঙ্গল'-ই কৃষ্ণরামের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দক্ষিণ রায়ের কাছে স্বপ্নাদেশ পেয়ে কৃষ্ণরাম এই কাব্য রচনা করেন; স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির স্থান—বড়িশা। এই কাব্য শুধু যে শক্তিশালী হাতের রচনা, তা নয়—এর মধ্যে কবি সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়কে যেভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত করেছেন, তার তুলনা বিরল। কৃষ্ণরামের আগে যে মাধব আচার্য

নামে একজন কবি 'রায়মঙ্গল' লিখেছিলেন, তা 'রায়মঙ্গলে'র গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে দক্ষিণ রায়ের উক্তি থেকে জানা যায়,

পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের যে মাধব আচার্যের লেখা 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'গঙ্গামঙ্গল' আমরা পেয়েছি—তিনিই এই 'রায়মঙ্গল' রচনা করেছিলেন কিনা তা বলা যায় না। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, ধর্মপুরাণ প্রভৃতি ধারার প্রথম গ্রন্থগুলি (যথাক্রমে কানা হরিদত্ত, মাণিক দত্ত, ময়ূরভট্ট ও রামাই পণ্ডিতের লেখা) যেমন এখন আর পাওয়া যায় না, তেম্‌নি এই প্রথম 'রায়মঙ্গল'-এর চিহ্নও বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণরামের পরে রুদ্রদেব ও হরিদেব নামে দু'জন কবি 'রায়মঙ্গল' রচনা করেন। তাঁদের রচনার তেমন সমাদর হয় নি।*

কৃষ্ণরামের 'শীতলামঙ্গল' কবে রচিত হয়েছিল বলা যায় না—তবে 'রায়মঙ্গল'-এর আগে যে তা রচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর একটি ভনিতা এই,

রায়ের মঙ্গল কবি কৃষ্ণরামে গায়।
কেবা কি করিতে পারে শীতলা সহায়॥ †

এখানে যে "রায়ের" "মঙ্গল" কবি গেয়েছেন, তিনি দক্ষিণ রায় নন, শীতলা দেবীর পুত্র বসন্ত রায় (অর্থাৎ বসন্ত রোগ)।

* এঁদের মধ্যে রুদ্রদেবের কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নি. তাঁর সময়ও সঠিকভাবে জানা যায় না। হরিদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। হরিদেবের নিজের হাতে লেখা তাঁর 'রায়মঙ্গল'-এর সম্পূণ পুথি পাওয়া গিয়েছে ; তার লিপিকাল ১৬৫০ শকাব্দ বা ১৭২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দ। পুথিটি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এতে পুথির তারিখও দেওয়া আছে। প্রকাশিত গ্রন্থটি দেখবার পরেও (বা. সা. ই. ১। অ, ২য় সং, পৃঃ ৩০৮ দ্রঃ) ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন. "হরিদেব সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দের শেষে অথবা উনবিংশ শতাব্দের গোড়ায় বিদ্যমান ছিলেন।" কোন্ কারণে তিনি এই অদ্ভুত কথা বলেছেন, তা বোঝা গেল না।

† এই ভনিতাটি কোন কোন গবেষককে বিভ্রান্ত করেছে। তাঁরা মনে করেছেন কৃষ্ণরামের 'শীতলামঙ্গল' 'রায়মঙ্গল' কাব্যেরই অংশ বা পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত হয়েছিল। কিন্তু 'শীতলামঙ্গল'-এর সঙ্গে 'রায়মঙ্গল'-এর বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কোনই যোগ নেই। সুতরাং তা 'রায়মঙ্গল'-এর অংশ বা পরিশিষ্ট হতে পারে না। কৃষ্ণরামের 'শীতলামঙ্গল' একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন কাব্য।

এই ভনিতার* ঠিক আগেই কবি লিখেছেন,

ভাবিএ বসন্ত রায় চরণকমল ॥
শীতলায় ডাকে সাধু কাঁদিতে কাঁদিতে।
কাছে কর্ণধার বুক না পারে বাঁধিতে ॥

(ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২৭৬)

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কবি তখনও পর্যন্ত 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন নি অথবা রচনা করার কথা ভাবেন নি! এর আগে 'রায়মঙ্গল' রচিত অথবা পরিকল্পিত হলে 'শীতলামঙ্গল'-এর একটি অংশকে "রায়ের মঙ্গল" বলে কবি কখনই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেন না।

কৃষ্ণরাম দাসের লেখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অস্তিত্ব কিছুদিন আগে পর্যন্ত সকলের অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল এর একটি খণ্ডিত পুথি পেয়েছেন। তিনি 'সমকালীন' পত্রিকায় (পৌষ, ১৩৭৮, পৃঃ ৪৩৩-৩৭) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। অক্ষয়বাবু কৃষ্ণরামের কমলামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের পুথি এবং কালিকামঙ্গলের চূড়ান্ত রচনাকাল-নির্ধারক শ্লোক আবিষ্কার করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'চণ্ডীমঙ্গলে' কৃষ্ণরাম দাস লিখেছেন,

কালীর পাঁচালী আদি রচিনু সকল।
অধিক যতনে এই চণ্ডীর মঙ্গল ॥

এর থেকে বোঝা যায়, 'কালিকামঙ্গল' এবং আরও কয়েকটি বই লেখার পরে কৃষ্ণরাম চণ্ডীমঙ্গল লেখেন। সম্ভবত 'চণ্ডীমঙ্গল' তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ।

॥ আটত্রিশ ॥

রামগোপাল দাস

রামগোপাল দাস সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থকার। তিনি এই মূল্যবান্ গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন,

(১) শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী (সংক্ষেপে 'রসকল্পবল্লী',) (২) শ্রীচৈতন্য-তত্ত্বসার, (৩) পাটনির্ণয়, (৪) শাখানির্ণয়, (৫) অষ্টরসনিরূপণ।

তাঁর পুত্র পীতাম্বরদাসও 'অষ্টরসব্যাখ্যা' ও 'রসমঞ্জরী' নামে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

'রসকল্পবল্লী'তে রামগোপাল দাস নিজের দেশ, সমাজ, বংশ ও জীবন সম্বন্ধে যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার এই—

শ্রীখণ্ডে রাঘব সেন নামে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম বৈদ্যসমাজের সৃষ্টি করেন; এই বৈদ্যসমাজে অনেক পণ্ডিত, কবি ও সাধকের জন্ম হয়েছিল; এই সমাজেই যশরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি রাজসেবী কবিরা জন্মগ্রহণ করেন। এই সমাজেরই দুই ভাই চক্রপাণি চৌধুরী ও মহানন্দ ছিলেন "রঘুনন্দনের সেবক", তাঁরা নীলাচলে গিয়ে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। চক্রপাণির পুত্র নিত্যানন্দ, তাঁর পুত্র গঙ্গারাম, তাঁর পুত্র শ্যামরায় এবং তাঁর পুত্র মদনরায় ও রামগোপাল দাস। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের দরুন রামগোপাল দাস মা চন্দ্রাবলীর হাতে মানুষ হন। রামগোপাল দাসের মাতামহের নাম গৌরাঙ্গদাস; তাঁর পিতার নাম মধুসূদন, কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে তিনি "বাজন" করতেন এবং শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন তাতে নৃত্য করতেন। রঘুনন্দনের বংশধর রতিপতি বা রতিকান্ত রামগোপাল দাসের গুরু।

'রসকল্পবল্লী'র দ্বাদশ কোরকে রামগোপাল দাস গ্রন্থের রচনাকাল এইভাবে নির্দেশ করেছেন,

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শকে॥
সপ্ত মাস অবলম্বন কার্তিকে সংপূর্ণ।
বুধবার দীপযাত্রা হইল পরসন্ন॥

এর থেকে জানা যায় যে, ১৫৯৫ শকাব্দে (বাণ=৫, অঙ্ক*=৯, শর=৫, ব্রহ্ম=১) ১লা বৈশাখ তারিখে 'রসকল্পবল্লী'র রচনা আরম্ভ হয় এবং তার সাত মাস পরে কার্তিক মাসের দীপান্বিতার দিন বুধবারে এই গ্রন্থের রচনা শেষ হয়। ঐদিন ইংরেজী তারিখ ছিল ২৯শে অক্টোবর, ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। কোন কোন পুথিতে 'অঙ্ক'র জায়গায় 'অঙ্গ' (আঙ্কিক অর্থ ৬, কেউ কেউ ৮ ধরেছেন) পাওয়া যায়। কিন্তু ১৫৬৫ বা ১৫৮৫ শকাব্দে 'রসকল্পবল্লী' রচিত হয়নি, ১৫৯৫ শকাব্দেই হয়েছিল—তার দু'টি প্রমাণ § আছে ; সে দু'টি এই,

(১) ১৫৯৫ শকাব্দের কার্তিক মাসের অমাবস্যা বা দীপান্বিতা তিথি বুধবারেই পড়েছিল (১৫৬৫ বা ১৫৮৫ শকাব্দে তা পড়েনি)।

(২) বাঁকুড়া অঞ্চলের একটি পুথিতে 'রসকল্পবল্লী'র রচনাকাল বাংলা সনেও দেওয়া আছে,

সন হাজার উনাশি জাবনী বৎসর।
গ্রন্থ রচিল গোপাল দাস ভিসকবর ॥

"জাবনী (যাবনী) বৎসর" অর্থ এক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রবর্তিত ফসলী সন অর্থাৎ বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ। ১০৭৯ বাংলা সন ১৫৯৫ শকাব্দের সঙ্গেই মেলে †, ১৫৬৫ বা ১৫৮৫ শকাব্দের সঙ্গে মেলে না।

* 'অঙ্ক' শব্দের আঙ্কিক অর্থ ৯ (আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিরচিত 'আঙ্কিক শব্দ' প্রবন্ধ—সা. প.প. ১৩৩৬-এ প্রকাশিত, দ্রষ্টব্য)। 'সূর্যসিদ্ধান্ত', শতানন্দের 'ভাস্বতী' (১০২১ শক), গণেশ দৈবজ্ঞের 'গ্রহলাঘব' (১৪৪০ শক), 'জাতকার্ণবাদিকরণ গ্রন্থ' (১৪৪০-১৫১৩-১৫৭৯ শক), চন্দ্রশেখরের 'সিদ্ধান্তদর্পণ' (১৮১৪ শক), 'কবিকল্পলতা' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে 'অঙ্ক' শব্দের অর্থ ৯ বলা হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে কোথাও কোন ভিন্নমত নেই।

§ এই দু'টি প্রমাণই দিয়েছিলেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (সা. প. প. ১৩৪২, পৃঃ ৩৬, পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতপক্ষে 'রসকল্পবল্লী'র রচনা ১৫৯৫ শকাব্দে হয়েছিল বলে প্রতিপন্ন করার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য।

† বর্তমানে শকাব্দের সঙ্গে বাংলা সনের ৫১৫ বছরের তফাৎ, কিন্তু এক্ষেত্রে এই তফাৎ ৫১৬ বছরের ; আগে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে শকাব্দ ও বাংলা সনের পার্থক্যের হেরফের হত ; কোথাও ৫১৪ বছর, কোথাও ৫১৫ বছর, আবার কোথাও ৫১৬ বছর হত। ৫১৪ ও ৫১৬ বছর ব্যবধানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (১) রামেশ্বরের শিবায়নের একটি পুথির পুষ্পিকায় এই লিপিকাল পাওয়া যায়,

"শকাব্দ ১৬৭১ ইতি সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৫ই মাঘ রোজ বুধবার" (ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত 'বিচিত্র সাহিত্য', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫)।

সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন "অঙ্ক" অর্থে ২ ধরে 'রসকল্পবল্লী'র রচনাকাল ১৫২৫ শকাব্দে (১৬০৩ খ্রীঃ) নিয়ে যেতে চাইছেন (বা. সা. ই. ১। অ, ২য় সং, পৃঃ ২২-২৪ দ্রঃ)। তাঁর মত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রথমত, ১৫২৫ শকাব্দের দীপান্বিতা তিথি বুধবারে পড়েনি। দ্বিতীয়ত, 'রসকল্পবল্লী'তে 'নৃপ উদয়াদিত্য'র পদ আছে; এই উদয়াদিত্য যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র; প্রতাপাদিত্য ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মোগল বাহিনীর হাতে পরাজিত ও বন্দী হন; উদয়াদিত্য তখনই যুবক; রামগোপাল দাস তারও আট বছর আগে শ্রীখণ্ডে বসে যশোহর রাজ্যের তরুণ রাজপুত্রের পদ পেতে পারেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। তৃতীয়ত, 'অঙ্ক' শব্দের অর্থ 'দুই' কোন মতেই হতে পারে না; ডঃ সুকুমার সেন এর প্রতিশব্দ "কোল" ২ অর্থে "বেশি দেখা যায়" বলেছেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত দেবার সময়ে "সবে ধন নীলমণি" রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন ছাড়া আর কিছুর উল্লেখ করতে পারেন নি; রামেশ্বরের গ্রন্থের রচনাকালবাচক শ্লোকে ("শাকে হৈল চন্দ্রকলা রাম কৈল কোলে। বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥") উল্লিখিত 'কোল' আঙ্কিক শব্দ নয় (বর্তমান গ্রন্থের 'রামেশ্বর' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। চতুর্থত, রামগোপাল দাসের গুরু রতিকান্ত রঘুনন্দনের প্রপৌত্র বা আরও অধস্তন বংশধর *, রামগোপালের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রঘুনন্দনের সেবক এবং প্রমাতামহ রঘুনন্দনের কীর্তনসঙ্গী; রঘুনন্দন নিজে অন্তত ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং তাঁর কাকা নরহরি অন্তত ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এ অবস্থায় রঘুনন্দনের ৪।৫ পুরুষ পরবর্তী রতিকান্ত ও রামগোপাল ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে গুরু হিসাবে ও কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন—এ অসম্ভব। তা'ছাড়া 'রসকল্পবল্লী' লেখার সময়ে আরও এক পুরুষ পরবর্তী—রতিকান্তের তিনজন পুত্র শচীনন্দন, প্রাণবল্লভ, যাদবেন্দ্র ও একজন অনুজপুত্র (পুরুষোত্তম) প্রাপ্তবয়স্ক—রামগোপাল দাস তাঁদের "পাত্র

১৬৭১ শকের ৫ই মাঘ বুধবারেই পড়েছিল।

(২) বিশ্বভারতীর ১৫৯ নং পুথির পুষ্পিকায় এই লিপিকাল পাওয়া যায়,

"ইতি সন ১১৯৫ সালের আখেরি। তারিখ ২৯ জৈষ্ঠ, রোজ মঙ্গলবার। সক ১৭১১ সত্তের সত্ত এগার। লিখিতং কাসিনাথদাস বসু।" (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'পুঁথি পরিচয়', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯২)।

* রঘুনন্দন ও রতিকান্তের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামগোপাল দাসের বিবৃতি ('রসকল্পবল্লী', ক. বি. প্রকাশিত. পৃঃ ১৭ দ্রঃ) স্পষ্ট নয়।

অবশেষ" পাওয়ার কথা বলেছেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সম্ভব নয়। ডঃ সুকুমার সেন আলোচ্য প্রসঙ্গে এমন অনেকগুলি কথা বলেছেন, যাদের কোন ভিত্তি নেই, যেমন,

(১) তিনি লিখেছেন "বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম" "বামগতি না ধরিলে" ১৫৫২ হয়। 'শর ব্রহ্ম'তে বামগতি ধরলে 'বাণ অঙ্ক'-তে তা ধরা হবে না কেন? না ধরলে "অর্ধজরতী ন্যায়" হবে। সুতরাং, ১৫৫২ (শকাব্দ) র প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

(২) 'রসকল্পবল্লী'র একটি পুথির একটি উক্তির উপর নির্ভর করে সুকুমার-বাবু স্থির করেছেন যে, নীলাচলে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পাবার সময়ে চক্রপাণির "পুত্র তো বটেই পৌত্রও হইয়াছিল"। উক্তিটি এই,

মহানন্দকে কহেন বৈষ্ণব আকিঞ্চন।
সেবাধর্ম করি (তুমি) করহ সাধন॥
চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব।
পুত্রপৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব॥

কিন্তু এখানে মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন; চক্রপাণির পুত্রপৌত্রাদি তখনও কেউ জন্মায় নি। মহাপ্রভু যে ভবিষ্যদ্বাণীই করেছেন, তা রামগোপাল দাস 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে লিখেছেন,

চক্রপাণি মহানন্দ গেলা নীলাচল।
শ্রীগৌরাঙ্গে নিবেদন করিল সকল॥
ওহে চক্রপাণি তুমি সরকার-সেবক।
ভূমি পুত্র পৌত্র তব হইবে অনেক॥

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী', পৃঃ ২০৭ দ্রষ্টব্য।)

(৩) ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' চক্রপাণি ও তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম আছে এবং রঘুনন্দনের পুত্রের* নাম আছে। এ সব কথা একেবারে কাল্পনিক। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এঁদের কারও নাম নেই। ডঃ সেনের আর একটি কল্পনাপ্রসূত উক্তি—"রামগোপালের প্রমাতামহ মধুসূদন দাসও সেই সময়ে চৈতন্যের দেখা পাইয়াছিলেন"। "চক্রপাণি চৈতন্যের দর্শন ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই পাইয়াছিলেন"—ডঃ সেনের এই আপ্তবাক্যও

* ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, ''চৈতন্যচরিতামৃতে শাখাবর্ণনে রঘুনন্দনের পুত্র কানুঠাকুরের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।'' না, তা নেই। যে কানুদাসের নাম চৈতন্যচরিতামৃতের শাখাবর্ণনে সশ্রদ্ধভাবে উল্লিখিত, তিনি পুরুষোত্তম দাসের পুত্র বলে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়েছেন।

মানা যায় না। চৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট রঘুনন্দনের সেবক চক্রপাণি চৈতন্যদেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) খুব বেশি আগে চৈতন্যদেবের দর্শন পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

মোটের উপর, আগেকার প্রমাণগুলি থেকে যেমন, সময়ের স্বাভাবিক হিসাবেও তেমন—১৫৯৫ শকাব্দ বা ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দকেই রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'র রচনাকাল বলে গ্রহণ করতে হয়।

রামগোপাল দাস তাঁর 'পাটনির্ণয়' গ্রন্থেরও রচনাকাল জানিয়েছেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী', পৃঃ ২০১ দ্রষ্টব্য) গ্রন্থশেষের একটি শ্লোকে ; শ্লোকটি এইভাবে ছাপা হয়েছে,

সাত অঙ্কশ ব্রহ্ম সকল বসতি।
মধুমাস সোমবার শ্রীরামনবমী তিথি ॥

এর প্রকৃত পাঠ,

সাত অঙ্ক শর ব্রহ্ম শক নরপতি।*
মধুমাস সোমবার শ্রীরামনবমী তিথি ॥

সুতরাং ১৫৯৭ শকাব্দের (১৬৭৫-৭৬ খ্রীঃ) চৈত্রমাসে রামনবমী তিথিতে অর্থাৎ ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে রামগোপাল দাসের 'পাটনির্ণয়' সম্পূর্ণ হয়। ঐ দিন সোমবার ছিল।

আলোচনা শেষ করার আগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ ও বিচার করা দরকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র পাল লিখেছেন, "শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর ফরিদপুর নিবাসী তাঁহার এক প্রিয়পাত্র রামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গোপাল-দাসকে তাঁহার শিক্ষার ভার লইতে বলিয়াছিলেন। রামগোপালদাস রামচরণ চক্রবর্তীকে বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই রাধাকৃষ্ণ-রসকল্পবল্লী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।" এই কথা একেবারে কাল্পনিক, 'রসকল্পবল্লী'র রচনাকালের সঙ্গে রামগোপাল দাসের শ্রীনিবাসশিষ্যকে শিক্ষা দেওয়ার কোন সঙ্গতি নেই। প্রফুল্লবাবু তাঁর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির স্বপক্ষে নিদর্শনী দিয়েছেন রসকল্পবল্লী—পৃঃ ১৭৫'। ঐ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "আচার্য্যের প্রিয়

* 'রসকল্পবল্লী'র দু'বছর পরে লেখা এই গ্রন্থের রচনাকাল হুবহু 'রসকল্পবল্লী'র ঢঙেই কবি জানিয়েছেন।

রামচন্দ্র ঠাকুর" অর্থাৎ রামগোপাল দাসের নিজের গুরুর প্রিয় রামচন্দ্র ঠাকুর—'আচার্য' মানে এখানে শ্রীনিবাস আচার্য নয়; ঐ পৃষ্ঠাতেই রামচন্দ্র সম্বন্ধে রামগোপাল লিখেছেন,

প্রণাম করিয়ে আমি তাহার চরণে।
মোরে শিখাইতে তেহোঁ করিলেন কথনে ॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র চক্রবর্তীই রামগোপাল দাসের শিক্ষাগুরু, প্রফুল্লবাবুর মতানুযায়ী রামগোপাল "রামচরণের" শিক্ষাগুরু নন; এর পর রামগোপাল লিখেছেন, "সেই ক্রমে ভাষা কৈল"—অর্থাৎ রামচন্দ্র চক্রবর্তীর "কথন"-এর ক্রম অনুযায়ী রামগোপাল দাস 'রসকল্পবল্লী' রচনা করেছেন। প্রফুল্লবাবু প্রকৃত সত্যের একেবারে বিপরীত কথা লিখেছেন। "রামচন্দ্র চক্রবর্তী"কে "রামচরণ চক্রবর্তী" বলা প্রফুল্লবাবুর আর একটি ভুল। রামচন্দ্র চক্রবর্তীর বাসভূমি ফরিদপুর পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর নয়; এটি যে গঙ্গার তীরে অবস্থিত (স্বতই পশ্চিমবঙ্গের) একটি গ্রাম—সে কথা রামগোপাল দাস স্পষ্টভাবে লিখেছেন।

॥ উনচল্লিশ ॥

সনাতন চক্রবর্তী ও সনাতন ঘোষাল

আগেই বলেছি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ খুব বেশি পরিমাণে মেলে না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রায় একই নামের দুজন কবি ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম সনাতন চক্রবর্তী, অপরজনের নাম সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ।

এঁদের মধ্যে সনাতন চক্রবর্তীর অনুবাদের কথা আমরা কেবলমাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের উল্লেখ থেকে জানতে পারি। লালচাঁদ বিশ্বাস নামে একজন প্রকাশক ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের মূল ও সনাতন চক্রবর্তীর অনুবাদ একসঙ্গে প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮০ শকাব্দের আষাঢ় মাসের বিবিধার্থ সংগ্রহে (পৃঃ ৭২) তার সমালোচনা করে লেখেন, "এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে। যেহেতু সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালী পদ্য ইহাতে অতি সুচারুরূপে রক্ষা পাইয়াছে।" (বা. সা. ই ১।২, পৃঃ ৯০০ দ্রষ্টব্য)

এর পরে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকেও সনাতন চক্রবর্তীর গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তা দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন চক্রবর্তী নামক···একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। লেখক আওরঙ্গজীবের সঙ্গে সুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তক রচনার কাল-নির্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে উহার কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃঃ ৪৭২) বঙ্গবাসী কার্য্যালয় থেকে রঘুনাথ পণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ লেখেন, "সনাতন চক্রবর্তী সমগ্র ভাগবতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন" (পৃঃ ৩, পাদটীকা)।

অন্তত দুবার মুদ্রিত হলেও, এই গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন খবর আমরা দিতে পারলাম না। দীনেশবাবুর উক্তি থেকে কেবল এইটুকু মাত্র জানতে পারছি যে, ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের (১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নয়) এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, কারণ শুজার সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ হয়েছিল ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে।

এখন সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশের কথা বলি। ইনি 'কলিকাতা'র ঘোষাল বংশের কৃষ্ণানন্দের পৌত্র। কটকে থেকে 'ভাষাভাগবত' নাম দিয়ে তিনি ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক অনুবাদ করেন। এই তথ্যগুলি আমরা বিভিন্ন স্কন্ধের শেষে কবির উক্তি থেকে পাই। যেমন প্রথম স্কন্ধের শেষে,

কৃষ্ণপক্ষ রবি তিথি তৃতীয় প্রহরে।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটক নগরে॥

চতুর্থ স্কন্ধের শেষে,

কৃষ্ণানন্দ-তনয়-তনয় সনাতন।
বিরচিল ভাষাবন্ধ ভক্তের কারণ॥

নবম স্কন্ধের শেষে,

কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ।
তাঁর পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র॥
তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা।
ভাষা ভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা॥

বইএর 'ভাষা ভাগবত' নামটি এর অন্য বহু জায়গাতেও পাওয়া যায়।

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৫১ সালে পুরীতে এই গ্রন্থের পুথি পান এবং বিশ্বভারতীর পুথিশালায় তা দান করেন। তাঁর অনুরোধে আমি ১৯৫৩ সালে এই গ্রন্থের সম্পাদনা শুরু করি। প্রথম চার স্কন্ধের সম্পাদনা বহুদিন আগেই শেষ হয়েছে, নানা কারণে অবশিষ্ট পর্বগুলি সম্পাদনা করা বা গ্রন্থটি প্রকাশ করা এপর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

১৯৫৪ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের যুগান্তরে আমি 'কলকাতার প্রাচীনতম কবি (?)' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং তাতেই সনাতন ঘোষাল ও তাঁর 'ভাষাভাগবতে'র কথা প্রথম সর্বসাধারণের গোচর করা হয়। সনাতন ঘোষালের উপরে উদ্ধৃত আত্মপরিচয় থেকে কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে এই বইয়ের পরিশিষ্টে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

'ভাষাভাগবতে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বিভিন্ন স্কন্ধের রচনাকাল

কবি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তার মধ্যে দ্বিতীয় স্কন্ধের রচনাকাল সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়,

যোলশ ষোড়শ শাকে তৈষ শেষ হইতে।
সোমসুত দিনে নিশি সপ্তমী শেষেতে ॥

অর্থাৎ ১৬১৬ শকাব্দের পৌষ মাসের শেষে বা ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় স্কন্ধ সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম স্কন্ধের রচনাসমাপ্তিকাল কবি এইভাবে জানিয়েছেন,

কাল কলানিধি বিষ্ণুপদ কাল শশী।
শাকে মিত্র তুলা ধরে পদ্মকান্ত বসি ॥
কৃষ্ণপক্ষ রবি তিথি তৃতীয় প্রহরে।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটক নগরে ॥

এই শ্লোকের প্রথম "কাল" শব্দ সংখ্যাবাচক নয়, শব্দটি 'সময়' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তা হলে এর রচনাকাল "কলানিধিবিষ্ণুপদকালশশী" শকাব্দ। কলানিধি = চন্দ্র = ১, বিষ্ণুপদ = আকাশ = ০, কাল = ৬, শশী = ১। সুতরাং ১৬০১ শকাব্দের তুলা বা কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্কন্ধ সম্পূর্ণ হয়েছিল।

তৃতীয় স্কন্ধের রচনাসমাপ্তিকাল ১৬১৬ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ,

ঋতু চন্দ্র কাল শশী শাক পরিমিতে।
পঙ্কজনৃপতি বৈসে রুদ্র বাহনেতে ॥
শুক্ল পক্ষ তিথিতে দ্বাদশী নিরূপণ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধের সাত মাস আগেই তৃতীয় স্কন্ধ লেখা হয়েছিল।

চতুর্থ স্কন্ধের রচনাকাল ১৬১৮ শকাব্দের আষাঢ় মাস অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ,

বসু চন্দ্র ঋতু শশী শাক পরিমিতে।
নিবসেন পদ্মবন্ধু মিথুন রাশিতে ॥

পঞ্চম স্কন্ধের রচনাসমাপ্তিকাল ১৬১৮ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ,

গজ শশী রস চন্দ্র শাক পরিমিতে।
কমলিনীপতি বৈসে বৃশ্চিক রাশেতে ॥
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথি উশনা বাসরে ॥

নবম স্কন্ধের রচনাকাল,

গগন যুগল ঋতু সমুদ্রকুমার।
শাক পরিমিত বীর বিক্রম রাজার॥

গগন = ০, যুগল = ২, ঋতু = ৬, সমুদ্রকুমার = চন্দ্র = ১। সুতরাং ১৬২০ শকাব্দে বা ১৬৯৮—৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নবম স্কন্ধ সম্পূর্ণ হয়েছিল। অবশ্য "যুগল ঋতু" = ৬৬ বলে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তাহলে নবম স্কন্ধের রচনাকাল প্রথম স্কন্ধ রচনার ৬৫ বছর পরে হয় এবং কবিকে অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘজীবী ধরতে হয়। সুতরাং এ ব্যাখ্যা টেঁকে না। "গগন যুগল" = দু'টি শূন্যও ধরা যায়। সেক্ষেত্রে বলতে হবে কবি ১৬০০ শকাব্দ বা ১৬৭৮–৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নবম স্কন্ধ রচনা করেন, তারপর প্রথম স্কন্ধ ও তারপর অন্যান্য স্কন্ধ রচনা করেন। এ ব্যাপার অসম্ভাব্য হলেও অসম্ভব নয়। নবম স্কন্ধের শেষে কবি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সম্ভবত রঘুনাথ পণ্ডিতের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'তে ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক অনুবাদ নেই বলেই সনাতন ঘোষাল এই অভাব মোচনের চেষ্টা করেছেন।

সনাতন ঘোষালকে কেউ যেন সনাতন চক্রবর্তীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে না করেন। কারণ প্রথমত দীনেশবাবুর উক্তি অনুযায়ী সনাতন চক্রবর্তীর গ্রন্থ-রচনাকাল ১৬৫৯ খ্রীঃ। সনাতন ঘোষালের গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধের রচনাকাল তার ২০ বছর পরবর্তী। দ্বিতীয়ত, বসন্তরঞ্জন রায় সনাতন চক্রবর্তী কর্তৃক সমগ্র ভাগবতের অনুবাদেরই উল্লেখ করেছেন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ দেখেছিলেন। কিন্তু সনাতন ঘোষাল নয় স্কন্ধের পরে আর অনুবাদ করেছিলেন বলে মনে হয় না। তৃতীয়ত, আমরা সনাতন ঘোষালের গ্রন্থের সমস্ত ভনিতা তন্ন তন্ন করে দেখেছি, কোথাও 'সনাতন চক্রবর্তী' নাম পাই নি। সুতরাং একমাত্র জোর করে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দুই কবিকে অভিন্ন বলা যায় না।

॥ চল্লিশ ॥

ব্রজমোহন দাস

ব্রজমোহন দাস 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ' নামে যে চৈতন্যচরিতগ্রন্থ রচনা করেন, তার একখানি পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে (পুথি নং ১৬৭৩) বলে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম জানান ; তিনি এই অপ্রকাশিত গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতও করেছেন। (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা, পৃঃ ৯৪ এবং যুগান্তর, ৮ই মার্চ, ১৯৫৫ দ্রঃ)।

এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জন্মের তারিখটি বার, মাস ও তিথি সমেত সঠিক-ভাবে পাওয়া যায়।

শাকে চৌদ্দশত আর সপ্ত বৎসর।
বিষ্ণুবিংশতি তৃতীয় বৎসর অন্তর॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা বার রবিসুত জান।
ত্রয়োবিংশ দিনে আবির্ভাব ভগবান॥

মহাপ্রভুর বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে এই গ্রন্থের বর্ণনা এই,

গঙ্গাদাস দ্বিজস্থানে পড়িবারে দিল।
অল্পে অধ্যাপক প্রভু সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল॥
পড়িল সকল বিদ্যা করি গুরু লক্ষ্য।
অষ্টাদশ বিদ্যাএতে প্রভু হৈলা দক্ষ॥

এই বইতে বাসুদেব সার্বভৌমের একটি নতুন বচনও পাওয়া যায়,

শুন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বচন।

তথাহি—অবতরতি জগত্যাং কৃষ্ণচৈতন্যদেবে
ন ভবতি বিমলা ধীর্যস্য তস্যৈব ন স্যাৎ।
উদয়তি দিননাথে সৎপথে যস্য দৃষ্টি (ঃ)
প্রসরতি নহি কিম্বা তস্য শঙ্কা তমিস্রে॥

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বৃন্দাবনদাস ও মুরারির চরিতগ্রন্থ ইহার উপাদান এবং গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে চৈতন্যচরিতামৃতের (১৩।১ পত্রে) এবং 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী'র বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।"

১৯৭২-এর ডিসেম্বর মাসের শেষে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে ডঃ আহমদ শরীফের সাহায্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় গিয়ে ব্রজমোহন দাসের 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ'-এর পুথিটি স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করি।

পুথিটি পড়ার পরে দেখতে পেলাম, এই বইটি ঠিক চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ নয়। পুথির ১ থেকে ৪০ ক পত্রে পাটনির্ণয় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের শেষে আরও দু'টি অংশ আছে—(১) শাখাবর্ণন (৪০ ক—৪৪ ক পত্র), (২) চৈতন্যজীবনীর সংক্ষিপ্তসার (৪৪ ক—৫০ খ পত্র)।

কাব্যের আরম্ভ কবি এইভাবে করেছেন,

ওঁ নম শ্রীকৃষ্ণায় ॥

* * *

প্রণাম করিয়া আগে গুরুর চরণে।
দীক্ষাশিক্ষাপ্রকাশ করেই যেই (জ) নে॥
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ সংক্ষেপেতে।
সপ্রমাণে পয়ারে কহিব সাধুমতে॥

গ্রন্থের মধ্যে কবি মাঝে মাঝে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত এবং মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন ২১ খ পত্রে,

এই পদ চৈতন্যভাগবতে স্থনি।
দাস বৃন্দাবন দীর্ঘছন্দেত বাখানি॥
অতএব চৈতন্যচরিতামৃতে স্থনি।
রায় দেখে রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন হই পুনি॥

আবার শেষ পত্রে,

সংক্ষেপতে স্থত্র চৈতন্যের লীলা গাথা।
পারিষদভক্ত সঙ্গে কৈল যেই যথা॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে কৈল বর্ণন॥
মুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত।
তাহাতে দেখিয়া স্থত্র লেখিয়ে কিঞ্চিত।
আদিখণ্ডে মধ্যখণ্ডে শেষখণ্ডে আর।
তার স্থত্র সংক্ষেপতে করিব বিস্তার॥

এই গ্রন্থের মধ্যে কবির ভনিতা খুব কমই পাওয়া যায়। একটি ভনিতা নীচে উদ্ধৃত হ'ল :—

বৈষ্ণব কৃপায়ে প্রেমধন পায়ে
অশেষ তাপ বিনাশে।
এ ব্রজমোহন দাস পুনপুন
প্রণময়ে বহু আশে॥
(৪থ পত্র)

কবি গ্রন্থ শেষ করেছেন এই বলে,

ধৈরজ ধরিয়া চিত্তে রহিতে না পারি।
সদা গৌরগুণ গাই স্তুনি মনে করি।
বন্দিয়া চৈতন্যচান্দের চরণ মাধুরী।
এ ব্রজমোহন দাস গ্রন্থ পূর্ণ করি॥
ইতি শ্রীচৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে সাঙ্গোপাঙ্গ গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥

এই বইটি আজও অপ্রকাশিত রয়েছে বলে এর কিছু পরিচয় দিলাম। ডঃ আহমদ শরীফকে বইটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে অনুরোধ জানিয়ে এসেছি। বইটির মধ্যে নিত্যানন্দ, বৃন্দাবনদাস ও তাঁর মা নারায়ণী, গোপাল বসু এবং নরহরি দাস ঠাকুর সম্বন্ধে নতুন সংবাদ পাওয়া যায়। এই বইয়ের মধ্যে যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ ও বিচার করেছি।

ব্রজমোহন দাসের 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে' যখন 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উল্লেখ ও উদ্ধৃতি রয়েছে, তখন এ বই ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছুকাল পরে রচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার এর পুথির পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে পুথিটির লিপিকাল "শকাব্দাঃ ১৬২৫ তেরিখ ১৩ ফাল্গুন" অর্থাৎ ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। স্বতরাং 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়েছিল বলে ধরা যায়।

॥ একচল্লিশ ॥

কয়েকজন অপ্রধান কবি

শিবরাম ঘোষ

শিবরাম ঘোষ ছয় পর্ব মহাভারত লিখেছিলেন (পৃঃ ১৮৬ দ্রঃ)। তা ছাড়া তাঁর লেখা দু'খানি কাব্যের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। প্রথমটির নাম কালিকামঙ্গল, যদিও কাব্যের বিষয়বস্তু বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ সিংহাসনের গল্প। "ইহাতে বত্রিশ সিংহাসনের গল্পের মধ্য দিয়া কালীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে। তাই ইহার নাম কালিকামঙ্গল। পুত্তলিকাগুলির নামের মধ্যেও কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। দুঃখের বিষয় প্রাপ্ত পুথিখানি অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাতে সমস্ত পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী পাওয়া যায় না। মাত্র বারটি পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী ইহাতে আছে। কাহিনীগুলিতে কালী-ভক্ত বিক্রমাদিত্যের পূর্ব ও বর্তমান জীবনের বৃত্তান্ত আনুপূর্বী অনুসারে বিবৃত হইয়াছে—কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনার বর্ণনামাত্র ইহাদের উপজীব্য নয়।" (সা. প. প. ১৩৪৯, পৃঃ ১৩০) অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর একাধিক প্রবন্ধে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্যটির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এর পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে (নং ১৫৫৮)।

শিবরাম ঘোষের আর একটি রচনা 'একাদশীর পাঁচালী'। এর ১১৭৩ সালের (১৭৬৬-৬৭ খ্রীঃ) পুথি পাওয়া গিয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ১০৪৫-এ) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। 'কালিকামঙ্গল' ও 'একাদশীর পাঁচালী'র রচয়িতা যে অভিন্ন, তার প্রমাণ আমরা দিচ্ছি। 'কালিকামঙ্গলে' "রাজেন্দ্র ঘোষের সুত, রচিল কৌতুকে" ও "রাধিকানন্দন শিবরাম ঘোষ ভনে" উক্তি পাওয়া যায় (সা. প. প. ১৩৪৯, পৃঃ ১৩৯)। আর 'একাদশীর পাঁচালী'তে আছে,

> বাপ রাজেন্দ্র ঘোষ রাধিকা জননী।
> মহাগুরু দুইজন বন্দো পুটপাণি ॥

দুটি রচনাতেই যখন কবির পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ এবং মাতার নাম রাধিকা বলে উল্লিখিত হয়েছে, তখন দুটির কবি নিশ্চয়ই অভিন্ন।

'কালিকামঙ্গলে' কবির সময়ের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। কিন্তু একাদশীর পাঁচালীতে পাওয়া যায়,

শশি শূন্য রস অগ্নি শকের বৎসর।
পাৎসা অরং সাহা ডিল্লি ঈশ্বর ॥

এখানে স্পষ্টই অঙ্কের দক্ষিণা গতি। ডঃ সুকুমার সেন ভ্রমবশত 'শক' অর্থে বঙ্গাব্দ ধরেছেন এবং "রচনাকাল ১০৬৩ সাল (১৬৫৬-১৬৫৭)" বলেছেন। কিন্তু ১৬৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে "অরং সাহা" অর্থাৎ ঔরঙ্গজেব ছিলেন না, ছিলেন শাহ্‌জাহান। অতএব এখানে শুদ্ধ পাঠ নিঃসন্দেহে "শশী রস শূন্য অগ্নি শকের বৎসর" ছিল। ১৬০৩ শক বা ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দই 'একাদশীর পাঁচালী'র রচনাকাল, ঐ বৎসরে "ডিল্লি ঈশ্বর" ছিলেন ঔরঙ্গজেবই।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতসম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর বাঙালী প্রজাদের কাছে যে "অরং সাহা" বা "আওরঙ্গ সাহা" নামে পরিচিত ছিলেন—তা আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারছি। শুধু শিবরাম ঘোষ নন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি দৌলত-উজীর বাহরাম খান এবং ২৪ পরগনার নিমতা গ্রামের কবি কৃষ্ণরাম দাসও ঔরঙ্গজেবকে এইভাবেই অভিহিত করেছেন। এই তিনজন কবিই ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক।

যাদুনাথ

'ধর্মের গীত' কাব্যগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আখ্যান-কাব্য, আবার কতকগুলি পুরাণ-জাতীয়। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনাগুলিকে ধর্মপুরাণ বলা হয়। এর আগে রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যা, সহদেব ও লক্ষ্মণের লেখা ধর্মপুরাণ পাওয়া গিয়েছে। এদের চেয়েও প্রাচীন একখানি ধর্মপুরাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ধর্মপুরাণটির তিনখানি পুথি বিশ্বভারতীর পুথিশালায় আছে। এর লেখক যাদুনাথ, যদুনাথ ও যাদব পণ্ডিত তিন নামেই ভনিতা দিয়েছেন, তবে যাদুনাথ নামেই বেশিবার দিয়েছেন।

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'পুঁথি-পরিচয়' প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ২২০-২২১) এই ধর্মপুরাণটির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বার হয়েছিল। পরে সম্পূর্ণ বইটি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটি থেকে জানা যায় যে,

কবির দামোদর এবং বিনোদনাথ নামে দুই পূর্বপুরুষ ছিলেন। এঁদের নিবাস ছিল 'দোম' (দোমজুড় ?) গ্রামে,

দামোদর পতি পিতা দোমেতে আলয়।
পুণ্যবান বিনোদনাথ তাহার তনয়॥
হতমূর্খ যদুনাথ তাহার সন্ততি।
সংখেপে রচিলাম প্রভুর মঙ্গল ভারতী॥

কবির পিতার নাম ধর্মদাস। একথা আমরা জানতে পারি এই দুটি ভনিতা থেকে,

"কহে ধর্ম্মদাসের নন্দন।"
"ধর্ম্মদাসের সুত ধর্ম্মপথে অনুগত
লইতন (নূতন) মঙ্গল সুরচনে।"

সম্ভবত কবির পিতামহের নাম বিনোদনাথ এবং প্রপিতামহের নাম দামোদর।

যাদুনাথ তাঁর রচনাকে "ধর্ম্মের মঙ্গল" ও "ধর্ম্মপুরাণ" দুই নামেই অভিহিত করেছেন। কিন্তু কাব্যের মধ্যে সৃষ্টিপত্তনাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বলে একে 'ধর্মপুরাণ' নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এবারে এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করছি। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'পুঁথি-পরিচয়ে'র প্রথম খণ্ডে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকলেও এর রচনাকাল সম্বন্ধে সেখানে কোন কথা বলা হয়নি। অথচ তাতে যে ভনিতাগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, তাদের একটিতে আছে,

"প্রভুর কৃপার ফলে মদনা ঋতু ক্ষিতি তলে
যাদব পণ্ডিতে ভনে।"

এখানে "মদনা ঋতু ক্ষিতি" উক্তি দ্ব্যর্থবোধক বলে মনে হয়। উক্তিটির বাহ্য অর্থে রানী মদনার প্রসঙ্গই ব্যক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু উক্তিটির অন্ত অর্থ শকাব্দের এবং গ্রন্থের রচনাকালের সূচক বলে মনে করি। মদন=১৩, ঋতু=৬, ক্ষিতি=১। সুতরাং ১৬১৩ শকাব্দ বা ১৬৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই অংশ লেখা হয়েছিল মনে করা যেতে পারে।

আমাদের এই ধারণার সমর্থন গ্রন্থের আর এক জায়গা থেকেও পাচ্ছি।

১৯৫৫ সালে আমি এই গ্রন্থের পুথি পরীক্ষা করি। দেখি তার এক জায়গায় লেখা আছে,

> ষুন এ ভকত ভাই কর অবধান।
> জখন সমাপ্ত এই ধর্ম্ম পুরাণ॥
> খেত্রি বংসেতে জর্ম্ম নাম কৃষ্ণরাম।
> প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে জার নাম॥
> কৃষ্ণরামের নামে পাপতাপবিমচনে।
> চিরকাল রাজুতি করেন বর্দ্ধমানে॥
> মরিল বলরাম রায় য়রাজক পুরি।
> সেইকালে কৃষ্ণরাম নিল বসুন্দরি॥
> ভার্য্যা বন্দি দাষ হয়ে করোরি তাহার।
> সেইকালে গিত সাঙ্গ হইল আমার॥

অর্থাৎ কৃষ্ণরাম যখন বর্ধমানের রাজা হন, সেই সময়ে যাদুনাথের ধর্মমঙ্গল বা ধর্মপুরাণ সমাপ্ত হয়। কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে আমরা জানি যে তিনি "১৬৯৪ খৃঃ (১১০৭ হিজরি) ২৪ রবিয়ল আয়ল তারিখে দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বের ৩৮ বর্ষে (জুলুস) তাঁহার নিকট হইতে চাকলে বর্দ্ধমানের জমিদার ও চৌধুরিপদের সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।" (বিশ্বকোষ, সপ্তদশ ভাগ, পৃঃ ৬১৯)

ভারতসম্রাটের এই সনদ হচ্ছে কৃষ্ণরামের অধিকার লাভের চূড়ান্ত স্বীকৃতি, এই স্বীকৃতি তিনি ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লাভ করলেও তাঁর অধিকার লাভ তার আগেই হয়েছিল সন্দেহ নেই। যাদুনাথও পূর্বোদ্ধৃত ভনিতাটি লেখার কিছুদিন বাদে কাব্য সম্পূর্ণ করেন। সুতরাং ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে কৃষ্ণরাম বর্ধমানের রাজা হন এবং যাদুনাথ ধর্মপুরাণ সম্পূর্ণ করেন।

উপরে উদ্ধৃত অংশটির "ভার্য্যা বন্দি দাষ হয়ে করোরি তাহার" চরণটির অর্থ দুর্বোধ্য। 'ভার্য্যা বন্দি দাষ'-এর প্রকৃত পাঠ সম্ভবতঃ 'ভায়্যা বন্দিদাস'। 'করোরি' শব্দের অর্থ খাজাঞ্চি। সুতরাং চরণটির মানে দাঁড়াচ্ছে—যখন কৃষ্ণরামের ভাই বন্দিদাস তাঁর খাজাঞ্চি হয়।* কৃষ্ণরাম রাজা হয়ে সঙ্গে-সঙ্গে এই "বন্দিদাস"কে তাঁর কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন।

* রণটির আরও নানারকম অর্থ করা যায়; কেউ কেউ ইতিমধ্যেই তা করেছেন। কিন্তু কোন অর্থেরই সমর্থক কোন তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের লেখা দুখানি বই এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে রামলীলা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৩১ নং পুথি)। এতে কবি লিখেছেন,

ফুলিয়া বংশের মণি স্থষেণ পণ্ডিত।
তাঁহার সন্তান দ্বিজ রচিল সঙ্গীত॥

এর থেকে কেউ কেউ কবিকে স্থষেণ পণ্ডিতের পুত্র মনে করেছিলেন। কিন্তু 'সন্তান' শব্দে বংশধরও বোঝায়। কবি যে স্থষেণ পণ্ডিতের পুত্র নন, কয়েক পুরুষ পরবর্তী বংশধর, তা জানা যায় তাঁর অপর গ্রন্থ 'ভবানীমঙ্গল' থেকে। এতে কবি নিজের বংশপরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন,

ফুলিয়া কুলের মণি স্থষেণ পণ্ডিত গণি ক্রমে কহি সন্ততির নাম।
শিবাচার্য্য গোপেশ্বর বিশ্বেশ্বর তার পর জনার্দন-স্থত রামরাম॥
নিবাস ম্যাটারী গ্রাম পিতামহ রামরাম তিতুরাম তাহার নন্দন।
তার স্থত নাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ উমা-গীত করিল রচন॥

উপরের বিবরণ থেকে এই বংশলতা পাওয়া যাচ্ছে,

স্থষেণ পণ্ডিত—শিবাচার্য—গোপেশ্বর—বিশ্বেশ্বর—জনার্দ্দন—রামরাম—তিতুরাম—গঙ্গানারায়ণ।

স্থষেণ পণ্ডিত থেকে গঙ্গানারায়ণ অধস্তন অষ্টম পুরুষ। হরিদাস যখন চৈতন্যদেবের আহ্বানে নীলাচলে যান (আঃ ১৫১৬ খ্রীঃ), তখন স্থষেণ পণ্ডিত জীবিত ছিলেন বলে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে জানা যায়। স্থতরাং গঙ্গানারায়ণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন।

দ্বিজ মুকুন্দ কবিচন্দ্র

দ্বিজ মুকুন্দ কবিচন্দ্রের 'বাশুলীমঙ্গল'-এর ভাষা খুবই আধুনিক। "শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা (বা গণিতে)" যদি এই কাব্যের রচনাকাল-নির্দেশক হয় (পৃঃ ১৫৬-৫৮ দ্রঃ), তা হলে এর সমাধান হবে এই রকম,

শাকে 'রস' (৬), সেই 'রসে' 'বেদ' (৪), তাতে 'শশাঙ্ক গণিতা'= চন্দ্রকলা (১৬)। ১৬৪৬ শক=১৭২৪-২৫ খ্রীঃ এই কাব্যের রচনাকাল হতে পারে।

॥ বেয়াল্লিশ ॥

খেলারাম চক্রবর্তী

অনেকের ধারণা, খেলারাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি। এই ধারণার কারণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দের 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বলেছিলেন যে, তিনি খেলারামের ধর্মমঙ্গলের একটি প্রাচীন পুথি দেখেছেন এবং তার থেকে তিনি এর রচনাকাল-নির্দেশক এই দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছিলেন,

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ॥

ভুবন = ১৪, বায়ু = ৪৯। সুতরাং ১৪৪৯ শক = ১৫২৭-২৮ খ্রীঃ খেলারামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু "ভুবন শকে বায়ু" এ কোন্ ধরনের প্রয়োগ? খেলারামের ধর্মমঙ্গলের আরও কয়েকটি পুথি নগেন্দ্রনাথ বসু দেখেছিলেন বলে 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে রচনাকালজ্ঞাপক এই ছত্রগুলি ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে খেলারাম নামক ধর্মমঙ্গল-রচয়িতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে হারাধন দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ বসু—এই দুজন মাত্র লোকের সাক্ষ্যের উপর। ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা'র ৪র্থ সংস্করণ (পৃঃ ৮৫) থেকে জানা যায় যে, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল মহোদয় খেলারামের বাসভূমি বলে পরিচিত পশ্চিমপাড়া গ্রামে গিয়ে এক বৃদ্ধের মুখে এই দুটি ছত্র শুনেছিলেন,

খেলারাম চক্রবর্তী শণ কাটিছেন বসে।
ধর্ম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠরোগীর বেশে॥

এই দুই ছত্র কিন্তু রূপান্তরিত আকারে প্রচলিত ছড়ার মধ্যেও পাওয়া যায় (আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে প্রকাশিত কয়েকটি ছড়া-সংগ্রহের মধ্যেও ছত্র দু'টি পেয়েছি),

নিধিরাম চক্রবর্তী শন কাটিছেন বসে।
খেলারাম ভট্টাচার্য্য উত্তরিলা এসে॥

যা হোক, হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি খেলারামের রচনার নিদর্শনস্বরূপ যে ছত্রগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন, তার ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখলে বোঝা যাবে,

খেলারামের ধর্মমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর রচনা হতে পারে না। তার কয়েকটি ছত্র আমরা উদ্ধৃত করছি,

স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে।
সুরম্য সরসী এক তার মাঝে ঝলে॥
কমল কুমুদ আদি নানা ফুলফল।
বিকাশিয়া ভূষে তার নীল উরঃস্থল॥
শুন বাছা লাউসেন বলি রে তোমায়।
এওজাত দিও নেড়া দেউল তলায়॥

এ ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগেকার হতে পারে না। ভাষার দিক্ দিয়ে বিচার করলে যেমন খেলারামের ধর্মমঙ্গল এই সময়ের আগে রচিত হয় নি বলা যায়, অন্য দিক্ দিয়ে বিচার করলে তেমনি খেলারামকে এর বেশি পরবর্তী বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে সুরিক্ষার পাটের বন্দীদের তালিকায় প্রচ্ছন্নভাবে যে ক'জন পূর্ববর্তী কবির নাম করেছেন, তার মধ্যে কৃত্তিবাস, নরোত্তম, নিধিরাম, গোবিন্দ, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, চণ্ডীদাস, নরহরি প্রভৃতির সঙ্গে খেলারামেরও নাম পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কারণে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় "ভুবন শকে বায়ু মাস" শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই সমীচীন বলে মনে হয়। তিনি বলেন, "গ্রন্থকার সম্ভবতঃ শতাব্দীর উল্লেখ করেন নাই, কেবল মাত্র বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন 'বাহাত্তর সালের বন্যা,' 'ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর' ইত্যাদি। বায়ু মাস শব্দে সপ্তম মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস বুঝাইতে পারে। 'শরের বাহন' বোধ হয়···কার্ত্তিক মাসেরই দ্যোতক। তাহা হইলে শতাব্দীটি ইহাতে আন্দাজে জুড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি ১৬১৪ শক ধরা যায়, তাহা হইলে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।"

আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক ঐ সময়েই ধর্মমঙ্গলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক খেলারামের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত যাদুনাথের ধর্মপুরাণের একটি ভনিতায় পাচ্ছি,

বন্দিয়া পণ্ডিত রাম যাদুনাথ ভনে।
খেলারামে ধর্ম্মরাজ রাখিবে কল্যাণে॥

এর কিছু আগে—১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের একটি পুথিতে রূপরামের গায়ন হিসাবে জনৈক খেলারামের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে,

খেলারাম গাএন করিল বহু হিত।
হাতে যন্ত্র দিঞা শিখাইল নাটগীত ॥
ধর্ম্মের চরণে মাগিঞা নিএ বর।
খেলারামের কল্যাণ করিবে মায়াধর ॥
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়।
হরিধ্বনি বল সভে পালা হল্য সায় ॥

(বা. সা. ই. ১।অ, ২য় সং, পৃঃ ১৫৩)

আমাদের মনে হয়, যে খেলারাম রূপরামের গায়ন ছিলেন, তাঁরই সঙ্গে 'ধর্মপুরাণ'-রচয়িতা যাদুনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাই যাদুনাথ ভনিতায় তাঁর কল্যাণ কামনা করেছেন ; এই খেলারামই ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। সুতরাং বসন্তবাবুর অনুমিত ১৬১৪ শক বা ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দই খেলারামের ধর্মমঙ্গলের প্রকৃত রচনাকাল বলে আমরা মনে করি।

॥ তেতাল্লিশ ॥

ঘনরাম চক্রবর্তী

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলই সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হবার সুযোগ লাভ করে। সাহিত্যরসের দিক দিয়ে এইটিই শ্রেষ্ঠ ধর্মমঙ্গল কাব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। আয়তনের দিক দিয়েও বোধহয় এইটি সমস্ত ধর্মমঙ্গলকাব্যের মধ্যে বৃহত্তম।

মুদ্রিত গ্রন্থের শেষে এই রচনাকালসূচক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

> শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।
> মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
> সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
> যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি॥

এর প্রথম ছত্র থেকে ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১-১২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই সময়ের সমর্থক অন্য প্রমাণও আছে। কাব্যের মধ্যে তিনি বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের কল্যাণ কামনা করেছেন,

> অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্রপ্রধান।
> চিন্তি তার রাজ্যোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি দ্বিজ ঘনরাম রস গান।

কীর্ত্তিচন্দ্র ১৭০৩ থেকে ১৭৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

'শক লিখে রামগুণ' ইত্যাদি শ্লোকটিকে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের আদ্য অংশে হংস—সূর্য্য ছিলেন (১লা কি ২রা), শুক্রবার, সুলক্ষণ শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি। পাঁজি গণিয়া দেখিতেছি, ১৬৩৩ শকে ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্ল তৃতীয়া। ১লা হওয়াতে 'আদ্য অংশ'ও বটে। 'যাম সংখ্য দিনে'—যাম অর্থে প্রহর। এক প্রহর বেলার সময় সঙ্গীত সাঙ্গ হয়।" (প্রবাসী, ১৩৩৬, পৃঃ ৬৪১) সুতরাং ঐ তারিখে অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল সমাপ্ত হয়েছিল।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হলেও তার বহু আগেই আরম্ভ হয়েছিল। এত আগে যে, কবি বলেছেন, "সঙ্গীত আরম্ভকাল নাহিক স্মরণ।" এই রকম বিরাট একটি কাব্য, যাকে দীনেশচন্দ্র সেন "কবির অধ্যবসায়ের এক

বিরাট দৃষ্টান্ত" বলেছেন, তা লিখতে এরকম সুদীর্ঘ কাল লাগাই স্বাভাবিক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা শুরু করেছিলেন বলে মনে হয়।

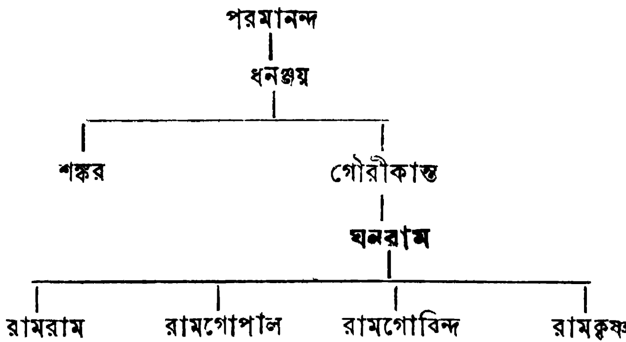
ঘনরাম চক্রবর্তীর আর একখানি বই হচ্ছে 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' বা 'সত্যনারায়ণরসসিন্ধু'। কেউ কেউ এটিকে কবির প্রথম বয়সের রচনা বলে মনে করেন, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়, কারণ এই বই-এ কবির চারজন পুত্রেরই নাম পাওয়া যায়। 'সত্যনারায়ণে'র পাঁচালীতেও রাজা কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ আছে ("দ্বিজভক্ত মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়।") সুতরাং এই বইও ১৭০৩ থেকে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "ঘনরাম ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।" দীনেশবাবু এই তারিখ পেয়েছেন সম্ভবত কবির বংশধরের কাছ থেকে। এরকম ধারণার কারণ, তিনি ঘনরামের একজন জীবিত বংশধরের উল্লেখ করেছেন। এই তারিখ সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়।

ঘনরাম যে রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর 'ধর্মমঙ্গলে'র বহু স্থান থেকে পাওয়া যায়। 'সত্যনারায়ণরসসিন্ধু'তে তিনি সত্যনারায়ণকে উদ্দেশ করে বলেছেন—"শ্রীরামপদারবিন্দে দিবে মোর মতি।" তাঁর পুত্রদের প্রত্যেকের নাম আরম্ভ 'রাম' দিয়ে—রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ এবং রামকৃষ্ণ। 'ধর্মমঙ্গল'-এর ভনিতায় তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন "প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্।" এ ছাড়া নিজেকে তিনি "শ্রীরামদাসের দাস" অর্থাৎ রামচন্দ্রের ভৃত্যের ভৃত্যও বলেছেন। ঘনরাম রামচন্দ্রের আদেশে ধর্ম-মঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন বলে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে (বা. সা. ই. ১। অ, ১ম সং, পৃঃ ১৮১ দ্রষ্টব্য)। ডঃ সুকুমার সেনের মতে এই কাহিনী ঘনরামের অধুনালুপ্ত আত্মকাহিনীর "মর্ম"।

ঘনরাম শুধু মঙ্গলকাব্য নয়—বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যেরও কবি। তাঁর লেখা পনেরটি সুন্দর বৈষ্ণব পদ 'পদকল্পতরু'তে সঙ্কলিত হয়েছে। জনপ্রিয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত পদকর্তা না হলে তাঁর এতগুলি পদ 'পদকল্পতরু'তে স্থান পেত না। সে দিক দিয়ে ঘনরামই একমাত্র কবি, যিনি মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী-সাহিত্য —প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই দুই ধারাতেই সম্মানিত আসন লাভ করেছেন।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের ভনিতা থেকে ঘনরাম সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। তাঁর বংশলতিকা এই,



ঘনরামের মাতার নাম সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ঘনরাম নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, "মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।" এর থেকে বোঝা যায় তাঁর জননীর নাম সীতা। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ঘনরামের মাতার নাম সীতা নয়, মহাদেবী। তিনি যদি রাজরানী হইতেন তবে, 'মহাদেবী' বিশেষণ ধরা চলিত। নিতান্ত গৃহস্থ নারীর বিশেষণ 'মহাদেবী' মনে করা চলে না।" কিন্তু তখনকার দিনে লোকে নিজের মাকে রাজরানীর চেয়েও বেশি সম্মান করত এবং তাঁকে "নিতান্ত গৃহস্থ নারী" বলে তাচ্ছিল্য করত না। এই কারণে ডঃ সুকুমার সেনের মত মানা চলে না। ডঃ সেন এরপর লিখেছেন, " 'সীতা' নামও তখন চলিত না, কেন না কন্যা সীতার মত দুঃখিনী হইবে ইহা তখন কোন মাতাপিতা ভাবিতে পারিত না।" এই মত খুবই অদ্ভুত। ডঃ সেন বোধহয় ভুলে গিয়েছেন যে অদ্বৈতের পত্নীর নাম ছিল 'সীতা'। সুতরাং ঘনরামের জননীর নাম যে 'সীতা'ই ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল'-এর ভনিতা থেকে আরও জানা যায় যে, তাঁর বাড়ি ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে। তাঁর মাতুলালয় ছিল রায়নায় এবং মাতামহের নাম ছিল গঙ্গাহরি পৌষম্বান্ বংশে ঘনরামের জন্ম। ঘনরাম (মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের কাছ থেকে ?) 'কাব্যরত্ন' উপাধি লাভ করেছিলেন।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

ফয়জুল্লা

ফয়জুল্লা নামক কবির ভনিতায় 'গোরক্ষবিজয়', 'জয়নবের চৌতিশা' ও 'সত্যপীরের পাঁচালী'—এই তিনটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া 'মীর ফয়জুল্লা' ভনিতায় 'রাগনামা' এবং কতকগুলি বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায়। সেগুলিও এঁর রচনা বলে মনে হয়। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট রচনা। কিন্তু এর রচয়িতা কে এবং রচনাকাল কী, সে সম্বন্ধে এক বিরাট সমস্যা ছিল। এর বিভিন্ন পুথির ভনিতা এক রকম নয়। তাদের মধ্যে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন এবং ভীমসেন রায় —নানা লোকের ভনিতা পাওয়া যায়। 'গোরক্ষবিজয়'-এর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ১৬টি পুথির মধ্যে ১৪টিতেই ফয়জুল্লার ভনিতা এবং ৯টি পুথিতে কেবলমাত্র ফয়জুল্লার ভনিতা মেলে। এই কাব্যের বিভিন্ন পুথিতে (এমন কি যে-সব পুথিতে ফয়জুল্লার ভনিতা নেই, তাদের মধ্যেও) এত বেশী আরবী-ফার্সী ও মুসলমানী-বাংলা শব্দ পাওয়া যায়, যার থেকে বোঝা যায়, এই কাব্য মুসলমানের লেখা। তাছাড়া এনামুল হক সাহেব ২৪ পরগণার বারাসত অঞ্চলে কতকগুলি পুথির পাতার মধ্যে এই অংশটুকু পেয়েছিলেন,

গোর্খবিজএ আছে মুনি সিদ্ধা কত।
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত ॥
খোঁটাদূরের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজি ॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন ॥
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন ॥

এই সমস্ত কারণে ফয়জুল্লাকেই গোরক্ষবিজয় কাব্যের রচয়িতা বলে স্বীকার করতে হয়। উদ্ধৃত অংশে ফয়জুল্লার 'সত্যপীর'-কথার রচনাকাল পাওয়া যায় ১৪৬৭ শক=১৫৪৫-৪৬ খ্রীঃ। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী, এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও কোন সত্যপীরের পাঁচালী তো দূরে থাক, বাংলা সাহিত্যে সত্যপীরের

কোন উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফয়জুল্লা সত্যপীরের পাঁচালী লিখতে পারেন বলে ভাবা যায় না।

গোরক্ষবিজয়ের ভাষাকে আমি এক সময় প্রাচীন ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন বিশদ বিচার করে বুঝতে পারছি, এই ভাষা কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীর হতে পারে না। এর কতকগুলি জায়গা উদ্ধার করে দেখাচ্ছি, তাদের মোটা অক্ষরে লিখিত অংশগুলিতে আধুনিকতার ছাপ কত স্পষ্ট,

(১) তবে যদি পৃথিবীতে আইল হরগৌরী।
মীননাথ হাড়িফাএ করএ **চাকরী**॥

(২) নারী লইয়া যত সবে গৃহবাস করে।
রাধাকানু বঞ্চিলেক পৃথিবী ভিতরে॥

(৩) দিনে দিনে **বেশ হইব** সমপতি বাড়িয়া যাইব
তবে যাইব কাথা আর ঝুলি।

এই অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত নয়, কারণ সমস্ত পুথিতেই এগুলি পাওয়া যায়।

অতএব ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় বা সত্যপীরের পাঁচালী কোনটিই ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হতে পারে না। সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল "মুনি রস বেদ শশী" পাঠকে ডঃ সুকুমার সেন ভ্রান্ত মনে করেন, তাঁর মতে শুদ্ধ পাঠ ছিল "মুনি বেদ রস শশী" শক (= ১৬৪৭ শক = ১৭২৫-২৬ খ্রীঃ)। এই মত গ্রহণ-যোগ্য বলে মনে হয়। সত্যপীরের পাঁচালীর আগে গাজীবিজয়, এবং তারও আগে গোরক্ষবিজয় রচিত হয়েছিল। অতএব ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গোরক্ষবিজয় কাব্য রচিত হয়েছিল বলে আপাতত সিদ্ধান্ত করা যায়।

গোরক্ষবিজয় কাব্যের যে সমস্ত পুথি পাওয়া গিয়েছে, তাদের কোনটিই উনবিংশ শতাব্দীর আগেকার নয়। আবদুল করিম সাহেব সংগৃহীত একটি পুথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল। করিম সাহেব 'সাল' অর্থে বঙ্গাব্দ ধরেছিলেন, যা ১৭৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সমান। কিন্তু পুথিটি চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। সুতরাং এই ১১৮৪ 'সাল' মঘী সন হবারই বেশি সম্ভাবনা। তাহলে পুথিটিকে ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা বলতে হয়। পুথিগুলি উনবিংশ শতাব্দীর হলেও এদের ভণিতায় যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়, তা ১০০ বছরের আগে হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। এ দিক্ দিয়েও ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে গোরক্ষ-বিজয়ের রচনাকাল নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত হয়।

'গোরক্ষবিজয়' সংক্রান্ত আর দু-একটি বিষয়ের এই উপলক্ষে আলোচনা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'গোরক্ষবিজয়'কে কেউ কেউ 'গোর্খবিজয়' বলেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, এই কাব্যের কোনও পুথিতে 'গোরক্ষ' নাম পাওয়া যায় না, সর্বত্র 'গোর্খ' (বা 'গোর্ক্ষ') নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শব্দটি যদি মূলে 'গোরক্ষ' হয় তাহলে পুথিতে কি পাওয়া গেল না গেল সে প্রশ্ন গৌণ। ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটকেও যখন 'গোরক্ষ' নাম পাই তখন বুঝতে হবে এইটিই মূল শব্দ। বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র 'গোরক্ষ' শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, যেমন গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে,

গোরক্ষনাথ মহাযোগী মীননাথের শিষ্য।
নানা যত্ন করিলেক গুরুর উদ্দেশ্য ॥

গোরক্ষবিজয়ের কাহিনীকে "খাস বাঙ্গালার গল্পকাহিনী" এবং এ কাহিনী "বাহিরে আবিষ্কৃত হয় নাই"—এমন কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলার বাইরে লেখা মিথিলার বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটকের সংবাদ বহু দিন আগেই প্রচারিত হয়েছিল, এখন সমগ্র নাটকটিই প্রকাশিত হয়েছে।

আগেই বলেছি, 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে ফয়জুল্লা ছাড়া কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন এবং ভীমসেন রায়েরও নাম পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "ভীমসেন রায় ও ভীমদাস একই ব্যক্তি মনে করা যাইতে পারে। 'কবীন্দ্রদাস' ভীমসেনের অথবা শ্যামদাসের নামান্তর হওয়া বিচিত্র নয়।" আমি এই মত সমর্থন করি। অধিকন্তু আমি মনে করি যে, ভীমদাস বা ভীমসেন রায় এবং শ্যামদাস সেন একই লোক। আবদুল করিম সম্পাদিত 'গোরক্ষ-বিজয়ে'র ভূমিকায় যে সমস্ত ভনিতা উদ্ধৃত হয়েছে, তার থেকে দেখা যায়, কোন কোন পুথিতে "কহে হীন ভীমদাসে" ভনিতা আছে এবং অন্য কোন কোন পুথিতে "কহে সেন শ্যামদাসে" ভনিতা আছে। লিপিকর-প্রমাদে "হীন ভীমদাস", "সেন শ্যামদাস"-এ পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। আমার মনে হয়, "হীন ভীমদাস" থেকে প্রথমে হয়েছিল "সেন ভীমদাস" এবং তার থেকে হয়েছিল "সেন শ্যামদাস" এবং "ভীমসেন রায়"। সুতরাং কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন ও ভীমসেন রায় মূলে একই লোক ছিলেন বলে মনে করা যায়। ইনি সম্ভবত 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের গায়ন ছিলেন। এঁর বিভিন্ন নামের ভনিতাযুক্ত পুথি উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় ইনি

ফয়জুল্লার সমসাময়িক গায়ন এবং গ্রন্থরচনায় সহযোগী ছিলেন, পরে তাঁর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের নামে এই গীতিকা প্রচার করেন।*

উপরে যে আলোচনা করা হল, তা মোটামুটিভাবে 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' (১৯৫৮) গ্রন্থের 'চুয়াল্লিশ' সংখ্যক অধ্যায়ের সঙ্গে অভিন্ন। সাম্প্রতিককালে ফয়জুল্লা ও গোরক্ষবিজয় সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র শীত সংখ্যা ১৩৬৮তে জনাব আলী আহ্‌মদের লেখা "'গোরক্ষবিজয়ে' কবি ফয়জুল্লার ভণিতা" নামে একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়,

(১) ফয়জুল্লার বংশগত উপাধি ছিল 'মীর'। জনাব আলী আহ্‌মদ কর্তৃক উদ্ধৃত ২৬টি ভনিতার মধ্যে ১৪টিতেই 'মীর ফয়জুল্লা' ভনিতা পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক উদ্ধৃত কয়েকটি ভনিতাতেও ফয়জুল্লার 'মীর' উপাধি পাওয়া গিয়েছিল। 'মীর ফয়জুল্লা' ভনিতাযুক্ত 'রাগনামা' ও 'পদাবলী' যে এঁরই লেখা, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

(২) ফয়জুল্লাই 'গোরক্ষবিজয়'-এর আসল রচয়িতা; তাঁর মুখে শুনে (অর্থাৎ তাঁর dictation অনুযায়ী) কোন এক ব্যক্তি কাব্যটিকে কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করেন। এই ব্যক্তি নিজেই সে কথা এই ভাবে জানিয়েছেন,

মন দিয়া সুন মির ফজুল্লার বাণি।
গোর্খের বিজএ কথা তন্ত্রের কাহিনী॥
মাতা পিতা পির গুরু এক মনে মানি।
সুনিয়া রচিল যোগ তন্ত্রের কাহিনী॥
লেখিত পাপিষ্ট কহে সুন সভাভরি।
গোর্খের বিজএ কথা কি লেখিতে পারি॥

* এমনও হওয়া সম্ভব যে, 'গোরক্ষবিজয়'-এর এই আদি গায়ন কোন এক সময়ে ফয়জুল্লাকে 'কবীন্দ্র' এবং নিজেকে 'কবীন্দ্রদাস' বলে কাব্যের মধ্যে ভনিতা দিয়েছিলেন—যার চিহ্ন কোন কোন পুথিতে পাওয়া যায়। পরে "কহেন কবীন্দ্রদাসে" ভনিতা লিপিকর প্রমাদে "কহে হীন ভীমদাসে" হয়েছে এবং তারও পরে "হীন ভীমদাস" উপরে বর্ণিত উপায়ে "সেন শ্যামদাস" ও "ভীমসেন রায়"-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

পরুয়ার ঠাই কহি বিনএ বচন।
সুসার করিবা সুনি অশুদ্ধ লিখন ॥
পড়ুয়া পণ্ডিত তুমি জ্ঞানবন্ত য়তি।
সুচরিতে লিখিবার কি মর শকতি ॥
লেখিত পাপিষ্ট মতি কি লেখিতে জানি।
মন দিয়া সুন মির ফয়ুল্লার বাণি ॥

এই উক্তিগুলি কোন একটি পুথির লিপিকরের নয়, গ্রন্থের মূল অনুলেখকের—তার প্রমাণ, অন্তত দু'টি পুথিতে এই অংশটি সম্পূর্ণভাবে (সাহিত্য পত্রিকা, ঐ সংখ্যা, পৃঃ ১৪৯, পৃঃ ১৫৩) এবং আর একটিতে পুথিতে আংশিকভাবে (প্রথম ছয় ছত্র) পাওয়া যায়।

আমাদের মনে হয়, এই অনুলেখকই 'গোরক্ষবিজয়'-এর আদি গায়ন—যাঁর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এবং যিনি বিভিন্ন পুথিতে কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন, ভীমসেন রায়—প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়েছেন।

তারপর, ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়' ও 'সত্যপীরের পাঁচালী'র রচনাকাল সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে ছত্রগুলি উদ্ধৃত করেছি ("গোর্খবিজএ আগে মুনি সিদ্ধা কত" ইত্যাদি), তাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধেও সংশয় দেখা দিয়েছে। এই ছত্রগুলির উপর "অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ" করার জন্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সমালোচনা করেছিলেন এবং লিখেছিলেন, "কোন প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে এরূপ একটি নিশ্ছিদ্র প্রমাণপঞ্জীর লুপ্তরত্নোদ্ধার খুব বিরল ও আশাতীত দৈবপ্রসাদ বলিয়াই ঠেকে।" (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৩, পৃঃ ১১৯)।

ছত্রগুলির প্রামাণিকতায় সন্দেহের আরও কারণ, ফয়জুল্লার 'সত্যপীরের পাঁচালী'র (ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড ও 'ইসলামী বাংলা সাহিত্যে' এর কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে) একটিমাত্র পুথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে (পুথিটি বর্তমানে বর্ধমান সাহিত্য সভার সংগ্রহে আছে)* এবং তাতে এই ছত্রগুলি নেই। তাছাড়া, 'গোরক্ষবিজয়ে'র প্রায় সমস্ত পুথি পূর্ববঙ্গে ও দু'একটি পুথি উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়েছে এবং ঐ কাব্যের ভাষাতেও পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব দেখা যায়; পক্ষান্তরে ফয়জুল্লার 'সত্যপীরের পাচালী'তে

* কয়েক বছর আগে বর্ধমানে গিয়ে আমি পুথিটি নিজে পরীক্ষা করে এসেছি।

পশ্চিমবঙ্গের ভাষার প্রভাব দেখা যায় ; এর লেখক পশ্চিমবঙ্গের 'খানাকুল'-এর "ঠাকুর গোপীনাথ" ও মান্দারণের ইসমাইল গাজীর বন্দনা করেছেন এবং শিয়াখালা (হুগলী জেলা), চাঁপাই (বর্ধমান জেলা) প্রভৃতি স্থানের নাম করেছেন ; তাঁর বাড়ি ছিল 'পাচনা' বা 'পাচলা'য় (হাওড়া জেলার 'পাঁচলা' ?) তাঁর নামের বানানও 'ফৈজল্যা', 'গোরক্ষবিজয়'-এর কোন পুথিতে এ বানান পাই না। সুতরাং এই কবি গোরক্ষবিজয়-রচয়িতা থেকে পৃথক লোক বলে মনে হয়।

পূর্বোক্ত ছত্রগুলি যদি প্রামাণিক না হয়, তা হলে 'গোরক্ষবিজয়'-এর রচনাকাল বিচারে এদের কোন মূল্য থাকে না। যা হোক্, ছত্রগুলির সাক্ষ্যকে বাদ দিয়েও—'গোরক্ষবিজয়'-এর ভাষা ও ভনিতা বিচার করে আমরা ইতিপূর্বে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এই কাব্য ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত বদলাবার কোন কারণ নেই।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েনের একটি উক্তির প্রতিবাদ করতে চাই। অধ্যাপক সাকলায়েনের মতে আমি নাকি এই মত ব্যক্ত করেছি যে "শেখ ফয়জুল্লাহ্ উনবিংশ শতাব্দীর লোক।" (বাংলার মর্সীয়া সাহিত্য, পৃঃ ১৮০)। কিন্তু আমি কোথাও এ কথা লিখি নি। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ব্যবহৃত ১১৮৪ সালের পুথিটি যে ১১৮৪ মঘী সন তথা উনবিংশ শতাব্দীর হওয়ার বেশি সম্ভাবনা, এই কথাই 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'-এ (পৃঃ ২৬৩) লিখেছিলাম।

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহোদয় তাঁর সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়'-এর ভূমিকায় অনুমান করেছেন যে কোন এক অজ্ঞাতনামা কবি এই কাব্য রচনা করেছিলেন, কাব্যে তাঁর ভনিতা ছিল না, পরে গায়নরা নিজেদের ভনিতা বসিয়ে দিয়েছেন —অর্থাৎ ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন, ভীমসেন রায় প্রভৃতি সকলেই গায়নমাত্র। কিন্তু এই অভিমত যদি সত্য হত, তা হলে প্রত্যেকটি পুথির কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানেই ভনিতা পাওয়া যেত না, সেক্ষেত্রে গায়নরা নিজেদের খুশিমত যে যেখানে ইচ্ছা ভনিতা দিতেন। সুতরাং যাঁদের ভনিতা পাওয়া যাচ্ছে,* তাঁদেরই কেউ যে এই কাব্যের রচয়িতা—এই সিদ্ধান্ত করতে হয় এবং ফয়জুল্লাই যে এই কাব্য রচনা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে।

* ডঃ শহীদুল্লার মতে, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়'-এ জ্ঞাননাথের ভনিতা আছে। কিন্তু আসলে তা নয়—সেখানে 'গোরক্ষনাথ বললেন' অর্থে 'জ্ঞাননাথে বলে' লেখা হয়েছে।

'গোরক্ষবিজয়'-এর রচয়িতা ফয়জুল্লা 'গোরক্ষবিজয়' ও কিছু বৈষ্ণব পদ ছাড়া আর কী রচনা করেছিলেন, সে প্রশ্ন বেশ জটিল। 'জয়নবের চৌতিশা' নামে ক্ষুদ্র কাব্যখানি এঁরই লেখা (এর ভনিতা—"শেখ ফয়জুল্লা কহে জয়নব কথন। স্বর্গে কান্দে হুর সব কান্দে সখিগণ॥*) বলে মনে হয়। কিন্তু 'সত্যপীরের পাঁচালী' যে স্বতন্ত্র লোকের লেখা হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি। ডঃ এনামুল হক সংগৃহীত পূর্বোক্ত ছত্রগুলিতে ফয়জুল্লা বলছেন যে তিনি 'পীর' ইসমাইল গাজীর কাহিনী অবলম্বনে 'গাজী-বিজয়' লিখেছিলেন। এ কথা সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। এমন হতে পারে যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে কোন একজন লোক ফয়জুল্লা বিরচিত 'গোরক্ষবিজয়' ও 'সত্যপীরের পাঁচালী'র কথা জানত (যা আসলে দুই পৃথক কবির লেখা), সে-ই এই দুই কাব্যের সঙ্গে কাল্পনিক 'গাজীবিজয়'-এর একত্র উল্লেখ করে ও একটি কাল্পনিক রচনাকালবাচক শ্লোক তৈরী করে পূর্বোক্ত ছত্রগুলি লিখেছিল।

দয়াল নামে একজন কবি ছফর আলী নামে এক ব্যক্তির আদেশে একখানি 'গোরক্ষবিজয়' রচনা করেছিলেন।† এই বইয়ের সঙ্গে ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়'-এর ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়ে খুব বেশি মিল থাকলেও কতকটা স্বাতন্ত্র্য আছে। দয়াল লিখেছেন,

> আইছে খণ্ড অর্দ্ধ ছিল পুস্তক প্রবন্ধ।
> তান আজ্ঞা সিরে ধরি পুরাই সুছন্দ॥

এর থেকে মনে হয় যে, দয়াল ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়'-এর একটি পুথির আধখানা পেয়েছিলেন, এবং ছফর আলীর আদেশে তাকেই সম্প্রসারিত করে পূর্ণাঙ্গ কাব্যের রূপ দেন।

---

* অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন রচিত 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য', পৃঃ ১৭৭ দ্রষ্টব্য।

† ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি-পরিচিতি' পৃঃ ১৩১-১৪০ দ্রষ্টব্য।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

রামেশ্বর

রামেশ্বর ভট্টাচার্য বাংলার শ্রেষ্ঠ 'শিবায়ন' (বা 'শিবসঙ্কীর্তন') কাব্যের রচয়িতা। অবশ্য তিনিই আদি শিবায়ন-রচয়িতা নন। তাঁর আগে 'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী রামকৃষ্ণ নামে একজন কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একখানি শিবায়ন রচনা করেছিলেন। এছাড়া 'কবিচন্দ্র' উপাধিধারী আরও একজন কবি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীরসিংহের রাজত্বকালে (১৬৫২-৮২ খ্রীঃ) একখানি শিবায়ন কাব্য রচনা করেছিলেন। রামেশ্বর যে এঁদের পরবর্তী কবি, তা পরবর্তী আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে।

রামেশ্বরের শিবায়নের ১৬৭১ শকাব্দের ৫ই মাঘ বা ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা পুথি পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থের রচনাকালের এইটিই নিম্নতম সীমা। বহু পুথিতে ও ছাপা সংস্করণে এই রচনাসমাপ্তিকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

শকে হৈল চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥

রামেশ্বরের শিবায়নের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে (১৮৭৪) "ঐ শকের স্থলে অঙ্কদ্বারা ১৬৩৪ শক নিবেশিত" ছিল। শ্লোকটি থেকে এই শকাঙ্ক নির্ণয় করা শক্ত। রামগতি ন্যায়রত্ন "অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও" শ্লোকটির অর্থ করতে পারেন নি। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় চন্দ্রকলা = ১৬, রাম = ৩, কর = ২ ধরে ১৬৩২ শকাব্দ এই গ্রন্থের রচনাকাল ধরেছিলেন (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, পৃঃ ৩৪৮)। শ্লোকটির দ্বিতীয় ছত্রের 'অনল' শব্দের আঙ্কিক অর্থকে (= ৩) আচার্য রায় উপেক্ষা করেছেন। সুতরাং তাঁর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না।

রামেশ্বর লিখেছেন যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ও তাঁর পুত্র যশোমন্ত সিংহ। রামসিংহের রাজত্বকালে তাঁরই আদেশে রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-এর রচনা শুরু হয় এবং রামসিংহের মৃত্যুর পরে যশোমন্ত সিংহের রাজত্বকালে তা শেষ হয়। অম্বিকাচরণ গুপ্ত তাঁর 'হুগলী' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৬-৮৭) কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন এবং ১৭১১ থেকে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন বলেছেন।

যশোমন্ত সিংহ যদি ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে থাকেন, তা' হলে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' সম্পূর্ণ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে—কারণ সেক্ষেত্রে বলতে হয় যে ১৭১১ খ্রীঃর প্রথম তিন মাসের মধ্যেই যশোমন্ত সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং রামেশ্বরের গ্রন্থও সম্পূর্ণ হয়েছিল ; এরকম মনে করার কোন কারণ নেই।

আসলে—উপরে রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-এর রচনাকালবাচক শ্লোকের যে পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে, তা ভুল ; কতকগুলি পুথিতে এর এই পাঠান্তর পাওয়া যায় (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, পৃঃ ৩৪৮ দ্রঃ),

শকে হৈল চন্দ্রকলা রাম কৈল কোলে।*
বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে ॥

এইটিই ঠিক পাঠ। এর থেকে আমরা ১৬৩৩ শকাব্দ (চন্দ্রকলা = ১৬, রাম = ৩, অনল = ৩) অর্থাৎ ১৭১১-১২ খ্রীষ্টাব্দ পাচ্ছি। এই বছরেই রামেশ্বরের 'শিবায়ন' সম্পূর্ণ হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় যশোবন্ত রায় নামে একজন বিখ্যাত লোকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সরকারে মুনশী এবং মুর্শিদকুলির দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর অভিভাবক-শিক্ষক ছিলেন। পরে শুজাউদ্দীনের আমলে যখন সরফরাজ খাঁ নায়েব-নাজিমের পদ লাভ করেন, তখন যশোবন্ত রায় ঢাকায় দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং চালের দর টাকায় আট মণে নামিয়ে দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন (History of Bengal, D. U., Vol. II, p. 427)। রামগতি ন্যায়রত্ন মনে করেছিলেন যে এই যশোবন্ত রায়ই রামেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক যশোবন্ত সিংহ।

ন্যায়রত্ন মহোদয়ের ধারণার পক্ষে বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নেই, বরং বিরুদ্ধে যুক্তি আছে। রামেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক ও ঢাকার যশোবন্তের মধ্যে স্থানের দিক্ দিয়ে মিল নেই, নামের দিক্ দিয়েও সম্পূর্ণ ঐক্য নেই।* মেদিনীপুরের হিন্দু ভূস্বামী মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাব-দৌহিত্রের অভিভাবকত্ব ও শিক্ষকতা করবেন এবং

* আশ্চর্যের বিষয়, এক্ষেত্রে 'কোল' শব্দটিকে কেউ কেউ আঙ্কিক শব্দ বলে মনে করেছেন। কিন্তু 'কোল' কোন দিক্ দিয়েই আঙ্কিক শব্দ হতে পারে না। 'কোলে করতে দু' বাহু লাগে, অতএব কোল = ২', বলে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে—তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

* একজনের নাম যশোমন্ত সিংহ, অপরজনের নাম যশোবন্ত রায়।

ঢাকায় গিয়ে দেওয়ানী করবেন—বিনা প্রমাণে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। অতএব এই দু'জনকে অভিন্ন লোক বলে গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তীর প্রসাদে ডঃ সুকুমার সেন রামেশ্বরের জীবৎকাল সম্বন্ধে একটি নতুন তথ্য পেয়েছেন। সেটি তাঁরই ভাষায় নীচে উদ্ধৃত করছি,

"১১৫১ সালের ২১শে আষাঢ় তারিখে রামেশ্বর মহাভারত হইতে রাজধর্ম অংশের পুঁথি লেখা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পুথিটি 'শ্রীশ্রীযুত মহারাজাধিরাজ জসমস্ত সিংহস্য'। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রামেশ্বর এবং যশোমন্ত দুই জনেই জীবিত ছিলেন।" (বা. সা. ই. ১।অ. ১ম সং, পৃঃ ৬০৭)

রামেশ্বর তাঁর আত্মকাহিনীতে ও বিভিন্ন ভনিতায় অনেক আত্মীয়স্বজনের নাম করেছেন। তাঁর পিতা লক্ষ্মণ, মাতা রূপবতী, ভ্রাতা শম্ভুরাম, দুই পত্নী সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী, তিন ভগ্নী গৌরী, পার্বতী ও সরস্বতী। কয়েকজন ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়পুত্রের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার যদুপুর গ্রামে। জমিদার (?) হেমৎ সিংহের অত্যাচারে (?) রামেশ্বর যদুপুরের বাস ওঠাতে বাধ্য হন এবং কর্ণগড়ে এসে রাজা রাম সিংহের কাছে আশ্রয় লাভ করেন। রাম সিংহ কৌশিকী নদীর তীরে অযোধ্যানগরে তাঁকে বসতি করান।

রামেশ্বর একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও লিখেছিলেন। এর ভনিতা থেকে জানা যায় যে, কবি যদুপুরে থাকার সময়ে এটি রচনা করেছিলেন। সুতরাং এটি 'শিবায়ন'-এর আগে রচিত হয়েছিল।

'শিবায়ন' রামেশ্বরের দ্বিতীয় গ্রন্থ এবং পাকা হাতের রচনা। সুতরাং এই বই সম্পূর্ণ করার সময়ে রামেশ্বরের বয়স অন্তত ত্রিশ বছর ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব রামেশ্বর ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের পরে জন্মগ্রহণ করেন নি। রাজা রাম সিংহের কাছে তাঁর সংবর্ধনালাভের সময়ে তাঁর বয়স ২৫ বছরের কম ছিল না—তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ দিক্ দিয়ে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দকে তাঁর জন্ম-সময়ের নিম্নতম সীমা ধরা যুক্তিযুক্ত হয়।

অতএব রামেশ্বর যে অন্তত ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তা সুনিশ্চিত।

॥ ছেচল্লিশ ॥

মাণিকরাম গাঙ্গুলী

প্রাচীন কাব্যে রচনাকাল জানানোর অনেকরকম পদ্ধতি ছিল। কোন লেখক রচনাকাল জানাতেন সহজ ভাষায়, কেউ জানাতেন সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে, আবার কেউ বা উৎকট হেঁয়ালিতে। কিন্তু মাণিকরাম গাঙ্গুলীর মত হেঁয়ালির এতখানি বাড়াবাড়ি আর কোন প্রাচীন বাঙালী কবি করেছেন কিনা সন্দেহ। মাণিকরামের ধর্ম্মমঙ্গলের পুথির (লিপিকাল ১৭৩১ শকাব্দ) শেষে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

সাকে রীত্ত (ঋতু) সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধিসহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার সনে ॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বরি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত ॥

নানা পণ্ডিত এর নানা অর্থ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন এর থেকে পেয়েছেন ১৪৬৯ শক; বিভূতিভূষণ দত্ত পেয়েছেন ১৫২৯ শক, ডঃ আশুতোষ ভটাচার্য পেয়েছেন ১৪৮৯ শক, ডঃ শহীদুল্লাহ্ ১৪৯১ শক।

কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানিকরামের ধর্মমঙ্গল অত আগে রচিত হতে পারে না।

প্রথমত, মাণিকরামের ভাষা বর্তমান যুগের ভাষার বড় কাছাকাছি। তাঁর ধর্মমঙ্গল থেকে যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে তা দেখাচ্ছি।

"বধে নাই বাঘকে বচনে বুঝা গেছে।"
"জনম লভ গে বাছা ভারত ভিতরে।"
"যবে যেয়ে জল খেতে নাম্বিলাম জলে ॥"
"রাণীদিগে খাব আর অন্য পরে কি।
অবশেষে রাজার মাথার খাব ঘি ॥"
"জেতের স্বভাব ধর্ম্ম সঙ্কুচিত গা।"
"দগ্ধ করে ডুসের ছেলের খাব ভাত।"
"ঐরঙ্গে এলেন গরুড় মহাবল।"
"রাজা কহে বাপুহে এমন বুদ্ধি কেন।"
"বৌ তার বারি হয়ে বাঘটাকে দেখে।"

এ ছাড়া এর মধ্যে অজস্র আরবী-ফারসী শব্দ পাওয়া যায়।

মোটের উপর, ভাষাতত্ত্বের যদি কণামাত্রও মর্যাদা দেওয়া যায়, তাহলেও মাণিকরামকে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার কবি বলা যায় না।

মাণিকরাম রূপরামকে "আদি রূপরাম" বলে বন্দনা করেছেন এবং অনেক জায়গায় রূপরামের কাব্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যের আক্ষরিক মিল থেকে বোঝা যায় মাণিকরাম রূপরামকে অনুসরণ করেছেন। 'ইছাই-বধ' পালাটি তো তিনি রূপরামের কাব্য থেকে হুবহু নিয়েছেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গল যদি ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল তার অন্তত পঞ্চাশ বছর পরে লেখা হবে।

মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলে কর্পূর যেখানে লাউসেনের কাছে সুরিক্ষার পাটে বন্দী নাগরদের তালিকা দিচ্ছে,—তার মধ্যে কৃত্তিবাস, নরোত্তম, নিধিরাম, খেলারাম, গোবিন্দ, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, চণ্ডীদাস, নরহরি প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই দিকে সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এতগুলি প্রাচীন বাঙালী কবির নামের একত্র সমাবেশ আকস্মিক ব্যাপার নয়। মাণিকরাম রসিক কবি, তিনি পরিহাসচ্ছলে এই তালিকায় তাঁর পূর্ববর্ত্তী কবিদের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ঘনরামই সবচেয়ে অর্বাচীন। "রাম গুণ রস সুধাকর" বা ১৬৩৩ শক বা ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। সুতরাং মাণিকরামের কাব্য তার পর রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "আভ্যন্তরীণ প্রমাণে (মানিকরামের) কাব্য-রচনার ঊর্ধ্বতম সীমা অষ্টাদশ শতাব্দের ওদিকে যাইতে পারে না। মানিকরাম বিষ্ণুপুরে মদনমোহন-ঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন, মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। রাধার কলঙ্কভঞ্জন-কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। রূপরামের উল্লেখ আছে। ঘনরামের কাব্যও যে মানিকরামের অজ্ঞাত ছিল না তাহার ইঙ্গিত পাই অনুপ্রাসের বকমে। ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দের ছাপ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। 'যেতে'র সঙ্গে 'হতে'র মিল সপ্তদশ শতাব্দে প্রায় অভাবনীয়।"

মাণিকরাম তাঁর ধর্মমঙ্গলের দিগ্‌বন্দনা পালায় সত্যপীরের বন্দনা করেছেন। সত্যপীরের উল্লেখ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের আগেকার কোন রচনায় পাওয়া যায় না। সুতরাং এ থেকেও মাণিকরামের কাব্যের অর্বাচীনতা প্রতিপন্ন হয়।

দেখা গেল, মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রচিত নয়। এখন, ঠিক কোন্ সময়ে এই কাব্য রচিত হয়েছিল তা স্থির করার প্রয়াস পেতে হবে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মাণিকরামের কাব্যের রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটির এই পরিবর্তিত পাঠ কল্পনা করেছেন.

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃত।
শর্ব্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত॥

আচার্য রায় 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ করেছেন ২৪। উল্লিখিত শ্লোকটির প্রথম ছত্রে অঙ্কের দক্ষিণা গতি ধরে তিনি পেয়েছেন ৬৪৭, দ্বিতীয় ছত্রে বামা গতি ধরে পেয়েছেন ২৪২৪। যোগ করে হ'ল ৩০৭১। একে বামাবর্তন করে পাওয়া গেল ১৭০৩। সুতরাং ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দই মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল বলে আচার্য রায় মনে করেন। এই ব্যাখ্যা অনেকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এতে অনেক অসঙ্গতি আছে। প্রথমত, সমস্ত গণনাটাই কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, মূল শ্লোকের কয়েক জায়গায় পরিবর্তন করে এই ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে। তৃতীয়ত, ২৪ অর্থে 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। চতুর্থত, ১৭০৩ শক যদি কাব্যের রচনাকাল হয়, তাহলে ১৭৩১ শকের পুঁথিতে রচনাকালসূচক শ্লোকটির এত আকাশপাতাল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না ;* বিশেষত 'যুগ' কি করে 'জোগ' হয়, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য।

আচার্য রায় মনে করেছিলেন, উল্লিখিত শ্লোকটির দ্বিতীয় ছত্রের 'পক্ষ' শব্দে 'মাস, 'যুগ' শব্দে তারিখ এবং 'সিদ্ধ' শব্দে নক্ষত্র বোঝান হয়েছে। যোগেশচন্দ্র জ্যোতিষগণনা করে দেখিয়েছেন যে ১৭০৩ শকের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ২৪ নক্ষত্র ছিল। কিন্তু এইভাবে যে কবি মাস-তারিখ-নক্ষত্রের ইঙ্গিত করেছেন, তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। অতএব যোগেশচন্দ্রের জ্যোতিষ-গণনা

* ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' বইয়ে এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। 'অব্যাহৃত তিথি' শব্দের যে অর্থ তিনি করেছেন, তার মধ্যে খুব বেশি কষ্টকল্পনা রয়েছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের গণনা যে কতখানি অবাস্তব, তা একটি বিষয় থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। তিনি মাণিকরামের রচনাকালবাচক শ্লোকের প্রথম ছত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবেই দক্ষিণা গতি ধরেছেন; দ্বিতীয় ছত্রে বামা গতি ধরেছেন; এরকম ধরা বিতর্কমূলক হতে পারে (আমাদের মতে এখানেও দক্ষিণা গতি ধরা উচিত)—কিন্তু বিধিবহির্ভূত নয়। কিন্তু (আচার্য রায়ের মত অনুযায়ী) প্রথম ছত্র ও দ্বিতীয় ছত্র থেকে পাওয়া সংখ্যা দু'টির যোগফল ৩০৭১কে আচার্য রায় বামাগতি ধরে ১৭০৩ করেছেন—এটি একেবারে বিধি-বহির্ভূত। কারণ "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" নিয়মের তাৎপর্য এই যে, অঙ্ক যতক্ষণ আঙ্কিক শব্দ ('চন্দ্র', 'পক্ষ' প্রভৃতি) দিয়ে লেখা হবে, ততক্ষণই তার বামা গতি, সংখ্যা (১, ২, ৩ প্রভৃতি) দিয়ে লিখলে সব সময়েই দক্ষিণা গতি হবে—২৫কে শব্দ দিয়ে লিখলে "বাণ পক্ষ" লেখা চলে, সংখ্যা দিয়ে লিখলে ২৫ লিখতে হবে—৫২ লেখা যাবে না। সুতরাং মাণিকরামের গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের সিদ্ধান্তকে কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না।

মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকালবাচক শ্লোকটির অর্থ করার চেষ্টা আমরা পরে করব। কিন্তু তার আগে মাণিকরামের কাব্যে তাঁর সময়-নির্দেশের অন্য কী সূত্র পাওয়া যায়, তা'ই দেখতে হবে।

কাব্যের বন্দনা পালায় মাণিকরাম বিষ্ণুপুরের 'মদনমোহন'-এর উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

বিষ্ণুপুরে বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
পূর্ব্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে॥

নিজেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই উল্লেখের বিরোধ দেখে কেউ কেউ এই উল্লেখকে গায়নের প্রক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু নিজের মতের বিরোধী হলেই কোন কিছুকে প্রক্ষিপ্ত মনে করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়া, মাণিক-রামের ধর্মমঙ্গলের বিশেষ কোন প্রচার হয় নি। এর একটিমাত্র পুথি এপর্যন্ত পাওয়া গেছে। এইটি অবলম্বনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই কাব্য ছাপিয়েছিলেন এবং এই পুথিটিই এখন বর্ধমান সাহিত্যসভার সংগ্রহে আছে।* কোন

* কেউ কেউ এই দু'টি পুথিকে পৃথক বলে মনে করেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

কাব্যের খুব বেশি প্রচার না হলে তাতে প্রক্ষেপের কথা ওঠে না। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত পয়ারটি যে মাণিকরামের স্বরচিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন দুর্জনসিংহদেব 'মল্লাব্দে ফণিরাজশীর্ষগণিতে' (১০০০) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।" অল্পদিনের মধ্যেই বিষ্ণুপুরের মদনমোহন সারা বাংলায় খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরের দুর্ভাগ্যক্রমে মদনমোহন এখানে চিরদিন থাকেননি। মীরকাশিম যখন বাংলার নবাব, সেই সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্যসিংহ মদনমোহনকে বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে বাঁধা রেখে অর্থসংগ্রহ করেন। ঘটনাচক্রে বিষ্ণুপুররাজ সে টাকা শোধ দিয়ে-মদনমোহনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। এখনও পর্যন্ত মদনমোহন বাগবাজারেই আছেন। মীরকাশিম ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার নবাব ছিলেন। সুতরাং মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা বলতে হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বলেছিলেন, মাণিকরাম বোধহয় মদনমোহনের বিষ্ণুপুর ত্যাগের বৃত্তান্ত জানতেন না, অতএব তিনি ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পরেও কাব্য লিখতে পারেন। কিন্তু মাণিকরামের নিবাস ছিল বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বেলডিহা গ্রামে। এখান থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব বেশী নয়। এখানে থেকে মাণিকরাম মদনমোহনের বিষ্ণুপুর ত্যাগের খবর জানতেন না বলে ভাবা যায় না। মদনমোহনের বিষ্ণুপুর থেকে বাগবাজারে আসার কাহিনী যে বাংলা দেশে অল্পদিনের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত বিশ্বম্ভরদাসের 'জগন্নাথমঙ্গলে' (প্রথম মুদ্রণ ১২৩৮ বঙ্গাব্দ) মদনমোহনের বন্দনাপ্রসঙ্গে তাঁর কলকাতায় আগমন উল্লিখিত হয়েছে,

বিষ্ণুপুরে বন্দিলাম মদনমোহন।
এবে গঙ্গাতীরে যার করহ দর্শন ॥

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৬৩০)।

এই সময়েই লেখা আর একটি বই জগন্নাথদাসের 'ভক্তচরিতামৃতে' (পুথির লিপিকাল ১২৩১ বঙ্গাব্দ) গোকুল মিত্রের কাছে বিষ্ণুপুররাজের মদনমোহনকে বাঁধা রাখার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে (ঐ, পৃঃ ৯১২)। অতএব, মাণিকরাম যদি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল লিখতেন, তা হলে মদনমোহনের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর স্থানান্তর-গমনেরও উল্লেখ করতেন বলে মনে হয়। তা

যখন করেন নি, তখন মদনমোহন বিষ্ণুপুরে থাকতে থাকতেই তাঁর ধর্মমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়। "পূর্ব্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে"—মদনমোহনের এই পূর্ব্ব-ইতিহাসের উল্লেখ থেকে মনে হয় বিষ্ণুপুরের রাজমন্দিরে মদনমোহনের প্রতিষ্ঠার পরে তখনও বেশি দিন অতিবাহিত হয় নি। যা হোক্, ১৭১১ (ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাসমাপ্তির বছর) এবং ১৭৬৪ (মীরকাশিমের শাসনের শেষ বছর) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল রচিত হয়েছিল বলে আমরা স্থির করলাম।

মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকালের উর্ধ্বসীমা ও অধোসীমা নির্ণয় করা হল। এখন, রচনাকালবাচক শ্লোকটির অর্থ করা যাক্।

মাণিকরামের রচনাকালবাচক শ্লোকের হেঁয়ালি ভাঙা দুরূহ হলেও অসম্ভব নয়। প্রথম ছত্রের "শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে" = ৬৪৭ শকাব্দ— "দক্ষিণে" মানে 'দক্ষিণা গতি'। এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই। দ্বিতীয় ছত্র নিয়েই যত গণ্ডগোল—

"সির্দ্ধসহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার সনে"

অর্থাৎ

"সিদ্ধসহ যোগ দক্ষে যোগ তার সনে"

এর অর্থ করতে গিয়ে পূর্বাচার্যেরা দিশা হারিয়েছেন। বিশেষভাবে 'সিদ্ধ'র অর্থ করতে গিয়ে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন; 'সিদ্ধ' কে কেউ ৭ ('ঋষি' অর্থে), কেউ ২৪ ('জিন' অর্থে), কেউ ৮৪ (মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের 'চৌরাশী সিদ্ধা' অর্থে) ধরেছেন। কিন্তু 'সিদ্ধ' ও 'ঋষি' এক নয়—আর অন্ত্যমধ্য যুগের বাঙালী কবি মাণিকরাম জৈন ঐতিহ্য ও মহাযান-বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলে মনে করার কোন কারণ নেই, তাই এক্ষেত্রে 'সিদ্ধ' কে ২৪ বা ৮৪-ও ধরা সঙ্গত নয়। 'সিদ্ধ' শব্দের আঙ্কিক অর্থ এখানে ১০ ধরা উচিত*—'সিদ্ধ' বা 'সিদ্ধবিদ্যা' বলতে দশ মহাবিদ্যাকেও বোঝায়। 'যোগ' বলতে মাণিকরাম জ্যোতিষোক্ত যোগ বুঝিয়েছেন; জ্যোতিষোক্ত যোগের সংখ্যা ২৭—বিষ্কম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য প্রভৃতি (বিশ্বকোষ, ১৬শ ভাগ, পৃঃ ৪০); কবি যে এখানে জ্যোতিষোক্ত যোগের কথা বলেছেন, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন

* এই অর্থ বাঙালীর নিজস্ব ঐতিহ্যেরও অনুকূল, কারণ বাঙালী প্রধানত শক্তি-উপাসক জাত।

'সিদ্ধসহ যোগ' লিখে—জ্যোতিষোক্ত যোগগুলির মধ্যে ২১ সংখ্যক যোগের নাম 'সিদ্ধ' যোগ; ('সিদ্ধ' শব্দ এখানে একাধারে সংখ্যাবাচক এবং 'যোগ' শব্দের প্রকৃতি-নির্দেশক)। 'দক্ষে' শব্দ সংখ্যাবাচক নয়, "দক্ষে যোগ তার সনে"র অর্থ 'দক্ষতার সঙ্গে তার সাথে যোগ কর'; 'দক্ষে' শব্দ 'দক্ষিণে' শব্দের অপভ্রংশ হওয়াও বিচিত্র নয়।

সুতরাং মাণিকরামের হেঁয়ালির সমাধান এই,

প্রথম ছত্র— ৬৪৭ শকাব্দ
দ্বিতীয় ছত্র—১০২৭ শকাব্দ
১৬৭৪ শকাব্দ

অতএব ১৬৭৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দই মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল।

পূর্ববর্তী গবেষকরা মাণিকরামের রচনাকালবাচক শ্লোকের আঙ্কিক শব্দগুলির স্বেচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন করে (যেমন কেউ কেউ 'সিদ্ধ'কে 'সিদ্ধি', 'যোগ'কে 'যুগ' ধরেছেন এবং অনেকেই 'দক্ষে'কে 'পক্ষে' ধরেছেন) অনুমান ও কল্পনার ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন। আমরা শব্দগুলিকে অবিকৃত রেখেই শ্লোকটির অর্থ করলাম।

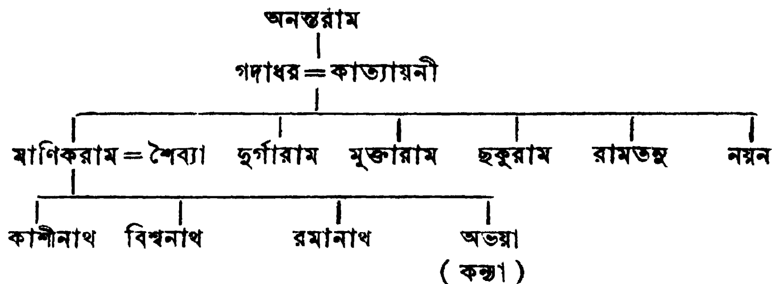
শ্লোকটির তৃতীয় চরণের "অব্যাহিত তিথি" লিপিকর-প্রমাদ বলে আমরা মনে করি।* এটি বাদ দিলে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের অর্থ পরিষ্কার। "মহাপুত্র" অর্থাৎ মঙ্গলবারে রাত্রিতে "শরাগ্নি" অর্থাৎ ৩৫ দণ্ডে এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের যে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তার সম্পাদকীয় ভূমিকায় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দকেই এই কাব্যের রচনাকাল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর সমর্থক প্রমাণ হিসাবে বলা হয়েছে, যে এই গ্রন্থে একটি ইংরেজী শব্দ আছে—তবল (staple)। কিন্তু 'তবল' ও 'আস্তাবল' উভয় শব্দই আরবী 'ইস্‌তব্‌ল' শব্দ থেকে এসেছে। অতএব 'তবল'কে ইংরেজী শব্দ বলা নিরর্থক।

মাণিকরাম একটি শীতলামঙ্গল কাব্যও লিখেছিলেন। তার একাধিক পুথি পাওয়া গিয়েছে।

* আমাদের মনে হয়, এখানে মূল পাঠ ছিল "তিথি ষষ্ঠী দিত" (অর্থাৎ শুক্লা ষষ্ঠী তিথি)। আর কোন তিথিকে ছন্দ ও মিল অক্ষুণ্ণ রেখে "তিথি অব্যাহিত"র জায়গায় বসানো যায় না।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে মাণিকরাম যে আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে কবি তাঁর বংশপরিচয় দিয়েছেন ; তার থেকে মাণিকরামের এই বংশলতা প্রস্তুত করা যায়,



এই আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে—মাণিকরামের 'গাঞি' ছিল "বাঙ্গাল গাঙ্গুলী"।* তাঁর চতুর্থ সহোদর ছকুরাম ধর্মমঙ্গলকাব্যের গায়ন ছিলেন। কবিরা বংশানুক্রমে শীতলসিংহ ধর্মঠাকুরের সেবক ছিলেন। মাণিকরাম নানা জায়গায় টোলে পড়বার পর অবশেষে ভূড়াড়িতে ন্যায় পড়তে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর নানারকম ব্যাপার ঘটল, ধর্মঠাকুর দেশড়ার মাঠে কবিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিলেন (!), তারপর আরও নানারকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানার পরে মাণিকরাম ধর্মঠাকুরের কাছে ধর্মমঙ্গল লিখতে স্বীকৃত হলেন—যদিও ধর্মমঙ্গল গান করলে জাতি যাওয়ার ভয় তাঁর ছিল।

---

* 'শীতলামঙ্গলে' মাণিকরাম 'গাঞি' সম্বন্ধে লিখেছেন, "গাঙ্গুলি বাঙ্গালপাস"।

॥ সাতচল্লিশ ॥

রাজমালা, চম্পকবিজয় ও কৃষ্ণমালা

বাংলা ভাষায় ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ অতীতকালে খুব বেশি লেখা হয় নি। এ দিক্‌ দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের লেখকরা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁরা পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে 'রাজমালা' নামে বৃহৎ ইতিহাসগ্রন্থের চারটি খণ্ড এবং 'চম্পকবিজয়' ও 'কৃষ্ণমালা' নামে আরও দু'টি মূল্যবান্‌ ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।* এদের রচনার ইতিহাস ও রচনাকাল সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করব।

'রাজমালা'র দুটি রূপ বর্তমানে প্রচলিত; একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক। প্রাচীন 'রাজমালা'র একটি পুথি (নং ২২৫৯) এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের পুথিশালায় রক্ষিত আছে (পুথিটি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে)। এই পুথির লিপিকরের নাম পুথির ৪৯ খ ও ৫৫ খ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে—"রামনারায়ণ দেব"। এই রামনারায়ণ দেবই "সন ১২০৬ তারিখ ১৮ই বৈশাখ"-এ অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ('সন' অব্দকে বঙ্গাব্দ না ধরে ত্রিপুরাব্দ ধরলে ১৮০২ খ্রীঃ হয়) 'চম্পকবিজয়' গ্রন্থের একটি পুথির নকল সম্পূর্ণ করেছিলেন (ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯)। প্রাচীন 'রাজমালা'র সাহিত্য পরিষতে রক্ষিত পুথি এর কয়েক বছর আগে বা পরে লিপিকৃত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এই পুথি থেকে চারটি খণ্ডেরই রচনার ইতিহাস জানা যায়। ত্রিপুরারাজ ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে 'রাজমালা'র প্রথম খণ্ড রচিত হয়। ধর্মমাণিক্যের ১৩৮০ শকাব্দ বা ১৪৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। ধর্মমাণিক্যের সভাসদ দুর্লভেন্দ্র চোন্তাই এবং ব্রাহ্মণকুমার শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর মুখে মুখে ত্রিপুরার অতীত ইতিহাস ব্যক্ত করে যান এবং তা অবলম্বন করে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি এই খণ্ডটি রচনা করেন। কারও কারও মতে দুর্লভেন্দ্র

* এইসব গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশদতর তথ্যের জন্য 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' (১৩৫৮) প্রকাশিত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা' বই দ্রষ্টব্য।

চোন্তাই অতীত ইতিহাস ব্যক্ত করেন এবং শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর তা লিপিবদ্ধ করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড রচিত হয় ত্রিপুরারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে। অমরমাণিক্যের ১৪৯৯ শকাব্দ (১৫৭৭-৭৮ খ্রীঃ) ও ১৫০৩ শকাব্দের (১৫৮১-৮২ খ্রীঃ) মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু অমরমাণিক্যের রাজসভায় ১০৫ বছর বয়স্ক সেনাপতি রণচতুরনারায়ণ বিবৃত করেন। এরও লেখকের নাম জানা যায় না।

তৃতীয় খণ্ডটি রচিত হয় ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাণিক্যের (রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটকের নায়ক) রাজত্বকালে। গোবিন্দমাণিক্যের ১৫৮১ শকাব্দ (১৬৫৯-৬০ খ্রীঃ) ও ১৬০২ শকাব্দের (১৬৮০-৮১ খ্রীঃ) মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। দুর্গামণি উজীরের (পরে এঁর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে) মতে 'রাজমালা'র তৃতীয় খণ্ডের রচয়িতা বা বক্তা দ্বারপণ্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশ, কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

'রাজমালা'র চতুর্থ খণ্ডটি রচিত হয় রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালে—১৭৬০ থেকে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কৃষ্ণমাণিক্যের অনুরোধে জয়দেব উজীর বিশ্বাসনারায়ণ নামে একজন লেখককে দিয়ে এই খণ্ডটি রচনা করান। একমাত্র এই খণ্ডের লেখকেরই নাম সঠিকভাবে জানা যায়।

এর পরে—১২৩৮ ত্রিপুরাব্দ বা ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার দুর্গামণি উজীর 'প্রাচীন রাজমালা'র উপর যথেচ্ছভাবে কলম চালিয়ে 'রাজমালা'কে নতুন রূপ দেন। এই নতুন রূপটি একাধিকবার ছাপা হয়েছে, শেষবার ছাপা হয়েছে কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ত্রিপুরা সরকারের খরচে।

কেন দুর্গামণি উজীর প্রাচীন 'রাজমালা'কে "সংশোধন" করলেন, তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি লিখেছেন,

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত।
প্রসঙ্গেত অলগ্নিক ভাষা কুৎসিত॥
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত।
সেই কারণে লোকে নাহি বুঝে তত॥
... ...
বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি।
তাহাকে সুধিল (শুদ্ধ করল) পুনি উজীর দুর্গামণি॥

(ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮)

খুবই আশ্চর্যের বিষয়, ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "বাঙ্গালা রাজমালা উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগের পূর্বে রচিত হয় নাই। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র-মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে জানাইয়াছিলেন, 'বাঙ্গালা রাজমালার লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি।'...আসলে বাঙ্গালা রাজমালার রচয়িতা বা অনুবাদক ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণকিশোর-মাণিক্যের (রাজ্যকাল ১২৩৯-৫৯ ত্রিপুরাব্দ) কর্মচারী উজীর দুর্গামণি ঠাকুর। ইহাকেই বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন বলিয়া বীরচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছিলেন।"

এই উক্তি খুবই হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। দুর্গামণি উজীরের লেখার (উপরে উদ্ধৃত) মধ্যেই যে "পুরাতন রাজমালা"র উল্লেখ আছে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতে যে প্রাচীন রাজমালার পুথি রক্ষিত আছে—যার ভাষার সঙ্গে দুর্গামণির ভাষার আগাগোড়াই অমিল—সে সম্বন্ধে অবহিত না হয়েই ডঃ সেন এই জাতীয় উক্তি করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বীরচন্দ্র মাণিক্যের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি থেকে বিকৃতভাবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য এ কথা চিঠিতে বলেন নি যে তিনি বাংলা 'রাজমালা'র লেখককে দেখেছিলেন। তাঁর চিঠিতে আছে, "দ্বিতীয় বাংলা রাজমালার লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি।" (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫৪ দ্রষ্টব্য)।

ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়েছি, 'রাজমালা'র দুটি রূপ প্রচলিত আছে, একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক*—দুর্গামণি উজীর কর্তৃক সংশোধিত শেষোক্ত রূপটিকেই বীরচন্দ্র মাণিক্য† "দ্বিতীয় বাংলা রাজমালা" বলেছেন (এর দ্বারা প্রথম অর্থাৎ প্রাচীনতর বাংলা রাজমালার অস্তিত্বও স্বীকৃত হচ্ছে)।

* প্রাচীন বাংলা 'রাজমালা' ও দুর্গামণি উজীরের বাংলা 'রাজমালা'র পার্থক্য শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরভাবে দেখিয়াছেন (ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, পৃঃ ১৮-২৩)।

† বীরচন্দ্র মাণিক্যের মতে বাংলা রাজমালার আকরগ্রন্থ সংস্কৃত 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ! এ কথা ঠিক নয়। সংস্কৃত 'রাজরত্নাকর' জাল বই। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "এইরূপ কৃত্রিম রচনার উদাহরণ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যায় না।" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৮, পৃঃ ৬)

ত্রিপুরার রাজাদের মিথ্যা গৌরবকাহিনী এবং অতিরঞ্জিত বংশমর্যাদা প্রচার করার জন্যই উনবিংশ শতাব্দীতে 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ লেখানো হয়েছিল।

সুতরাং ডঃ সুকুমার সেনের উক্তি বীরচন্দ্র মাণিক্যের উক্তি দ্বারাই খণ্ডিত হচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে রচিত বাংলা ইতিহাসগ্রন্থগুলির মধ্যে 'রাজমালা'র পরেই 'চম্পকবিজয়' ও 'কৃষ্ণমালা'র নাম উল্লেখযোগ্য। 'চম্পকবিজয়' গ্রন্থে ত্রিপুরারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭১০ খ্রীঃ) নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ এবং রত্নমাণিক্যের সাময়িক রাজ্যচ্যুতি বর্ণিত হয়েছে। রত্নমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি মীর খাঁ গাজীর আদেশে সেখ মহদ্দি নামেক এক জন কবি এই বইটি রত্নমাণিক্যের রাজ্য ফিরে পাওয়ার পর দ্বিতীয় দফার রাজত্বকালে রচনা করেন।

দুর্গামণি উজীর কর্তৃক সংশোধিত 'রাজমালা' থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের ভাইপো রাজধরমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৭৮৩-১৮০২ খ্রীঃ) রাজত্বকালে রামগঙ্গা বিশারদ নামে জনৈক কবি 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে কৃষ্ণমাণিক্যের জীবনী বর্ণিত হয়েছে।

॥ আটচল্লিশ ॥

ভারতচন্দ্র রায়

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি নন, তিনি নিজেই যেন একটা সমগ্র যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগ্রত বিদগ্ধ নাগরিক সমাজের তিনি প্রতিনিধি। সেই সমাজে যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আভিজাত্যের সমন্বয় হয়েছিল, তেমনি তাতে সরলতা, অকপটতা ও আদর্শনিষ্ঠার যথেষ্ট অভাব ছিল সন্দেহ নেই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই সমাজের ছাপটি পুরোপুরিভাবে পড়েছে। তাই ভাষার মাধুর্যে, ছন্দের নৈপুণ্যে, শ্লেষের চাতুর্যে এই কাব্য তুলনারহিত, কিন্তু তাতে অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতাটুকু প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রাজসভা-কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" এই উক্তির মধ্যে যেমন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের চরম প্রশংসা রয়েছে, তেমনি তার অপূর্ণতাটুকুও এর মধ্য দিয়েই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মণিমালার সৌন্দর্য ও গঠনচাতুর্য যতই অপূর্ব হোক, যতই তা বহুমূল্য হোক্, ফুলের মালার অপার্থিব সৌরভ থেকে সে বঞ্চিত। অনুভূতির গভীরতা ও অকপটতাই কাব্যের সৌরভ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তা নেই।

তবুও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তার অপরূপ লাবণ্যে আজ দুশো বছর ধরে বাঙালীকে মুগ্ধ করে রেখেছে। এই কাব্য রচনার পরে শতাধিক বর্ষ পর্যন্ত গুণ বা জনপ্রিয়তা কোন দিকেই এর প্রতিদ্বন্দ্বী কোন কাব্য সৃষ্টি হতে পারে নি। এখন অবশ্য এই কাব্যের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্ব আর অক্ষুণ্ণ নেই; মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে তার জনপ্রিয়তাও সাময়িকভাবে খর্ব হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে ভারতচন্দ্র আবার পূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ,

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥
(বেদ = ৪, ঋষি = ৭, রস = ৬, ব্রহ্ম = ১)

ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তারপর থেকে সকলেই এই জীবনকাহিনীর সব কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে আসছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাহিনীটি শুনেছিলেন ভারতচন্দ্রের পৌত্রের কাছ থেকে। সুতরাং এতে বর্ণিত ঘটনাগুলি মোটামুটিভাবে সত্য হওয়া সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণে প্রদত্ত বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্য নিখুঁত নয়। তার মধ্যে যথেষ্ট কালবৈষম্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এর একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত জীবনকাহিনীতে পাওয়া যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসার পরে তাঁরই অনুরোধে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তারপরে একদিন মহারাজ কবির প্রার্থনা অনুসারে তাঁকে গঙ্গাতীরের মূলাজোড় গ্রামে জমি দেন। তারপর যখন বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের মা বর্ধমান ছেড়ে মূলাজোড়ের পাশের গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর বর্ধমানরাজের জননী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে মূলাজোড় গ্রামের ইজারা নেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে অন্যত্র বসবাসের জন্য জমি দেন কিন্তু ভারতচন্দ্র মূলাজোড়বাসীদের অনুরোধে সেখানেই থেকে যান।

তাহলে এই বিবরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হবার পরে দেশে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজে অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে বলেছেন যে, ১৬৬৪ শক বা ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে বর্গীর হাঙ্গামা হয় এবং সেই সময় আলীবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে ধরে নিয়ে যান। বন্দী-দশায় কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নে দেবী অন্নদার আদেশ পান, যার ফলে তাঁর অনুরোধে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। তারপর, অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৩ শক বা ১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ। কিন্তু ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দেই বর্গীর হাঙ্গামা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ঘটনাবলীর পারম্পর্য উল্লেখে এখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভুল করেছেন দেখা যাচ্ছে। অবশ্য তিনি ভুল খবরও পেতে পারেন।

ভারতচন্দ্র ১৬৮২ শকাব্দ বা ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন। তাঁর পৌত্রের কাছ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সাল পেয়েছিলেন এবং এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে দ্বিমত নেই।

ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, "এই বিশ্ববিখ্যাত ভারত-চন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।" কিন্তু তিনি অন্য এক জায়গায় যা লিখেছেন, তাতে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি

হয়েছে। ভারতচন্দ্রের ত্রিপদী ছন্দে লেখা সত্যপীরের পাঁচালীটিতে তারিখ দেওয়া আছে "সনে রুদ্র চৌগুণা"। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এর অর্থ করেছিলেন ১১৩৪ সন বা ১৭২৭ খ্রীঃ। তিনি "কতিপয় প্রামাণ্য ব্যক্তির" কাছে শুনেছিলেন যে, ভারতচন্দ্র মাত্র ১৫ বছর বয়সে ঐ পাঁচালীটি লিখেছিলেন। "তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল তিনি বাঙলা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু 'সনে রুদ্র চৌগুণা'=১১৩৪ সন হতে পারে না। কারণ "চৌ" শব্দ হিসাবে বাংলায় ব্যবহৃত হয় না এবং কোন কবি একই অঙ্কের অর্ধেক বামা গতিতে এবং অর্ধেক দক্ষিণা গতিতে লেখেন না। 'সনে রুদ্র চৌগুণা'র একমাত্র সঙ্গত অর্থ ১১৪৪ সন বা ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ। তাহলে ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ হয় ১৭২৩-২৪ খ্রীঃ এবং ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয় ৩৭।৩৮ বছর। কিন্তু ভারতচন্দ্র যে অন্তত ৪০ বছর বেঁচেছিলেন, তার প্রমাণ 'নাগাষ্টক' থেকে পাওয়া যায়। ঐ কাব্য রচনার সময় তাঁর বয়স যে ৪০ বছর ছিল, একথা ভারতচন্দ্র নিজেই বলেছেন। সুতরাং ১৫ বছর বয়সে 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচিত হওয়ার কথা সত্য নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যদি 'সত্যপীরের পাঁচালী'র রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁর ধারণার উপর নির্ভর করে ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল ঠিক করে থাকেন, তবে তা গ্রহণ করা চলে না। তবে তিনি স্বতন্ত্র কোন সূত্র থেকেও এই সাল পেয়ে থাকতে পারেন। সুতরাং বিষয়টি সাবধানে পরীক্ষা করা দরকার।

ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল ঠিক করতে হলে প্রথম ঠিক করতে হবে 'নাগাষ্টক' কবে রচিত হয়েছিল। 'নাগাষ্টক' ১৭৪৫ থেকে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে স্বীকার করা যায়, কিন্তু ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগে কেন? অধ্যাপক ভট্টাচার্য সে সম্বন্ধে বলেন, "১৭৫০ খ্রীঃ পরে বর্গীর হাঙ্গামার অবসানে নাগাষ্টক রচিত হওয়ার কথা নহে।" বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্ধমানের মহারানী রামদেব নাগের নামে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা নেন। তারপর রামদেব নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' লেখেন।

ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনীতে পাওয়া যায় যে, মূলাজোড় গ্রাম রামদেব নাগের নামে ইজারা দেবার পরে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে আনারপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য জমি দান করেন। এই জমি দানের দলিলটি পাওয়া গিয়েছে; সেটি নীচে উদ্ধৃত হল।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

শ্রীতরঙ্গ

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
সদুদার চরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণো
নমস্কার শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ
সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনাওরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরজমাই উজ্জট বাস্তু ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি ২১ একইশ বিঘা এবং বেলায়তি সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ৫১ একাওন্ন বিঘা ও একুনে ৭২/০ বাওত্তর বিঘা বৃত্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজ জোতে ভোগ করহ ইতি সন ১১৫৬ ছাপ্পান্ন—১ আগ্রহায়ণ।

এই দলিলের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিবরণীর দুটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, তিনি লিখেছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে আনারপুরে জমি দিলেও ভারতচন্দ্র সেখানে যাননি, মূলাজোড়েই থেকে যান। কিন্তু উপরের সনদে স্পষ্ট লেখা আছে—"সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনাওরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ।" এর থেকে মনে হয়, তিনি আনারপুরে চলে গিয়েছিলেন, পরে আবার কোন কারণে মূলাজোড়ে ফিরে আসেন। ফিরে যে এসেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ তাঁর বংশধররা বরাবর মূলাজোড়েই বাস করেছেন। দ্বিতীয়ত, দলিলটিতে ৭২ বিঘা জমি দানের কথা আছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র আনারপুর অঞ্চলের ১০৫ বিঘা জমি তাঁকে দান করেছিলেন।

যা হোক, ভারতচন্দ্র আনারপুরে জমি পান ১১৫৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে। ঐ তারিখের পরে 'নাগাষ্টক' রচিত হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়, কারণ 'নাগাষ্টকে' ভারতচন্দ্র লিখেছেন যে তাঁর একটি মাত্র শিশুপুত্র,

"পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী॥"

কিন্তু ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার সময়ে তাঁর তিনটি পুত্রই—পরীক্ষিৎ, তনু ও ভগবান্—জন্মগ্রহণ করেছে।

সুতরাং যা বোঝা যাচ্ছে, রামদেব নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 'নাগাষ্টক' লেখার ফলস্বরূপই ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে আনারপুরে জমি পান এবং মূলাজোড় ছেড়ে সেখানে চলে যান। পরে মূলাজোড়ে রামদেব নাগের পত্তনির অবসান হলে সেখানে ফিরে আসেন।

অতএব 'নাগাষ্টক' ১৭৪৯ খ্রীঃর নভেম্বর মাসের আগেই রচিত হয়েছিল।

সুতরাং ভারতচন্দ্রের জন্মসাল কোনমতেই ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী নয়।* কাজেই—১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর সময়ে ভারতচন্দ্রের ৪৮ বছর বয়স ছিল বলে ঈশ্বর গুপ্ত যে উক্তি করেছেন, তা ভুল। ঐ সময়ে ভারতচন্দ্রের অন্তত ৫০ বছর বয়স হয়েছিল।

এখন দেখা যাক্, কোন্ সময়ে ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্বোল্লিখিত 'সত্যপীরের পাঁচালী'টি রচনা করেন। (তার আগে সম্ভবত আর একটি সত্যপীরের পাঁচালী লেখেন)। তারপর নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করবার পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসেন। এই ঘোরাফেরায় অন্তত বছর তিনেক সময় লেগেছিল বলে ধরতে পারি, তার কম ধরা যায় না। এদিকে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দেরও অন্তত বছর দুই আগে থেকে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে ছিলেন ধরতে হয়। সুতরাং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মহাকবি ভারতচন্দ্রের প্রথম মিলন হয়।

ভারতচন্দ্রের অনুবাদ-কাব্য 'রসমঞ্জরী' বোধহয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে লেখা প্রথম রচনা। এই কাব্যে ভারতচন্দ্রেব 'রায় গুণাকর' উপাধির উল্লেখ নেই। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দীর হাতে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী হবার সামান্য পরেই ভারতচন্দ্র ঐ উপাধি পান। অতএব ১৭৪০ থেকে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'রসমঞ্জরী' রচিত হয়।

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আমরা জানতে পারি কবির নিজের লেখা থেকে। তার মধ্যে 'অন্নদামঙ্গলে'র 'মানসিংহ' অংশে ভবানন্দের প্রতি অন্নদার উক্তির এই অংশটুকু অত্যন্ত মূল্যবান্,

সভাসদ তাহার (অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের) ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহ অংশ তায়॥

* ভারতচন্দ্র ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে থাকলে তাঁর ৩৯ বছর বয়স অর্থাৎ জীবনের ৪০শ বর্ষ সুরু হয় ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে।

ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারশী।
দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী॥

এর থেকে আমরা জানতে পারি, ভারতচন্দ্র ফুলিয়ার মুখটী এবং নৃসিংহের (অর্থাৎ কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ নারসিংহ ওঝার) বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; ভূরিশিটের (ভূরিশ্রেষ্ঠ) রাজা নরেন্দ্র রায় তাঁর পিতা। রাজ্যচ্যুত হয়ে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্র ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার ও সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। এছাড়া তিনি পুরাণ ও আগম শাস্ত্র এবং নাগরী (হিন্দী) ও ফার্সী ভাষাও জানতেন।

উদ্ধৃত অংশের কিছু পরে ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথম গায়ন নীলমণি ডীউসাঁইয়ের নাম করেছেন,

ডীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠ-আভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিবরণ অনুসারে ভারতচন্দ্রের তিন জন পুত্র ছিল—পরীক্ষিৎ, রামতনু এবং ভগবান্। ভারতচন্দ্র এই তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন 'অন্নদামঙ্গলে'র সর্বশেষ পংক্তিতে,

ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিৎ তনু ভগবানে॥

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্য কোন কোন গ্রন্থে কয়েকজন পূর্বপুরুষ ও পৃষ্ঠপোষকের নাম উল্লেখ করেছেন। 'রসমঞ্জরী'তে তাঁর অন্যতম পূবপুরুষ প্রতাপনারায়ণের নাম পাই,

ভূরিশিট-রাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥

এর পরের ছত্রে ভারতচন্দ্র বলেছেন যে রাজবল্লভের চক্রান্তে বর্ধমানের

মহারাজা কীর্তিচন্দ্র (রাজত্বকাল ১৭০৩-৩৭ খ্রীঃ) তাঁর পিতৃরাজ্য অপহরণ করেছিলেন,

রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য
মহারাজা (কৃষ্ণচন্দ্র) রাখিল স্থাপিয়া।

দেবানন্দপুর গ্রামে অবস্থানের সময়ে ত্রিপদী এবং চৌপদী ছন্দে ভারতচন্দ্র যে দু'টি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখেছিলেন, তাতে ঐ গ্রাম নিবাসী তাঁর কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকের নাম পাই নিম্নোক্ত ছত্রগুলিতে,

(১) দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দ ধাম
হীরারাম রায়ের বাসনা।

(২) দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারশী॥

চৌপদী ছন্দে রচিত 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'তে ভারতচন্দ্র তাঁর একজন পূর্বপুরুষ ভূপতি রায়েরও নাম করেছেন,

ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হত কংস ভুরস্থটে বসতি।

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি সংবাদ পাওয়া যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিবরণে। কিন্তু এই বিবরণে যথেষ্ট ভুল আছে। আগে তার কিছু উদাহরণ দিয়েছি। এখন আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, ভারতচন্দ্র "এই চারু গ্রন্থের (অন্নদামঙ্গলের) পর 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন," কিন্তু 'রসমঞ্জরী' ভারতচন্দ্রের 'রায় গুণাকর' উপাধি প্রাপ্তির আগে এবং অন্নদামঙ্গল 'রায় গুণাকর' উপাধি প্রাপ্তির পরে রচিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র আরও লিখেছেন যে ভারতচন্দ্র "৪০ বৎসর বয়সের সময় নবদ্বীপেশ্বরের (অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের) অধীন হইলেন, এবং সেই বর্ষেই 'অন্নদামঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিলেন।" এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। ৪০ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বিবরণী থেকেই জানা যায় যে ভারতচন্দ্র "নবদ্বীপেশ্বরের অধীন" হবার অনেক পরে নাগাষ্টক রচনা করেছিলেন ; 'নাগাষ্টক' পড়লেও সে কথা বোঝা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন যে 'নাগাষ্টক' বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭৪৪-৭০ খ্রীঃ) লেখা, কিন্তু ভারতচন্দ্র অন্তত ১৭৪২ খ্রীঃ থেকে

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন যে. "শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে" অর্থাৎ ১৬৬৪ শক বা ১৭৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দী করেন; বন্দিশালাতে দেবী অন্নপূর্ণা কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন,

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥

এর থেকে বোঝা যায়, এই ঘটনার আগে থাকতেই ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন এবং এর পরে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে 'রায় গুণাকর' উপাধি পান। ভারতচন্দ্র কাব্যের শেষ দিকে খুব স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, অন্নপূর্ণার আজ্ঞা (স্বপ্নাদেশ) অনুসারেই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায় গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন; তিনি অন্নপূর্ণাকে দিয়ে বলিয়েছেন,

কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥

সুতরাং ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগে ভারতচন্দ্র 'রায় গুণাকর' উপাধি পান নি। অন্তত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি "নবদ্বীপেশ্বরের অধীন" ছিলেন এবং "অধীন" হবার কয়েক বছর পরে তাঁর ৪০ বছর বয়স হয়। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের দশ বছর পরে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং কবির "নবদ্বীপেশ্বরের অধীন হওয়া" ও অন্নদামঙ্গল রচনা করা (ঈশ্বরচন্দ্রের উক্তি অনুসারে) একই বছরে ঘটতে পারে না—দু'টি ঘটনার মধ্যে অন্তত দশ বছরের ব্যবধান ছিল।

ভারতচন্দ্র শাক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন এবং শক্তি-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কাব্য লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে শাক্ত ছিলেন না—ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। এর প্রমাণ স্বরূপ 'মানসিংহ' থেকে তাঁর একটি গান উদ্ধৃত করছি,

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম
বিধি হরি হর ভাবে ও পদ দুখানি।

তুমি যারে দয়া কর অন্নে পূর্ণ তার ঘর
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি ॥
পানপাত্র হাতা হাতে রতন-মুকুট মাথে
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানী।
ভারত বিনয় করে অন্নে পূর্ণ কর ঘরে
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি ॥

শক্তিদেবীর দয়ার প্রমাণ হিসাবে যে কবি তাঁর কাছে 'হরিভক্তি' প্রার্থনা করছেন, তার বৈষ্ণবত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। আর একটি গানে ভারতচন্দ্র লিখেছেন,

ভারত দড রে
পরিণামে হরিনামে পরণামে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে ভারতচন্দ্রের দু'টি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'র মধ্যে ত্রিপদী ছন্দের পাঁচালীটি আগে লেখা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের মতে চৌপদী-পাঁচালীটি আগে রচিত হয়; কারণ, ত্রিপদী-পাঁচালীটি রচনার সময়ে ভারত-চন্দ্রের বয়স ছিল অন্তত সাতাশ বছর। পক্ষান্তরে, চৌপদী-পাঁচালীতে ভারত-চন্দ্রের পারশী পড়ার উল্লেখ (পৃঃ ৩১৬ দ্রঃ) থেকে মনে হয়, এটি ভারতচন্দ্রের ছাত্রজীবনে রচিত। হয়ত এই পাঁচালীটিই ভারতচন্দ্রের পনের বছর বয়সের রচনা। এর ভনিতায় উল্লিখিত "কংস" (পৃঃ ৩১৬ দ্রঃ) সম্ভবত ভারতচন্দ্রের পিতৃরাজ্যহারী বর্ধমানরাজ।

॥ ঊনপঞ্চাশ ॥

রামপ্রসাদ সেন

অন্তরের ঐকান্তিক আবেগের সঙ্গে অলোকসামান্য কবিত্বশক্তি যুক্ত হলে কী অপার্থিব কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়, তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত। রামপ্রসাদের গান সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "ইহার তুল্য বঙ্গভাষা-ভাষিত গীতরত্ন এ পর্যন্ত কোন কবি কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের প্রধান দোষ দুটি। এক, অশ্লীলতা; আর এক কৃত্রিমতা। রামপ্রসাদকে কেউ কেউ যুগের ব্যতিক্রম বলে মনে করেন। কিন্তু রামপ্রসাদের উপর তাঁর যুগের প্রভাব পড়েনি বলা যায় না। কারণ তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনায় কম অশ্লীল নয়। তাঁর 'কালীকীর্তন' কাব্য, যাতে ভগবতীর গোচারণ ও রাসলীলা বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু পরিমাণে কৃত্রিমতা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলি যে এই দুই দোষ থেকে মুক্ত, তার কারণ এগুলি সাধক রাম-প্রসাদের দান। সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবাসী সাধারণত চিরদিনই একক। রামপ্রসাদও সাধনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ, তাই তাঁর সাধনার উপলব্ধি থেকে যে অমৃতনিঃস্যন্দী পদাবলীর জন্ম হয়েছে, তার উপর তদানীন্তন পরিবেশের প্রভাব তেমন করে পড়তে পারেনি। তাঁর আগমনী-বিজয়ার গানও অনুভূতির আন্তরিকতায় ভরপুর, তার কারণ এগুলি তো গান নয়, বাল্যবিবাহ-প্রথার পীড়নে নিষ্পেষিত কন্যাবিরহজর্জর বাঙালী পিতামাতার হৃদয়মথিত হাহাকার।

ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদের জীবনীও সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তারপর অনেকেই এ সম্বন্ধে নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দয়ালচন্দ্র ঘোষ, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের গবেষণার ফলে রামপ্রসাদের জীবন ও কাব্যসাধনার একটা আনুমানিক কালক্রম গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

রামপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যুর কাল সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন, "৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার

পরিহারপূর্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না।" এই উক্তি অনুসরণ করে দেখা যায়, রামপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল ১৭২০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে এবং তাঁর মৃত্যুকালের ঊর্ধ্বসীমা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ। এখন সমসাময়িক প্রমাণ থেকে তাঁর জীবৎকাল সম্বন্ধে কী জানা যায় দেখি।

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে যখন ইংরেজ সরকার বাংলার নিষ্কর জমির দলিলপত্র তলব করেন, তখন রামপ্রসাদের পুত্র রামদুলাল সেন "তাঁহার পিতা রামপ্রসাদ সেন নামীয় 'মহাত্রাণ' সম্পত্তির বিবরণ" পেশ করেন ১২০২ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে। এই বিবরণে রামদুলাল সেন রামপ্রসাদের সম্পত্তির "দখলকার" বলে উল্লিখিত হয়েছেন (সা. প. প. ১৩৫২, পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং রামপ্রসাদ যে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেই পরলোক গমন করেছিলেন, তা সুনিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে।

রামদুলাল সেন তাঁর পিতার নামের মহাত্রাণ-সম্পত্তির বিবরণ চারটি পৃথক তায়দাদে দাখিল করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি তায়দাদের সঙ্গে "আসল সনন্দ দর্শাইয়া নকল দাখিল" করেছিলেন (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত 'কবিরঞ্জন রাম-প্রসাদ সেন,' পৃঃ ২০ দ্রঃ)। তার মধ্যে দুটি "আসল সনন্দ"-এর নকল এখনও নদীয়া কালেকটরাতে রক্ষিত আছে। এর প্রথমটি—সুভদ্রা দেবী নামে জনৈকা মহিলা রামপ্রসাদকে একটি বাড়ি দিয়েছিলেন ১১৬৫ সনের ২রা বৈশাখ অর্থাৎ ১৭৫৮ খ্রীঃর ১২ই এপ্রিল তারিখে—তারই সনদ। দ্বিতীয়টি স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সনদ—এতে দেখি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৫ সনের ৪ঠা ফাল্গুন অর্থাৎ ১৭৫৯ খ্রীঃর ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হাবেলীসহর বা হালিশহরের ১৬ বিঘা এবং "পরগণে উখড়ার" ৩৫ বিঘা জমি রামপ্রসাদকে দান করছেন। এই দুটি সনদের অবিকল প্রতিলিপি দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন (সা. প. প. ১৩৫২, পৃঃ ৫-৭)।

অপর দু'টি সনদের যে বিবরণ রামদুলাল সেন দিয়েছেন, তার একটিতে হালিশহরের সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় তালুকদার দর্পনারায়ণ রায় রামপ্রসাদকে হালিশহর-পরগণার তালডেঙা গ্রামে ২ বিঘা জমি দিয়েছিলেন ১১৬৫ সনের ১৫ই আষাঢ় অর্থাৎ ১৭৫৮ খ্রীঃর ২৬শে জুন তারিখে; অপরটিতে দর্পনারায়ণ রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একসঙ্গে রামপ্রসাদকে ১১৬০ সনের ১৭ই চৈত্র অথাৎ ১৭৫৪ খ্রীঃর ২৭শে মার্চ তারিখে ৮ বিঘা জমি দান করেছিলেন।

দ্বিতীয় দানপত্রটি থেকে বোঝা যায়, ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই রামপ্রসাদ সাধক বা কবি হিসাবে অথবা দু'দিক দিয়েই এতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন যে স্থানীয় ধনী ব্যক্তিরা তাঁকে জমি দান করেছিলেন। ঐ সময়ে রামপ্রসাদের বয়স অন্তত ত্রিশ বছর ছিল সন্দেহ নেই।

এ দিকে রামপ্রসাদ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে জমি দানস্বরূপ পেয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যে অন্ততপক্ষে ১৭২৪ থেকে ১৭৫৯ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রামপ্রসাদের জন্ম যে ১৬৪২ শকাব্দ বা ১১২৭ সন অর্থাৎ ১৭২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল, এ ইঙ্গিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দিয়েছেন এবং এই কথা আমরা পরস্পর-নিরপেক্ষ অন্য দু'টি সূত্র থেকেও পাই। কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সাধন-সঙ্গীত'-এর প্রথম সংস্করণে (১ম ভাগ, অবতরণিকা, পৃঃ ২৭) লিখেছিলেন যে তিনি "বহু যত্নে" জানতে পেরেছেন যে রামপ্রসাদ ১৬৪২ শকে (১৭২০-২১ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ দিকে ভদ্রেশ্বরনিবাসী "সনতারিখবাতিকগ্রস্ত" হৃদয়চরণ দের (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা) একটি খাতায় লেখা আছে, "রামপ্রসাদ সেন জাতি বৈদ্দ—জন্ম সন ১১২৭ সাল—রামপ্রসাদ সেন মুহুরিগীরি ত্যাগ—সন ১১৪৭ সাল" (সা. প. প., ১৩৬৩, পৃঃ ৫-৬ দ্রঃ)। এই তারিখ গ্রহণযোগ্য। এই তারিখ অনুসারে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিদানগ্রহণের সময়ে রামপ্রসাদের বয়স হয় ৩৩ বছর।

রামপ্রসাদের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে পরস্পরবিরোধী কথা পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের "বৃদ্ধপ্রপৌত্র" কালীপদ সেন ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ তারিখে 'নবজীবন'-সম্পাদককে লেখেন যে তাঁর পিতার এক মাসী (জীবৎকাল ১১৭৩-১২৮১ বঙ্গাব্দ) রামপ্রসাদকে জীবিত দেখেছিলেন ; তাঁর ৮ বছর বয়সের সময়ে অর্থাৎ জীবনের অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ ১১৮০ বঙ্গাব্দে বা ১৭৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাম-প্রসাদের মৃত্যু হয়। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৮৪) লিখেছেন যে রামপ্রসাদের খেড়ু বা গানের দোহার ভজন অতিবৃদ্ধ বয়সেও জীবিত ছিলেন ; তাঁর কাছে এবং "জজ পণ্ডিতের কন্যা নবকুমারী দেবী, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাচীন লোকদের" কাছে শুনে ফরিদপুর জেলার খানখানাপুরের সাধক ভুলুয়া সন্ন্যাসী অতুলবাবুকে লিখেছিলেন যে ১১৯৪ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ পরলোক গমন করেছিলেন। উইলিয়ম কেরী ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দকে রামপ্রসাদের মৃত্যুসাল বলে নির্দিষ্ট

করেছেন।* জেম্‌স্ লঙের মতে রামপ্রসাদের মৃত্যু-সাল ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।† দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে রামপ্রসাদ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন ('কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন,' পৃঃ ৯-১০); তাঁর যুক্তি প্রণিধানযোগ্য হলেও চূড়ান্ত নয়। দীনেশবাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যতটা সাবধানী লেখক ছিলেন বলে দীনেশবাবু মনে করেছেন, ততটা সাবধানী তিনি ছিলেন না। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর বিবরণে লিখেছেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' শুনে মুগ্ধ হবার পরে মাঝে মাঝে হালিসহরে গিয়ে রামপ্রসাদের গান শুনতেন, তারপর একদিন রামপ্রসাদকে তিনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিলেন; এ রকম লেখা অসাবধানতার পরিচায়ক, কারণ রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন'-এর বহু ভনিতায় তাঁর 'কবিরঞ্জন' উপাধি উল্লিখিত হয়েছে। রামপ্রসাদকে প্রদত্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমির পরিমাণ সম্বন্ধেও ঈশ্বর গুপ্ত ভুল কথা লিখেছেন। তা ছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের অনধিক ৭২ বৎসর আগে রামপ্রসাদ পরলোকগমন করেছিলেন; এর ঠিক ৭২ বছর আগে রামপ্রসাদ মারা গিয়েছিলেন—এই সিদ্ধান্ত ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি থেকে কোনমতেই করা চলে না।

কাজেই রামপ্রসাদের মৃত্যুর সময় অনিশ্চিত রইল। তিনি ১৭৫৯ খ্রীঃ ও ১৭৯৫ খ্রীঃর মাঝখানে কোন এক সময়ে পরলোকগমন করেছিলেন, এইটুকু মাত্র বলা যায়।

* রামপ্রসাদের দেশ যে হালিশহর-কুমারহট্টে ছিল, তা পূর্বোক্ত দানপত্রগুলি ও রামপ্রসাদের গান থেকে জানা যায়। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের 'জাগরণ'-পালায় রামপ্রসাদ তাঁর অনেক আত্মীয়-পরিজনের নাম লিখেছেন। তাঁর দুই বড় বোনের নাম অম্বিকা ও ভবানী; অম্বিকা ছিলেন দুঃখিনী; ভবানীর স্বামীর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ দাস; ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও কলকাতায় বাস করতেন; দুই ভাগিনেয়ের নাম জগন্নাথ ও কৃপারাম; রামপ্রসাদের

* The Good old days of the John Company from 1600-1858, p. 308.

† লঙের এই মতের কথা কবি-অধ্যাপক অজিত দত্ত আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু লঙ কোন্ বইতে এ কথা লিখেছিলেন, তা তিনি মনে রাখেন নি—আমিও অনেক খোঁজাখুঁজি করে তার সন্ধান পাই নি। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে রামপ্রসাদের মৃত্যু-সাল ১৭৭৫ খ্রীঃ লিখেছেন, তিনি সম্ভবত লঙের ঐ বইটি থেকেই তারিখটি পেয়েছিলেন।

সহোদর ভ্রাতার নাম বিশ্বনাথ এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম নিধিরাম। রামপ্রসাদ তাঁর অন্যতম পুত্র রামদুলাল এবং দুই কন্যা পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরীর নামও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যের একাধিক স্থানে তিনি নিজের প্রপিতামহ কৃত্তিবাস সেন, পিতামহ রামেশ্বর সেন এবং পিতা "মহাকবি" রামরাম সেনের নাম করেছেন। ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' গ্রন্থে কৃত্তিবাস সেন তথা রামপ্রসাদের অন্য অনেক পূর্বপুরুষের নাম পাওয়া যায় (সা. প. প., ১৩৬৩, পৃঃ ৭-১২ দ্রষ্টব্য)।

রামপ্রসাদ সেন 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'কালীকীর্তন' রচনা করেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, সম্ভবত সম্পূর্ণ হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামপ্রসাদের লেখা 'কৃষ্ণকীর্তন'-ও পেয়েছিলেন, তবে তার একটিমাত্র গান তিনি প্রকাশ করেছিলেন। রামপ্রসাদের লেখা 'সীতাবিলাপ' নামে একটি ছোট কবিতাও পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া, রামপ্রসাদ 'শিবসঙ্কীর্তন' নামে একটি বই লিখেছিলেন বলেও প্রসিদ্ধি আছে। শেষোক্ত তিনটি রচনাই অকিঞ্চিৎকর। রামপ্রসাদ তাঁর কবিজীবনের অধিকাংশই তাঁর ইষ্টদেবী কালীর উদ্দেশ্যে বাণী-অর্ঘ্য দানে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অধিকাংশ ভনিতা তিনি এইভাবে দিয়েছেন,

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥*

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর আগে রচিত হয়েছিল, এই মত বহুদিন ধরে চলিত ছিল। এই মত প্রথমে প্রচার করেন প্রাণরামের 'কালিকামঙ্গল'-এর প্রকাশক রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার।† তারপর

* মুদ্রিত বইগুলিতে এর প্রথম ছত্রটি ভুল বানানে এবং দ্বিতীয় ছত্রটির শেষাংশ "দাস-দাস-দাসী-পুত্র হই" রূপে ছাপা হয়েছে। শেষোক্ত বিষয়টি থেকে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে রামপ্রসাদের প্রমাতামহ একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এ রকম অনুমান নিরর্থক। কালীভক্ত কবি নিজেকে কালীর দাসানুদাস এবং দাসীপুত্র বলেছেন, এর বেশি কিছু ভনিতাটি থেকে পাওয়া যায় না।

† এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ (সা. প. প., ১৩৫০, পৃঃ ৬২-৬৪) দ্রষ্টব্য। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের উক্তিকে প্রাণরামের উক্তি মনে করে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছেন; এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। প্রাণরাম ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়ের চেয়ে প্রাচীনতর কবি,

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি গবেষকরা এই মত সমর্থন করেন। এঁদের মতের পিছনে প্রধানত একটিই যুক্তি ছিল। তা' হল এই যে, ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মত উৎকৃষ্ট কাব্য আগে রচিত হলে রামপ্রসাদ কখনই 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার সাহস পেতেন না। এই যুক্তি একেবারে অচল। কলকাতার কবি রাধাকান্ত মিশ্র ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার পনের বছর পরে—১৬৮৯ শকাব্দ বা ১৭৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাসুন্দর' লিখেছিলেন, তাঁর কাব্য মামুলি ধরনের। কালীভক্ত রামপ্রসাদ নিছক্ কাব্য রচনার জন্য 'বিদ্যাসুন্দর' লেখেন নি ; তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' প্রকৃত অর্থে 'কালিকা-মঙ্গল'—তার মধ্য দিয়ে কালীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। রামপ্রসাদ এই কাব্যে দেখিয়েছেন যে সুন্দর তার স্ত্রী বিদ্যাকে নিয়ে শ্মশানে গিয়ে শবসাধনা করছে। সুতরাং রামপ্রসাদের উদ্দেশ্য ছিল এই কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর কালীভক্তিকে অভিব্যক্তি দান—ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' আগে রচিত হয়ে থাকলেও এ দিক্ দিয়ে রামপ্রসাদের ভারতচন্দ্রের পরে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর পরে রচিত হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন যে, ১১৬৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন অর্থাৎ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের যে দানপত্রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে জমি দান করেছেন, তাতে রামপ্রসাদকে শুধু "শ্রীরামপ্রসাদ সেন" বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তাঁর 'কবিরঞ্জন' উপাধির কোন উল্লেখ নেই। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের বহু সনদ পরীক্ষা করিয়াছি—দানভাজন ব্যক্তিদের উপাধি সর্বত্র সাবধানে উল্লিখিত থাকে।" রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের বহু ভনিতাতেই তাঁর 'কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ আছে, যেমন,

কালীপাদপদ্ম তলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে তারিণী তরাও ভবসিন্ধু ॥

তিনি 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের এক জায়গায় "বসুদ্বয় বাণ চন্দ্র" শক, আর এক জায়গায় "বসু বসু বাণ চন্দ্র" শক বলে কাব্যের রচনাকাল জানিয়েছেন—এর থেকে আমরা ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পাই। "মুকুন্দনন্দন" প্রাণরাম চক্রবর্তীর লেখা এই 'কালিকামঙ্গল' ১২৪৩ বঙ্গাব্দে (১৮৩৬-৩৭ খ্রীঃ) প্রকাশিত হলেও তাকে দীর্ঘকাল ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল ছাপা বইটি পুনরাবিষ্কার করেছেন। তাঁর সৌজন্যে বইটি ব্যবহার করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

শুধু তাই নয়, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের বিশিষ্ট নামই 'কবিরঞ্জন'। সুতরাং ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের পরে রামপ্রসাদ 'কবিরঞ্জন' উপাধি পান এবং তার পরে অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার সাত বছরেরও বেশি পরে রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দর' লেখেন বলে দীনেশবাবু সিদ্ধান্ত করেছেন। দীনেশবাবুর এই সিদ্ধান্ত মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য, তবে এখানে একটা কথা আছে। রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' উপাধি যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরই দেওয়া, তার একমাত্র "প্রমাণ" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তি; এ "প্রমাণ" চূড়ান্ত নয়, কারণ ঈশ্বর গুপ্ত এ সম্বন্ধে ভুল কথাও লিখে থাকতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র যদি রামপ্রসাদকে ঐ উপাধি না দিয়ে থাকেন এবং রামপ্রসাদ যদি অন্য কারও কাছে ১৩।২।১৭৫৯ খ্রীঃর আগে ঐ উপাধি পেয়ে থাকেন, তা হলে কৃষ্ণচন্দ্র তার উপর গুরুত্ব আরোপ নাও করতে পারেন এবং রামপ্রসাদকে দেওয়া ভূমিদানপত্রে উপাধিটি উল্লেখ না করতে পারেন। সুতরাং রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের পরে-'বিদ্যাসুন্দর' লিখেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করতে হলে অন্য প্রমাণও দরকার।

সুখের বিষয়, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেই আমরা এ ব্যাপারে একটি অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি। এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'-এ দেখি হীরাবতী মালিনীর ঘরে থাকবার সময়ে তার কামাতুরার মত আচরণ দেখে সুন্দর শঙ্কিত হল এবং হীরার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তাকে বলল,

গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসি॥
প্রমথপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।
এত বলি বার টাকা ফেলে দিল কাছে॥

হীরা মালিনী হাট করে ফিরে এল। সে সুন্দরের দেওয়া বার টাকার মধ্য থেকে তিন টাকা চুরি করেছিল। তাই সুন্দরকে সে মিথ্যা করে বলল,

ছটা ছিল গরসাল ছটা ছিল মেকী।
হরে দরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি॥

অর্থাৎ বার টাকার থেকে এক-চতুর্থাংশ বাদ গিয়েছে, রইল নয় টাকা। এর পর হীরা সুন্দরকে তার জিনিসপত্র কেনার এই হিসাব দিল,

বাটা বাদে পাইলাম আড়কাট নয়।
কিনিতে বণিক দ্রব্য থোকে গেল ছয়॥

তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে।
মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে ॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি।
দু টাকায় লইলাম দুই সের ঘি ॥
এক টাকা সবেমাত্র রহে অবশেষ।
কিনিলাম তাহে বলি-উপযুক্ত মেষ ॥

হীরা মালিনীর উক্তিতে উল্লিখিত "আড়কাট" শব্দটি 'আর্কট'-এর অপভ্রংশ। এর অর্থ ইউরোপীয় বণিকদের, বিশেষভাবে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দক্ষিণ ভারতের টাকশালে নির্মিত রৌপ্য-মুদ্রা (Sinha, The Economic History of Bengal, Vol. I, 2nd Ed., p. 130) ; পলাশীর যুদ্ধের আগে নবাবী আমলে নবাবদের টাকশালে তৈরী দিল্লীর বাদশাহের নামাঙ্কিত 'শিক্কা' টাকাই ছিল বাংলার প্রধান মুদ্রা, কিন্তু এ দেশে 'আর্কট'ও চলত এবং 'শিক্কা'র সঙ্গে 'আর্কটে'র সাধারণ বিনিময়-হার ছিল ১০০ 'শিক্কা' = ১০৮ 'আর্কট', কোথাও কোথাও অবশ্য ১০০ শিক্কার বদলে আরও বেশি 'আর্কট' (সর্বাধিক ১১১) পাওয়া যেত।

যাহোক্, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে উপরে যে অংশটি উদ্ধৃত করেছি —তার থেকে দেখা যায়,

(১) সুন্দর হীরা মালিনীকে যে মুদ্রা দিয়েছিল, তাকে "টাকা" বলা হয়েছে। তা 'আর্কট' বা "আড়কাট" নয়, সম্ভবত তা বাদশাহের নামাঙ্কিত 'শিক্কা'। পরে দেখাব যে ঐ টাকা 'শিক্কা'ই।

(২) হীরা মালিনী সুন্দরের দেওয়া বার টাকা থেকে তিন টাকা চুরি করে মিথ্যা করে সুন্দরকে বলল যে ছ'টা "গরসাল" এবং ছ'টা "মেকী" টাকার জন্য বার টাকার এক চতুর্থাংশ বাদ গিয়েছে (পৃঃ ৩৩৮ দ্রঃ) এবং বাকী নয় টাকার বদলে বাটা বাদ দিয়ে নয় "আড়কাট" পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ নয় 'আর্কট' + বাটা = নয় 'টাকা'। এর থেকে বোঝা যায়, সুন্দরের দেওয়া 'টাকা'র মূল্য 'আর্কট'-এর চেয়ে বেশি ছিল।

(৩) হীরা মালিনী সুন্দরের দেওয়া বারটা টাকার মধ্যে ছ'টাকে "গরসাল" এবং ছ'টাকে "মেকী" বলেছে। "মেকী" কথাটার মানে আমরা জানি। কিন্তু "গরসাল" কী জিনিস ? "গরসাল" মানে 'সালের নয়' (not of the year) অর্থাৎ অন্য বছরের টাকা। এর দাম চলতি বছরের টাকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত

কম। বাংলা দেশে কেবল মাত্র 'শিক্কা'র ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু ছিল। এ সম্বন্ধে ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন, "In Bengal we find that at the end of three years the *sicca* rupees were termed *sonauts* and 'the denomination, sank gradually in three years in the proportion of 116 to 111.'···The under valuation of all *siccas* of an earlier date than the current year became established · (The Economic History of Bengal, Vol. I, 2nd Ed., pp. 129-30).

এর থেকে বোঝা যায় যে, সুন্দর হীরা মালিনীকে যে টাকা দিয়েছিল, তা 'শিক্কা'ই। কিন্তু এই 'শিক্কা' "গরসাল" হলেও তা বাজারে ব্যবসায়ীরা নিত, কেবল তার দাম কম হত। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখি হীরা মালিনী "বাটা" দিয়ে সুন্দরের দেওয়া টাকার বদলে 'আর্কট' বা 'আড়কাট' সংগ্রহ করার পরেই বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারল। এর থেকে বোঝা যায় যে, 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার সময়ে রামপ্রসাদের বাসভূমিতে দোকানদাররা 'শিক্কা' বা 'সনৌৎ'কে গ্রহণ করত না, কিন্তু 'আর্কট'কে তারা নিত।* এই বিষয়টি এক অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচায়ক। পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলায় এই জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা দিয়েছিল। তার আগে—অর্থাৎ আলীবর্দী, সিরাজুদ্দৌলাহ প্রভৃতি নবাবদের আমলে এবং ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' রচনার সময়ে এই জাতীয় অবস্থা ছিল না, থাকতে পারে না—তখন 'শিক্কা' ছিল সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য মুদ্রা এবং 'আর্কট' তার আশাপাশি চালু থাকলেও তার পক্ষে বাংলার কোন জায়গার নির্ভরযোগ্যতম মুদ্রা হয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন, "The currency was ill-regulated from 1757 to 1793.·······The term *batta* was used sometimes to signify a proportional denomination, at other times an arbitrary and disproportional denomination.···In distant parts of Bengal *sonauts* obtained currency, in some areas *arcots*.······In different districts different coins became current". [History of Bengal (1757-1905), C. U., pp. 111-12]

ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ অন্যত্র বলেছেন যে এই পরিস্থিতি চলার সময়ে "In the district of Nadia all commercial transactions were carried on in Arcot Rupees." (The Economic History of Bengal, Vol. I, 2nd Ed., p. 137) রামপ্রসাদের দেশ হালিশহর তখন নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সুতরাং সেখানে 'আর্কট'ই চলত।

ডঃ সিংহের এইসব উক্তির সঙ্গে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর পূর্বোদ্ধৃত অংশ ও সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনাকে মিলিয়ে পড়লে সকলেই বুঝতে পারবেন যে, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' ১৭৫৭ খ্রীঃর আগে রচিত নয়। সুতরাং তা ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর পরে রচিত হয়েছিল বলে প্রমাণিত হল। প্রকৃত পক্ষে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কয়েক বছর পরে—যখন বাংলার অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে—তখন রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দর' লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

এখন আমরা আর একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব। রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন'-এর ভনিতায় রাজকিশোর নামে এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ প্রগাঢ় প্রীতির সঙ্গে এঁর নাম উল্লেখ করেছেন, এঁর মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন এবং এঁকে কালীর কৃপাপ্রাপ্ত লোক বলেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই রাজকিশোর কে?

রামপ্রসাদ অন্তত ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে জীবিত 'রাজকিশোর' নামে দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ আমরা দুই সমসাময়িক সূত্র থেকে পাচ্ছি।

এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের নাম "মুখ রাজকিশোর" অর্থাৎ রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গলে' এঁর নাম উল্লেখ করেছেন এইভাবে,

ভূপতির (কৃষ্ণচন্দ্রের) পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।
তাঁর কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥
ভূপতির পিসার জামাই তিন জন।
কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন॥
মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর।
মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর॥

সুতরাং রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের পিসেমশায় শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাই।

দ্বিতীয় রাজকিশোরের পুরো নাম 'রাজকিশোর রায়'। এঁর উল্লেখ পাই বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গলে' (লেখকের নিজের হাতে লেখা পুথি অবলম্বনে সম্পাদিত হয়ে ১৩২২ বঙ্গাব্দে এই বইটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়)। 'তীর্থমঙ্গলে'র রচনাকাল ১৩৭৭ সনের ভাদ্র মাস অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীঃ। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সদলবলে জলপথে তীর্থযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ এই বইয়ে মেলে, বিজয়রাম ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের দলের অন্যতম লোক। বিজয়রাম লিখেছেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের বজরা হুগলীর ঘাটে এলে

হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিল পায় ॥
বৈদ্যের প্রধান তিনী বড় কুলবান।
এ দেশে নাহিক লোক তাঁহার সমান ॥

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কোন কোন তায়দাদেও এই রাজকিশোর রায়ের নাম পেয়েছিলেন বলে আমাকে বলেছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন'-এর ভনিতায় উল্লিখিত রাজকিশোর হলেন রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়, আর নগেন্দ্রনাথ বসু ('তীর্থমঙ্গল'-এর সম্পাদক), অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট গবেষকের মতে ইনি রাজকিশোর রায়।

কয়েকটি বিষয় থেকে মনে হয় এই রাজকিশোর—রাজকিশোর রায় নন। সেগুলি এই,

(১) মহাধনী রাজকিশোর রায়ের যদি রামপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকত, তা হলে তিনি রামপ্রসাদকে নিশ্চয়ই অনেক জমিজমা দিতেন। কিন্তু রামপ্রসাদের ভূসম্পত্তির যে বিবরণ ও দলিলপত্র পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্য থেকে রাজকিশোরের দেওয়া কোন সম্পত্তির সন্ধান মেলে না।

(২) রামপ্রসাদ বিষয়াসক্তিশূন্য ছিলেন বলে তাঁর চরিতকারেরা লিখে গিয়েছেন। সুতরাং যে রাজকিশোর রায়ের একমাত্র অর্থ ও কুল ছাড়া আর কিছু ছিল বলে জানা যায় না, তাঁর সঙ্গে রামপ্রসাদ ঘনিষ্ঠতা করবেন এবং কাব্যে তাঁর নাম উল্লেখ করবেন বলে ভাবা কঠিন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রামপ্রসাদ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, সুভদ্রা দেবী, দর্পনারায়ণ রায় প্রভৃতি যে সব

ধনী ব্যক্তির কাছে ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন, তাঁদের কারও নাম তাঁর কোন কাব্যে উল্লেখ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, রামপ্রসাদ তাঁদের কাছ থেকে অযাচিতভাবে ঐ সব সম্পত্তি পেয়েছিলেন।

(৩) রাজকিশোর রায় রামপ্রসাদের স্বজাতীয় ও নিকটবর্তী এলাকার লোক হলেও তাঁর সঙ্গে রামপ্রসাদের যোগাযোগের কোন প্রত্যক্ষ সূত্র পাই না। পক্ষান্তরে, রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত।

এগুলি অবশ্য নঙর্থক প্রমাণ। 'কালীকীর্তন'-এর যে সব ভনিতায় রাজকিশোরের নাম আছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে এখন দেখাচ্ছি যে এ রাজকিশোর রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ই। ভনিতাগুলি এই,

(১) শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্ট সুতজ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥

(২) কল্পতরুতলে শ্রীরাজকিশোর ভাষে
বাঞ্ছাফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর
দীনদয়াময়ি সন্তত ছল ছলনা॥

(৩) রাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী।
কালিকা-বিজয়ী হরি চিত্ত-মোহ হরি॥
আনন্দে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে।
তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে॥

ভনিতাগুলিতে শুধু রাজকিশোরের কালীভক্তির কথাই বলা হয় নি, তাঁর কবিত্বশক্তির কথাও বলা হয়েছে। প্রথম ভনিতায় রামপ্রসাদ বলেছেন যে রাজকিশোর পুরাণ প্রমাণ অবলম্বনে গান "প্রকাশ" করেছিলেন, যা প্রসিদ্ধ হয়েছে ; এই গান শুনে অরসিক অভক্ত অধম লোক হাসত, কিন্তু "করুণাময়ীর দাস" রাজকিশোর প্রেমানন্দে ভাসতেন। দ্বিতীয় ভনিতায় রামপ্রসাদ আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে রাজকিশোরের ভাষে (বাণীতে) বাঞ্ছাফল ফলত অর্থাৎ

রাজকিশোর কালীবিষয়ক গান রচনায় সার্থকতা ও কালীর কৃপা লাভ করলেন, ভাগ্যহীন কবিরঞ্জন তা লাভ না করে কাতর। তৃতীয় ভনিতায় রামপ্রসাদ বলেছেন যে কালীর কৃপায় রাজকিশোরের মুখে বাণী বাস করেন। আমাদের বিবেচ্য দু'জন রাজকিশোরের মধ্যে কেবলমাত্র রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়েরই কবিত্বশক্তি ছিল, তাঁকে স্বয়ং মহাকবি ভারতচন্দ্র "কবিত্বকলাধর" বলেছেন।

এই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ই রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন'-এর ভনিতায় উল্লিখিত হয়েছেন। তিনি ঠিক রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। রামপ্রসাদ ও রাজকিশোর দু'জনেই কবি ও কালীভক্ত বলে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রাজকিশোর নিজে পুরাণ অবলম্বনে কালীবিষয়ক "গান" রচনা করেছিলেন (যা এখন আর পাওয়া যায় না) এবং রামপ্রসাদকেও কালীকীর্তন রচনা করতে বলেছিলেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসকে ঘিরে যেমন উৎকট 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' আছে, শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদকে ঘিরেও তেমনি একটি ছোটখাট 'রামপ্রসাদ-সমস্যা' রয়েছে। এখন আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

এই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রশ্ন এই—হালিশহর-কুমারহট্ট নিবাসী যে রামপ্রসাদ সেনের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় এবং যিনি 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'কালীকীর্তন' রচনা করেছিলেন—তিনি শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন কিনা ?

হাস্যকর বলে মনে হলেও এ প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার। কারণ 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'কালীকীর্তনে' "রামপ্রসাদী" ঢঙের শ্যামাসঙ্গীত একটিও পাওয়া যায় নি এবং "রামপ্রসাদী" শ্যামাসঙ্গীতের কোন পুথিতে কবির ব্যক্তিপরিচয় বা পারিবারিক পরিচয় পাওয়া যায় নি। তা' হলেও হালিশহরের রামপ্রসাদ ও শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা রামপ্রসাদের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের সন্ধান মেলে, যার থেকে বলা যায় যে, দু'জনে অভিন্ন। সেগুলি এই,

(১) রামপ্রসাদের কোন কোন শ্যামাসঙ্গীতে কবির বাসভূমি হিসাবে কুমারহট্ট-হালিশহরের উল্লেখ পাওয়া যায় (সা. প. প. ১৩৫২, পৃঃ ৮ দ্রঃ)।

(২) হালিশহরের রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' উপাধি ছিল। বহু "রামপ্রসাদী" শ্যামাসঙ্গীতের ভনিতায়ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি উল্লিখিত হয়েছে (কালীপ্রসন্ন

কাব্যবিশারদ সঙ্কলিত 'প্রসাদ-পদাবলী', পদসংখ্যা ৮৪, ৯১, ৯৫, ৯৮, ১২০, ২২৭ দ্রষ্টব্য)।

(৩) "রামপ্রসাদী" শ্যামাসঙ্গীতগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বাবলী প্রত্যক্ষভাবে বা রূপকের মধ্য দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, এদের রচয়িতা তন্ত্রের সাধক ছিলেন। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'-এ সুন্দরের শবসাধনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—তা পড়লে কারও সন্দেহ থাকে না যে, এর রচয়িতাও তন্ত্রের সাধক ছিলেন।

(৪) ঐ শবসাধনার বর্ণনা সুরু করার ঠিক আগেই কবি লিখেছেন,

বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত॥

এর থেকে বোঝা যায়, এই কবি শুধু গ্রন্থকার ছিলেন না, তিনি গানও (অর্থাৎ শ্যামাসঙ্গীত) রচনা করতেন।

তা ছাড়া, এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, হালিশহরের রামপ্রসাদের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর গ্রন্থাবলী ও পদ পুথি থেকে সংগ্রহ করেন; ('সংবাদ-প্রভাকর' থেকে মোট ৬৬টি পদ এ পর্যন্ত উদ্ধার করা গিয়েছে)। তখনও রামপ্রসাদের কোন কোন পৌত্র এবং তাঁকে দেখেছে, এমন কোন কোন লোক জীবিত ছিলেন; এঁদের চোখে ধুলো দিয়ে হালিশহরের রামপ্রসাদের নামে অন্য রামপ্রসাদের লেখা শ্যামাসঙ্গীত প্রচলিত হল, পুথিতে লেখা হল এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করল, এমন হতে পারে না। অতএব হালিশহরের কবিই যে শ্যামাসঙ্গীত লিখেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে এটা ঠিক্ যে, রামপ্রসাদ-নামাঙ্কিত সমস্ত শ্যামাসঙ্গীতই হালিশহরের কবির লেখা নয়। এইসব শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে একাধিক কবির রচনা মিশে গিয়েছে। রামপ্রসাদ-নামাঙ্কিত অনেক পদে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভনিতা দেখা যায়। আর কোন কোন পদে 'আপীল', 'ডিক্রি', 'ডিসমিস' প্রভৃতি ইংরেজী ও আইন-আদালত ঘটিত শব্দ পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। উপরন্তু, তাঁর 'কালীকীর্তন,' 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি কাব্যে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভনিতা কোথাও নেই। সুতরাং 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভনিতার পদগুলি তাঁর লেখা হতে পারে না। আর রামপ্রসাদের সময়ে পূর্বোক্ত ইংরেজী শব্দগুলি বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত হয়েছিল বলে কিছুতেই মনে করা যায় না। সুতরাং ঐ সব শব্দ সংবলিত পদগুলিও তাঁর লেখা নয়। এই দুই শ্রেণীর পদ

কার লেখা, সেটিই রামপ্রসাদ-সমস্যার অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আরও কয়েকজন রামপ্রসাদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নীচে তাঁদের পরিচয় দিলাম।

(১) পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ। পূর্ববঙ্গে যে রামপ্রসাদ নামে একজন শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন, এই ইঙ্গিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম দেন। পরে আরও অনেকে সে কথা বলেন। 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভনিতাযুক্ত কতকগুলি পদে পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষার ছাপ সুস্পষ্টভাবে ধরা যায়। সুতরাং এগুলি পূর্ববঙ্গ-নিবাসী কোন কবির লেখা বলে স্বীকার করতে বাধা নেই। ঢাকা জেলার চিনিশপুর গ্রামে এক পুরাতন কালীবাড়ি আছে; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন যে এই কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেন রামপ্রসাদ নামে একজন ব্রাহ্মণ শক্তিসাধক। দীনেশবাবুর মতে ইনিই ঐ গানগুলির রচয়িতা এবং ইনি রামপ্রসাদ সেনের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক।

দীনেশবাবুর এই মত কোন কোন গবেষক গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই মতের অনুকূলে যে কত কম তথ্য-প্রমাণ আছে, তা তাঁরা বিবেচনা করে দেখেন নি। প্রথমত, চিনিশপুরের রামপ্রসাদের অস্তিত্বই দীনেশবাবু সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে পারেন নি। এই রামপ্রসাদের পরিচয় সম্বন্ধে তিনি (অন্য সূত্র দ্বারা অসমর্থিত) একটি বংশলতা এবং কয়েকটি আধুনিক কিংবদন্তীর বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নি; কিংবদন্তীগুলিও আবার অলৌকিক-রসাশ্রিত। দ্বিতীয়ত, যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া যায় যে চিনিশপুরে রামপ্রসাদ নামে একজন ব্রাহ্মণ শক্তিসাধক ছিলেন—তা' হলেও প্রমাণ হয় না যে তিনি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন; দীনেশবাবু কোন প্রাচীন বা আধুনিক সূত্র থেকেই এই রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত রচনা করার কোন উল্লেখ দেখাতে পারেন নি। সুতরাং 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভনিতাযুক্ত পদগুলির রচনাকর্তৃত্ব চিনিশপুরের রামপ্রসাদের উপর অর্পণ করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

দীনেশবাবুর মত সত্য হলে বলতে হবে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও চিনিশপুরের রামপ্রসাদ একই সময়ে বাংলার দুই বিভিন্ন অঞ্চলে জীবিত ছিলেন এবং পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে ও কেউ কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অবিকল একই রীতিতে তাঁরা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, যে রীতিতে তার আগে কোন কবি শ্যামাসঙ্গীত লেখেন নি। এ ব্যাপার অসম্ভব। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সব গান দীনেশবাবু চিনিশপুরের

রামপ্রসাদের রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন, তাদের অনেকগুলিতে "প্রসাদ বলে" ভনিতা পাওয়া যায়, যা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিশিষ্ট ভনিতা। ততোধিক আশ্চর্যের বিষয়—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের 'জগদীশ্বরী' নামে একটি মেয়ে ছিল বলে তিনি নিজে 'বিদ্যাসুন্দরে' লিখেছেন, আবার দীনেশবাবুর সংগৃহীত কিংবদন্তী অনুসারে চিনিশপুরের রামপ্রসাদের মেয়ের নামও 'জগদীশ্বরী'! শক্তিদেবী স্বয়ং রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধেছিলেন, এই প্রবাদ ও এ-সংক্রান্ত গান দীনেশবাবু চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে মনে করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঐ প্রবাদ রটেছিল (দীনেশবাবুর লেখা 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন', পৃঃ ১৭ দ্রষ্টব্য)।*

দীনেশবাবু বিক্রমপুরের সাধনসঙ্গীত-রচয়িতা রাজমোহন আম্বলী তর্কালঙ্কারের (১৮২৪-৮৬ খ্রীঃ) "রামপ্রসাদের রা পেয়েছি রাজমোহন কয় ঐ জোড়ে ভাই" ইত্যাদি উক্তি চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলে মনে করেন, কারণ "রাজমোহন কস্মিনকালেও হালিশহরে আসেন নাই এবং কবিরঞ্জনের 'রা' পাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল।" কিন্তু "রামপ্রসাদের 'রা' পেয়েছি"—এই কথায় রাজমোহন বোঝাচ্ছেন যে দৈবক্রমে তিনি তাঁর নামের যে আদ্যাক্ষর (রা) পেয়েছেন, তা রামপ্রসাদের নামের আদ্যাক্ষরের সঙ্গে অভিন্ন† এবং এই রামপ্রসাদ নিঃসন্দেহে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ।

* দেবীর বেড়া-বাঁধার প্রবাদটি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও এই বিষয় সংক্রান্ত বিখ্যাত গানটি ("মন কেন মার চরণ ছাড়া") কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের লেখা নয়, বস্তুত এটি কোন রামপ্রসাদেরই লেখা নয়। এই প্রবাদটি স্মরণ করে ও এটিকে সত্য বলে জেনে পরবর্তীকালে কোন অজ্ঞাতনামা কবি গানটি রচনা করেছিলেন। গানটিতে কোন ভনিতাও নেই।

† যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সর্বপ্রথম এই বিষয়টির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃঃ ২১৩)। যোগেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, "রাজমোহন সর্বদা পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম-অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেন, এবং কলিকাতাতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তাঁহার জীবনীতেও ইহার উল্লেখ আছে।" সুতরাং রাজমোহন কবিরঞ্জন-রামপ্রসাদের কথা ভালভাবেই জানতেন। রাজমোহনের যত গানে রামপ্রসাদের উল্লেখ আছে, তাদের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যোগেন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে রাজমোহন কবিরঞ্জন-রামপ্রসাদের কথাই বলেছেন। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ৬৩ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত দু'টি প্রবন্ধে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের রামপ্রসাদ সংক্রান্ত বহু উক্তির ভুল দেখিয়েছেন ও তা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ তিনি করেন নি বা নিজের পূর্বমত সমর্থনের চেষ্টা করেন নি। এর থেকে মনে হয়, তিনি এ ক্ষেত্রে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

"রামপ্রসাদ" বলতে রাজমোহন যে চিনিশপুরের রামপ্রসাদকে বোঝান নি, তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় দয়ালচন্দ্র ঘোষের 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' বইয়ের (১ম সংস্করণ) ভূমিকা থেকে। ঐ ভূমিকায় দয়ালচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন যে হালিশহরের রামপ্রসাদের দেশ-কাল সম্বন্ধে জানবার পর তিনি অনেক "প্রসাদী সঙ্গীত" সংগ্রহ করেন; যে সব প্রসাদী গানের ভনিতা পাওয়া যায় নি, সেগুলি তিনি "যাঁহার নিকট হইতে যে সঙ্গীতটি লওয়া গিয়াছে, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ 'এটি প্রসাদী সঙ্গীত কিনা?' জিজ্ঞাসা করিয়া, সাধ্যমত অনুসন্ধান করিয়া, এবং অনেকের ঐক্যমতে এক একটিকে গ্রহণ" করেন। তিনি লিখেছেন, "অতঃপর বিক্রমপুর-নিবাসী এক্ষনকার শক্তিসেবক শ্রীযুক্ত রাজমোহন আম্বলি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যথাসম্ভব সন্দেহ দূর করিয়াছি।" এর থেকে জানা যায় যে, রামপ্রসাদ সম্বন্ধে দয়ালচন্দ্রের সঙ্গে রাজমোহনের আলাপ-আলোচনা হত। দয়ালচন্দ্র 'প্রসাদ-প্রসঙ্গে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে স্বতন্ত্র একজন কবির অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন, কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন নি এবং চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি বিন্দুবিসর্গও লেখেন নি। রাজমোহন আম্বলি তর্কালঙ্কার যদি চিনিশপুরের রামপ্রসাদের ভাবশিষ্য হতেন, তাহলে তিনি দয়ালচন্দ্রকে নিশ্চয়ই বলতেন যে চিনিশপুরে রামপ্রসাদ নামে একজন শক্তিশালী শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন এবং তা' হলে দয়ালচন্দ্রও দ্বিজ রামপ্রসাদের পরিচয় সম্বন্ধে এরকম অন্ধকারে হাতড়াতেন না। এর থেকে বোঝা যায় যে রাজমোহন আম্বলি তর্কালঙ্কার চিনিশপুরের রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদৌ অবহিত ছিলেন না এবং তিনি রামপ্রসাদ বলতে কেবলমাত্র হালিশহরের রামপ্রসাদকেই জানতেন।

দীনেশবাবু ১৮২৫ শকে বা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত (পূর্ববঙ্গে আবিষ্কৃত) "আদিবৃত্ত" গ্রন্থে প্রদত্ত সিদ্ধপুরুষদের নামমালায় যে "রামপ্রসাদ ঠাকুর"-এর উল্লেখ পেয়েছেন, তিনিও নিঃসন্দেহে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ—চিনিশপুরের রামপ্রসাদ নন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে সর্বত্র কবি ও সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদ বলতে লোকে একজনকেই জানত—তিনি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। চিনিশপুরে যদি রামপ্রসাদ নামে কোন বড় সাধক ও শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা আবির্ভূত হয়েও থাকেন—তা' হলেও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের অনেক আগেই পূর্ববঙ্গের লোকের মন থেকে যে তাঁর স্মৃতি মুছে গিয়েছিল, তা দয়ালচন্দ্র ঘোষের 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ'র প্রথম সংস্করণের (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) ভূমিকা

পড়লে বোঝা যায়। সুতরাং পূর্ববঙ্গের কোন সূত্রে 'রামপ্রসাদ' নামের উল্লেখ দেখলেই তা চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এখন, অন্য যে সব রামপ্রসাদের সন্ধান মিলেছে, তাঁদের কথা বলি।

(২) কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তী। এঁর জীবৎকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভনিতাযুক্ত কিছু পদ এঁরই লেখা বলে কেউ কেউ মনে করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেসব পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্যে এঁর পদ একটিও নেই, যেহেতু ইনি গুপ্তকবির সমসাময়িক ছিলেন।

(৩) প্রণয়ী দ্বিজ রামপ্রসাদ। ডঃ সুকুমার সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে লেখা একটি পুথিতে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভনিতায় একটি গান পেয়েছেন, তাতে ব্যর্থ প্রণয়ীর খেদ প্রকাশিত হয়েছে। ইনি-কোন শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ মেলে না।

(৪) 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচয়িতা দ্বিজ রামপ্রসাদ। বিশ্বভারতীর পুথি-শালায় 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত একটি 'সত্যপীরের পাঁচালী'র দুখানি পুথি আছে। একটির লিপিকাল ১৭১১ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ বা ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। একখানি পুথিতে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায়,

সাক চন্দনের পিষ্টে সমুদ্রে অমর।
নিরূপন তাহার পিষ্টেতে রাখী সর॥

(পুঁথি-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯২)

চন্দন = চন্দ্র = ১, সমুদ্র = ৭, সব = শর = ৫। "অমর" শব্দের পারিভাষিক অর্থ অজ্ঞাত। কিন্তু "অমর" শব্দের অর্থ '০' না ধরে অন্য কিছু ধরলে গ্রন্থের রচনাকাল পুথির লিপিকালের পরবর্তী হয়ে পড়ে, যা অসম্ভব। এক্ষেত্রে 'অমর' নিঃসন্দেহে 'অম্বর' (= আকাশ = ০)-এর বিকৃত রূপ। সুতরাং ১৭০৫ শকাব্দ বা ১৭৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দই দ্বিজ রামপ্রসাদের সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল। এই দ্বিজ রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন কিনা, তা বলবার কোন উপায় নেই।

(৫) বন্দ্যঘটীয় বংশের রামপ্রসাদ রায়। ইনি তাঁর পিতা জগৎরাম রায়ের সঙ্গে মিলে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' ও 'অদ্ভুত-আশ্চর্য রামায়ণ' লিখেছিলেন। এই দুই গ্রন্থের রচনাসমাপ্তিকাল যথাক্রমে ১৭৭০ খ্রীঃ ও ১৭৯১ খ্রীঃ। ইনিও জাতিতে 'দ্বিজ' ছিলেন, সুতরাং রামপ্রসাদ ভনিতাযুক্ত পদাবলীর মধ্যে এঁর পদ থাকাও অসম্ভব নয়। তবে এঁর শ্যামাসঙ্গীত রচনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৬) পেস্কার রামপ্রসাদ। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "চিনীশপুরের রামপ্রসাদের অনুকরণে যাঁহারা শাক্তসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন চিনীশপুরের সংলগ্ন জিনার্দীগ্রাম নিবাসী রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।...তিনিও 'তান্ত্রিক' ছিলেন, অর্থাৎ বামাচারী শাক্ত ছিলেন এবং কর্ম্মজীবনে ঢাকা কালেক্টরীর 'পেস্কার' ছিলেন। তাঁহার জামাতা ঢাকা জিলার মহেশ্বরদির অন্তর্গত পারলীয়ানিবাসী মদনমোহন চক্রবর্ত্তী প্রায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৯৫ বৎসর বয়সে স্বর্গত হন—এতদ্দ্বারা তাঁহার অভ্যুদয়কাল মোটামুটি জানা যায়।" যে সমস্ত গানে ডিক্রী, ডিস্‌মিস্, ইষ্টাম্বরি, সদর প্রভৃতি আইন-আদালত-ঘটিত শব্দ আছে, সেগুলি এই 'পেস্কার' রামপ্রসাদের রচনা বলে দীনেশবাবু মনে করেন। কিন্তু 'পেস্কার' রামপ্রসাদের জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে কোন তথ্য ও প্রমাণ তিনি প্রকাশ করেন নি। কাজেই এ সম্বন্ধে তাঁর মত স্বীকার করা, এমন কি পেস্কার রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়াও কঠিন।

(৭) নাটোরের রামপ্রসাদ—নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের ভাই রামপ্রসাদ 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভনিতায় শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যা' হোক্, রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এই সমস্যা—অর্থাৎ (১) "দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভনিতাযুক্ত গানগুলি, (২) কেবল পূর্ববঙ্গে প্রচলিত "রামপ্রসাদী" গানগুলি, (৩) "ডিক্রী," "ডিস্‌মিস্" প্রভৃতি ইংরেজী ও আদালতঘটিত শব্দযুক্ত গানগুলি এবং (৪) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের লেখা নয়, এ রকম অন্যান্য শ্যামাসঙ্গীত কার বা কাদের লেখা, তার সমাধান করা কঠিন কাজ। এগুলি একই লোকের লেখা হতে পারে, আবার একাধিক লোকের লেখাও হতে পারে। একাধিক লোকের লেখা হবারই সম্ভাবনা বেশি। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সমস্ত গানই কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পরবর্তী কালে তাঁর গানের অনুকরণে লেখা। 'রামপ্রসাদ' নাম নয়, এ রকম অনেক লোকও "রামপ্রসাদ" বা "প্রসাদ' ভনিতা দিয়ে গান রচনা করে গিয়েছেন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের গুরু কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। 'কালীকীর্ত্তনে'র নিম্নোদ্ধৃত ভনিতা থেকে আমাদের মনে হয়, রামপ্রসাদের গুরুর নাম ছিল কৃপানাথ,

কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ
প্রাণদান দিয়া লৈতে চায় ॥

রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' ও 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থ যেভাবে ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে অসংখ্য স্থানে পাঠ-নির্ধারণে ভুল এবং মুদ্রণ-প্রমাদ দেখা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইতিপূর্বে আমরা পৃঃ ৩২৫-২৬ এ যে গুরুত্বপূর্ণ ছত্র দুটি উল্লেখ ও ব্যবহার করেছি, সে দু'টি ছত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

ছটা ছিল গরসাল ছটা ছিল মেকী।
হরে দরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি ॥

এখানে প্রথম ছত্রের পাঠে ভুল আছে। বিশুদ্ধ পাঠ সম্ভবত ছিল "দুটা ছিল গরসাল দুটা ছিল মেকী।" কিংবা "দুটা ছিল গরসাল দুটা ছিল মেকী।" পুরোনো বাংলা পুথিতে 'ছ' এবং 'দু' একইভাবে লেখা হত। উপরে উদ্ধৃত পাঠ যে ভুল, তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ ছ'টা মেকী টাকা থাকলে তার মূল্য হবে শূন্য এবং বাদবাকী ছয় টাকা "গরসাল" হওয়ার ফলে সুন্দরের দেওয়া বার টাকার বদলে পাঁচ টাকার সামান্য কিছু বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু হীরা মালিনা নিজেই বলেছে যে সে বার টাকার সিকি বাদ দিয়ে নয় টাকা পেয়েছে সুতরাং মেকী টাকার সংখ্যা দুই-এর বেশি হতে পারে না। তা ছাড়া সুন্দরের মত অভিজ্ঞ লোকের কাছে হীরা মালিনীর মত মিথ্যাবাদিনীরও এ কথা বলার সাহস হবে না যে, তার দেওয়া বার টাকার মধ্যে ছয় টাকাই মেকী ছিল। রামপ্রসাদের বই দু'টির এই জাতীয় পাঠভ্রান্তি ও মুদ্রণ-প্রমাদ তাঁর সম্বন্ধে সুষ্ঠু গবেষণার প্রতিবন্ধক।

পরিশিষ্ট 'ক'

জব চার্নকের আগেকার 'কলিকাতা'

এই বইয়ের 'দুই', 'সাঁইত্রিশ' ও 'উনচল্লিশ' সংখ্যক অধ্যায়ে আমরা বলেছি যে—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে জব চার্নকের 'কলিকাতা'য় পদার্পণ করা থেকেই 'কলিকাতা'র ইতিহাস স্বরু হয় নি। তারও অনেক আগে থাকতে যে 'কলিকাতা' একটি বিশিষ্ট জনপদ ছিল, তার প্রমাণ আছে। ইতিপূর্বে আমার 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' বইয়ে (পৃঃ ১২০-২৩) এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলাম। ঐ বই প্রকাশিত হবার পরে 'চার্ণক্য' ছদ্মনামধারী জনৈক লেখক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়-পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'-এর উল্লেখ করে 'কলিকাতা'র প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমার প্রদত্ত তথ্যগুলির সার সংকলন করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এর অনেক পরে—১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে—প্রকাশিত 'অচেনা শহর কলকাতা' নামে একটি বইয়ে আমার বা 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' এর নাম উল্লেখ না করে আমার দেওয়া তথ্যগুলির পুনরুক্তি করা হয়েছে। যা হোক, এই পরিশিষ্টে বিষয়টি নিয়ে আবার আলোচনা করছি এবং আগেকার আলোচনার ভ্রম ও সংশোধন করছি।

ইংরেজরা বাংলার স্ববেদার শাহজাদা আজিমুস্সানের কাছ থেকে স্বতানুটি ও গোবিন্দপুরের সঙ্গে 'কলিকাতা' গ্রামও কিনেছিল (১৬৯৮ খ্রীঃ)—এই কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। ১৬৯৮ খ্রীঃর বহু আগে থাকতেই 'কলিকাতা'র নাম 'কলিকাতা'। এ নাম কিসের থেকে এল, তা নিয়ে আধুনিক গবেষকরা অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তাঁর 'রিয়াজুস-সলাতীন' বইয়ে (রচনাকাল ১৭৮৮ খ্রীঃ) লিখেছেন যে 'কলিকাতা' নামটি 'কালীকর্তা' (যা এই স্থানের পুরোনো নাম) শব্দের অপভ্রংশ। 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে গোলাম হোসেনের সাক্ষ্য সবচেয়ে পুরোনো বলে এর মূল্য অপরিসীম।

যা হোক্, ১৬৯৮ খ্রীঃর কয়েক বছর আগে জব চার্নক 'কলিকাতা'র মাটিতে পদার্পণ করেন। তারও আগে যে 'কলিকাতা' শহর হোক্ বা না হোক্—একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, আমরা এখন তা' দেখাচ্ছি।

কৃষ্ণদাসের 'নারদপুরাণ' নামে একটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬১৮-১৯) থেকে এর বিবরণ উদ্ধৃত করছি।

"হ. লি. (হস্তলিপি) ১১০৮ সাল। গ্রন্থশেষে কবির পরিচয় এইরূপ, 'অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার। সুবর্ণবণিককুলে উৎপত্তি আমার॥ পৈত্রিক বসতি পূর্ব্বে অম্বিকানগর। হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর॥ পিতামোহ নাম ছিল মদনমোহন। পিতা তারাচাঁদ নাম ধর্ম্মপরায়ণ॥ এ সকল পুণ্যবান্ আছে পূর্ব্বকীর্ত্তি। এ অধমের সংসারে অপকীর্ত্তি॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল রামনারায়ণ। ভেক আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ॥ রঘুনাথ মধ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান। স্বর্গবাসে গেলা তিঁহ চাপিয়া বিমান॥ আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম। সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম॥ দশ দশ শত নিরেনব্বুই সালে। মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে॥' "

১০৯৯ সাল (বঙ্গাব্দ) = ১৬৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব জব চার্নক কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করবার আগেও যে এখানে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক বাস করতেন এবং এখানে বহুবাজার নামে পাড়া ছিল, এইসব তথ্য উপরের উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য কোন কোন পুথিতে "দশ দশ শত নিরেনব্বুই সালে"র বদলে "সন এগার শত নিরানব্বই সালে" পাঠ মেলে। শেষোক্ত পাঠ যদি অকৃত্রিম হয় এবং দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক ব্যবহৃত পুথির লিপিকাল ১১০৮ সাল ও আর একটি পুথির লিপিকাল ১১৩৪ সাল যদি মল্লাব্দ হয়—তা হলে অন্য কথা। যা হোক্, নারদপুরাণের সাক্ষ্য বাদ দিলেও আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অন্য অনেক প্রামাণিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ 'ভাষাভাগবত' নাম দিয়ে ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের যে বাংলা অনুবাদ প্রণয়ন করেন, তার দ্বিতীয় স্কন্ধের রচনাসমাপ্তিকাল ১৬১৬ শকের তৈষ (পৌষ) মাস অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ; কবির ভাষায়,

যোলশ ষোড়শ শাকে তৈষ শেষ হৈতে।

অন্যান্য স্কন্ধ এর কিছু আগে ও পরে রচিত হয় (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৭২-৭৩ দ্রষ্টব্য)। 'ভাষাভাগবতে'র নবম স্কন্ধে কবি নিজের এই বংশপরিচয় দিয়েছেন,

কলিকতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ।
তাঁর পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র॥

তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা।
ভাষাভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা॥

সনাতন ঘোষাল যখন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভাগবতের অনুবাদ করেছেন, তখন তাঁর পিতামহ কৃষ্ণানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পরবর্তী হবেন না। কৃষ্ণানন্দ 'কলিকতা ঘোষাল বংশে' জন্মেছিলেন বলা হয়েছে। 'কলিকতা' বা 'কলিকাতা'র নাম যুক্ত করে একটি বংশের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, এর থেকে প্রমাণ হয় 'কলিকাতা' ইংরেজদের আসবার আগেও বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং এই বিশিষ্টতা ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই সে লাভ করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আরও দুটি সূত্রের সাক্ষ্যও এই বিশিষ্টতার প্রমাণ দিচ্ছে। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফান্ ডেন্ ব্রোক্ নামে একজন পর্তুগীজ বণিক একখানি মানচিত্র এঁকেছিলেন। তাতে ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে Calcutta বন্দরের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। (বাংলার নদনদী, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ১৫, পৃঃ ২৪-২৫ দ্রষ্টব্য)।

১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম দাস কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৯-৬১ দ্রঃ)। তার সূচনাতেই তিনি বলেছেন,

অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগণা তায়।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যায়॥

আর এক জায়গায় কৃষ্ণরাম লিখেছেন,

ভাগীরথীর পূর্বতীর অপুরুব নাম
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান॥

আরও এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,

সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাতা নাম তার
পরগণা অনুপম ক্ষিতি।
সাবর্ণি চৌধুরী জায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
পশ্চিমে আপনি ভাগীরথী॥

নিমতা গ্রামের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও যখন কৃষ্ণরাম 'কলিকাতা'র কথাই বিশেষ করে বলেছেন, তখন 'কলিকাতা' যে ঐ সময় বাংলার এক প্রধান স্থান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কলকাতায় বিদেশী বণিকেরা বাস করতেন, তার "পাথুরে প্রমাণ" আছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "বহুকাল হইল, কলিকাতার অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী শ্রীযুক্ত Mesrov J. Seth মেস্‌রোভ সেথ্ মহাশয় কলিকাতার আরমানী গির্জার সংযুক্ত গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধিফলকগুলির মধ্যে একখানিতে নিম্নপ্রমাণে লিপি পাঠ করেন—'এই সমাধিফলক হইতেছে, দানশীল বণিক Sukias সুকিয়াস্ এর পত্নী Rezabeebeh রেজা-বীবার।' ইহাতে আরমানী সন তারিখ দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়া খ্রীষ্টান বা ইংরেজী শকের ১৬৩২ অব্দ হয়।" (সা. প. প., ১৩৪৫, পৃঃ ১৩).

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কলকাতা গুরুত্বহীন জায়গা ছিল না, তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল। এবার ষোড়শ শতাব্দীর খোঁজ নেওয়া যাক্। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনেকগুলি পুথিতে ও ছাপা সংস্করণে পাচ্ছি,

ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান দুই কূলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥

তারও আগে রচিত 'আইন-ই-আকবরী'র সাক্ষ্য এসম্বন্ধে সংশয় দূর করবে। 'আইন-ই-আকবরী' ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তার মধ্যে আবুল ফজল সাতগাঁও সরকারের মধ্যে কলিকাতা পরগণার উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণরাম দাসও 'কলিকাতা'কে সপ্তগ্রাম সরকারের অধীনস্থ একটি পরগণা বলেছেন।

এর চাইতেও পুরোনো সূত্র আমরা পেয়েছি। ১৯৫৬ সালের ১৬ই এপ্রিলের হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত এই খবরটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি।

"A nine-storeyed Sikh Gurdwara, the biggest in India, is to be built in Calcutta. It will replace the present 400-year old Bara Sikh Sangat Gurdwara in Harrison Road, the oldest in Bengal, which Guru Nanak, the founder of Sikhism, visited in 1503 and where Guru Tegh Bahadur, ninth Guru of the Sikhs—preached in 1666."

এই খবরটি দেখে আমি কলকাতায় গিয়ে বড়া শিখ সঙ্গতের সেক্রেটারী সর্দার নারায়ণ সিং পঞ্চের সঙ্গে দেখা করি এবং এই শিখ গুরুদ্বারের উপরে উদ্ধৃত ইতিহাসের প্রমাণপত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি। তিনি আমার প্রশ্নের

উত্তরে জানান যে পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা গুরু নানকের জীবনীর মধ্যে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কলকাতায় আগমনের কথা লেখা আছে ; নানক সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে করতে এইখানে এসেছিলেন ; যে জায়গায় বসে তিনি বিশ্রাম ও ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সেই জায়গাটি ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরু তেগ্ বাহাদুর স্থানীয় এক জমিদারের কাছে কিনে নেন এবং সেখানে গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা ঐ সব নানক-জীবনীর বিস্তৃত বিবরণ অথবা তাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তাই উদ্ধৃত বিবরণের সব কথা সত্য কিনা, তা বলা যায় না।

সেই রকম, বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসামঙ্গলে'র যে অংশে 'কলিকাতা'র উল্লেখ আছে, তা'ও প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৫ দ্রঃ)।

যা হোক্, অন্তত ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই যে 'কলিকাতা' বাংলার একটি বিশিষ্ট জনপদ বলে গণ্য হত—সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অকাট্য প্রমাণ ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজ আমলে এই জনপদ মহানগরীতে পরিণত হয়, কিন্তু ইংরেজদের আসার আগে 'কলিকাতা' যে একটি নগণ্য গ্রাম ছিল, তা কোন মতেই বলা চলে না।

পরিশিষ্ট 'খ'

জীব গোস্বামীর জমি কেনার দলিল

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে আমাকে বলেছিলেন যে তিনি জীব গোস্বামীর রাধাকুণ্ডে জমি কেনার সাতটি দলিল পেয়েছেন, তার মধ্যে কয়েকটি দলিলে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মারফৎ জমি কেনার উল্লেখ আছে। সম্প্রতি এই দলিলগুলির ইংরেজী অনুবাদ ডঃ নরেশচন্দ্র জানার 'বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী' (১৯৭০) বইয়ে (পৃঃ ২৯৫-৯৮) প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ জানা লিখেছেন, "এই অনুবাদ মথুরা কোর্টে গৃহীত হইয়াছে।" দলিলগুলি সম্বন্ধে কোর্টের রায় যাই হোক্ না কেন, গবেষকের পক্ষে ঐ রায় মানা বাধ্যতামূলক নয়। কারণ, আদালতে জাল দলিল দেখিয়ে মামলা জেতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে আমার দলিলগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

(১) সাতটি দলিলের মধ্যে দু'টি ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের, একটি ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এবং তিনটি ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই সাতটি দলিলেই বিক্রেতাদের নামের তালিকা অভিন্ন। ঐ নামের তালিকার ইংরেজী অনুবাদ এই, "Kamma, son of Kanru, Salwa, son of Dosa, Adhra, son of Moksa, Majja, son of Kali, Kujja, son of Aswa, Govinda, son of Johra, Bhooria, son of Kunka."

(প্রথম দলিলের অনুবাদে "Govinda,"র পরে "son" থেকে "Bhooriya," পর্যন্ত অংশ ভ্রমক্রমে বাদ পড়েছে)।

তা' হলে দেখা যাচ্ছে—১৫৪৬ খ্রীঃ থেকে ১৫৭৭ খ্রীঃ—এই সুদীর্ঘ একুশ বছরের মধ্যে মাত্র সাতজন নির্দিষ্ট লোকের কাছ থেকে জীব গোস্বামী প্রত্যেকটি জমি কিনেছেন। রাধাকুণ্ড বা আরিট গ্রামের আর কারও কাছে তিনি জমি কিনলেন না কেন—এ প্রশ্ন যেমন ওঠে, তেমনি একুশ বছর ধরে এই সাতজন লোকই জীবিত থেকে জমির মালিক হয়ে রইল—এ ব্যাপারও বিস্ময়কর।

(২) এই সাতটি দলিলই হয়েছে "under the seal of the protection of law of Kazi Badruddin"। ১৫৪৬ থেকে ১৫৭৭—এই একুশ বছর কাজী বদরুদ্দীন অটলভাবে রাধাকুণ্ড অঞ্চলের কাজীর পদে অধিষ্ঠিত রইলেন, এ ব্যাপারও বিস্ময়কর। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকুণ্ড ছিল পাঠান সুলতান ইসলাম শাহের রাজ্যভুক্ত আর ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তা মোগল সম্রাট আকবরের রাজ্যভুক্ত। এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনও কাজী বদরুদ্দীনের পদকে এতটুকু স্পর্শ করল না!

(৩) কোন দলিলেই জমির পরিমাণ উল্লিখিত নেই। এটি অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার।

(৪) সাতটি দলিলের মধ্যে কয়েকটিতে বিক্রীত জমির চতুঃসীমার উল্লেখ নেই, বাকীগুলিতে উল্লেখ আছে—তবে তা খুবই অস্পষ্ট ধরনের।

(৫) কোন দলিলেই সমসাময়িক রাজার নাম উল্লিখিত নেই।

(৬) দলিলগুলিতে গোবিন্দকে "জোহ্‌রার পুত্র" বলা হয়েছে, কোন হিন্দুর কি "জোহ্‌রা" নাম হওয়া সম্ভব?

প্রাচীন কালের বিশিষ্ট লোকদের নামে আধুনিক কালে দলিল জাল করে তার সাহায্যে জমি ভোগ করার যথেষ্টই নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার 'বাংলার

ইতিহাসের দু'শো বছর' বইয়ে (২য় সং, পৃঃ ৫৩৭-৪৮) রূপ সনাতনের নাম সংবলিত জাল দলিলের এবং এই বইয়ে (পৃঃ ২৪৫) ভারামল্লের প্রদত্ত বলে অভিহিত জাল দানপত্রের নিদর্শন দিয়েছি। শেষোক্ত দানপত্রটি আদালতের বিচারকের কাছেও উত্তীর্ণ হয়েছিল। পূর্বোক্ত দলিলগুলি যদি সত্যই জীব গোস্বামীর জমি কেনার দলিল হ'ত—তা' হলে এর থেকে সুনিশ্চিতভাবে এই দু'টি বিষয় জানা যেত :—

(ক) জীব গোস্বামী ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই বৃন্দাবনে এসেছিলেন।

(খ) রঘুনাথ দাস গোস্বামী অন্তত ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, কারণ ঐ সালেও তাঁর মাধ্যমে জমি কেনা হয়েছিল বলে একটি দলিলে লেখা আছে।

কিন্তু পূর্ববর্ণিত কারণগুলির জন্য এই দলিলগুলিকে গবেষণার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করায় অসুবিধা আছে। ষোড়শ শতাব্দীর ফার্সী দলিল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা যদি এই সাতটি দলিলের মূল (original) পরীক্ষা করে একমত হয়ে এদের অকৃত্রিম বলে ঘোষণা করেন—তা হলেই এদের উপর নির্ভর করা যেতে পারে—নতুবা নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দলিলগুলি জাল। জালিয়াৎদের পক্ষে অতীত ইতিহাস জানা সম্ভব ছিল না বলেই তারা দলিলে রাজার নাম লিখতে পারে নি।

পরিশিষ্ট 'গ'

অতিরিক্ত টীকা, নতুন তথ্য ও ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা ৮, ছত্র ৭—১১ :—এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অংশ পঠনীয়,

"বিপ্রদাস পিপিলাই তার বাসভূমি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'চিরকাল বসতি নাড়ুড্যা বটগ্রাম।' এখন 'নাড়ুড্যা' বা নাড়ুড়িয়া নামে কোন স্থান বর্তমান নেই বলে তার জায়গায় 'বাড়ুড্যা'কে সঠিক পাঠ বলে কেউ কেউ ধরেছেন। ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমায় অবস্থিত 'বাদুড়িয়া' সুবিখ্যাত গ্রাম, এখানে থানাও আছে। কিন্তু তার আশেপাশে 'বটগ্রাম' বলে কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় নি। পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী উনবিংশ শতাব্দীর ডাক-

বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগের নথিপত্রে 'নাহুড়িয়া' ও 'বটগ্রাম' নামে দু'টি পাশাপাশি অবস্থিত গ্রামের সন্ধান পেয়েছেন। এখনকার হাবড়া (২৪ পরগণা) শহরের এলাকার মধ্যে এই দু'টি গ্রামের অবস্থান ছিল। সুতরাং এখানেই বিপ্রদাস পিপিলাই-এর নিবাস ছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।"

পৃঃ ২৮—৪৯ :—এই পৃষ্ঠাগুলিতে কয়েকটি শব্দে গুরুতর মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। সেগুলি এইভাবে সংশোধনীয়।

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হবে
২৮	২৯	১৪৩২ শকাব্দ	১৪৩১ শকাব্দ
২৯	১৭	মাঘের	মাঘ
২৯	২৯	চেনাপ্পা	চেন্নাপা
৪৯	২৮	১৫০০ শকাব্দের	১৪০০ শকাব্দের

পৃষ্ঠা ৫২, ছত্র ২৭ :—"জগবন্ধু" স্থলে "জগদ্বন্ধু" পঠনীয়।

পৃষ্ঠা ৫৩, ছত্র ১ :—"জগবন্ধুবাবু" স্থলে "জগদ্বন্ধুবাবু" পঠনীয়।

পৃঃ ৫৯, দ্বিতীয় পাদটীকা :—এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত বক্তব্য নীচে দেওয়া হল,

"১৯৫৮ সালে প্রকাশিত আমার 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' বইয়ে (পৃঃ ১৫৭) এই লিপিকালটির [১৬২৯ শক ও ১০১৩ সন (মল্লাব্দ)] উল্লেখ করেছিলাম, এর থেকেও বোঝা যায় যে আমার ২৬।১।১৯৫৭ তারিখে ঐ পাতড়া থেকে লিপিকালটি টুকে নেবার সময়ে তা স্পষ্ট করে লেখা ছিল। ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ডের পূর্বার্ধে পাতড়াটির ফটো প্রকাশিত হল। তাতেই দেখা গেল উপরে উল্লিখিত লিপিকাল অস্পষ্ট এবং ডঃ সুকুমার সেন নিবন্ধটির রচনাকাল ১৬২০ শকাব্দকে পাতড়ার লিপিকাল এবং জীব গোস্বামীর মৃত্যু-সাল ১৫৩২ শকাব্দকে নিবন্ধের রচনাকাল বলছেন।"

পৃষ্ঠা ৭৯, ছত্র ৯ :—"বিনির্গত" স্থলে "নির্গত" পঠনীয়।

পৃষ্ঠা ৯৬, ছত্র ২৬ ও ২৮ :—"অম্বিকানাথ" স্থলে "অম্বিকাচরণ" পঠনীয়।

পৃষ্ঠা ৯৮, ছত্র ১১ :—"সম্ভবত"র ঠিক আগে পঠনীয়,

"সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার ব্রজমোহন দাস তাঁর 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ'-এ স্পষ্টভাবে 'চৈতন্যভাগবত' নামটি উল্লেখ করেছেন (এই বই, পৃঃ ২৭৫ দ্রঃ)।"

পৃষ্ঠা ১৩৩, পাদটীকা, ছত্র ১—৪ :—এই ছত্রগুলি শুধু 'নরোত্তমবিলাসে' উদ্ধৃত হয় নি, 'ভক্তিরত্নাকরে'ও উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং ১৩৩ পৃষ্ঠার ছত্র

৬-এ "এই গ্রন্থ ও" স্থলে " 'ভক্তিরত্নাকর' ও" এবং ঐ পৃষ্ঠার পাদটীকার ছত্র ৫-এ "নরোত্তমবিলাস" স্থলে " 'ভক্তিরত্নাকর' বা 'নরোত্তমবিলাস' " পঠনীয়।

পৃষ্ঠা ১৩৭, ছত্র ৬ (পাদটীকা) :—"প্রনাণ" স্থলে "প্রমাণ" পঠনীয়।

পৃষ্ঠা ২০৫, ছত্র ১৮ :—"দুটি দৃষ্টান্ত" স্থলে "তিনটি দৃষ্টান্ত" পঠনীয়। এই ছত্রের পরে এই বাক্যটি পড়তে হবে,

"এর মধ্যে দু'টি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল, তৃতীয়টির জন্য বর্তমান গ্রন্থের পৃঃ ২৬৫, পাদটীকা, ছত্র ১২—১৫ দ্রষ্টব্য।"

পৃষ্ঠা ২১৮, ছত্র ১২ :—"...মেলামেশা ছিল ;"—এই প্রসঙ্গে বক্তব্য,

"এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শুজার সঙ্গে আলাওলের ঘনিষ্ঠতা অথবা পরিচয় থাকার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ পর্যন্ত মেলে নি। তবে শুজা বা তাঁর কোন বিশিষ্ট অনুচরের সঙ্গে আলাওলের কোন ধরনের যোগাযোগ নিশ্চয়ই ছিল, তা না হলে আলাওলের নামে শুজার পক্ষ নিয়ে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার মিথ্যা অভিযোগও করবার সুযোগ কেউ পেত না।"

পৃষ্ঠা ২৫৬, ছত্র ১২—১৪ :—"মোহাম্মদ খান···কিছু লেখেন নি।" এই বাক্যটির পাদটীকা হিসাবে নিম্নলিখিত অংশটি পঠনীয়।

"কারও কারও মতে ইমামদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নসরুল্লার 'জঙ্গনামা' কাব্য মোহাম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন'-এর আগে লেখা। মৌলানা ওবায়েদুল হক তাঁর 'বাঙলাদেশের আউলিয়া কাহিনী' বইয়ে লিখেছেন যে নসরুল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র খোন্দকার শাহ শরীফ ১০৪৫ হিজরার ১২ই রবিঅল আওয়ালে (১৬৩৫ খ্রীঃ) পরিণত বয়সে মারা গিয়েছিলেন বলে তিনি পরিবারে বা মাজারে রক্ষিত প্রাচীন কাগজপত্র থেকে জানতে পেরেছেন। ঐ সব কাগজপত্রের প্রামাণিকতা তথা উক্ত খোন্দকারের সঙ্গে নসরুল্লার সম্পর্ক সম্বন্ধে আদৌ নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না বলে এর থেকে স্থির করা যায় না যে নসরুল্লা ১৬৩৫ খ্রীঃর আগে জীবিত ছিলেন।

'জঙ্গনামা'তে চট্টগাম অঞ্চল নিবাসী নসরুল্লা তাঁর এই বংশলতা দিয়েছেন (আবদুল করিম প্রণীত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', পৃঃ ৩৬—৩৯ দ্রষ্টব্য),

হামিদুল্লা খান—বোরহানদ্দি—ইব্রাহিম খান—সুজাওদ্দি খান—বাবু (আবু ?) খান—ইছাহাক খান —সরিফ মনছুর—নছরোল্লা বা নসরুল্লা।

নসরুল্লা আরও লিখেছেন যে তাঁর পিতাকে অগ্রবর্তী করে ও যত মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে নমাজ পড়তেন 'রাম্ভু' অর্থাৎ রামুর নরপতি ফত্তে খান,

'যাকে মান্য করি বসাইল বিদ্যমান॥ রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন বিখ্যাত।' এই ফতে খানই আবার তিনি, 'যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত॥ গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া। আনিলেক দিল্লীশ্বর যাহে যেবা গিয়া॥' এর থেকে বোঝা যায় যে ফতে খান প্রথমে ছিলেন রোসাঙ্গ অর্থাৎ আরাকানের রাজার সামন্ত নৃপতি, পরে দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ হন। সুতরাং ফতে খান এবং নসরুল্লা-জনক সরিফ মনছুর নিঃসন্দেহে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের কাছ থেকে দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর চট্টগ্রাম এলাকা (রামুও যার মধ্যে পড়ে) জয় করার সময়ে বর্তমান ছিলেন। অতএব নসরুল্লার 'জঙ্গনামা' (যাতে ফতে খানের দিল্লীশ্বরের কাছে যাওয়া অতীত ঘটনা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের আগে রচিত হয় নি।

শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমীন আমাকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন যে 'জঙ্গনামা'র এক পুথিতে তিনি নসরুল্লার ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ হামিদুল্লা খানের নামের পাঠান্তর পেয়েছেন 'হামিদুদ্দীন খান'; এঁর সম্বন্ধে ঐ পুথিতে লেখা হয়েছে যে ইনি ছিলেন 'গৌড় দেশে বঙ্কু নাম' স্থানে 'দুই শিকের অধিকারী' এবং 'সৈন্যপাল উজীর প্রধান'। এর থেকে রুহুল আমীন সাহেব মনে করেন যে এই হামিদুল্লা বা হামিদুদ্দীন খান দৌলত উজীর বাহরাম খানের পূর্বপুরুষ হামিদ খানের (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৫১ দ্রঃ) সঙ্গে অভিন্ন (অর্থাৎ নসরুল্লা বাহরাম খানের জ্ঞাতি)। এই মত সমর্থনযোগ্য। হোসেন শাহ তাঁর উজীর হামিদ খানকে 'দুই সিক' দান করেন ('প্রসাদ করিলা দুই সিক॥') এবং তার পরে চট্টগ্রামের অধিকারীর পদে নিযুক্ত করেন বলে বাহরাম খান লিখেছেন—ঐ 'দুই সিক' কোথায় অবস্থিত ছিল, তা তিনি বলেন নি। রুহুল আমীন সাহেবের পুথিতে হামিদুদ্দীনের দুই সিকের অবস্থান-ভূমির নাম দেওয়া হয়েছে 'বঙ্কু'— নামটি ঠিকমত পড়া হয়েছে কিনা, তা সন্দেহের বিষয়। এই 'বঙ্কু' 'গৌড় দেশে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল, 'গৌড় দেশ' বলতে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ সমেত সমগ্র বাংলাকে বোঝাত। রুহুল আমীন সাহেবের মতে 'বঙ্কু' =বাঁকুড়া, কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। কারণ হোসেন শাহের আমলে বাঁকুড়া নগণ্য স্থান ছিল এবং তা ছিল বিষ্ণুপুরের রাজাদের অধীন; তাঁরা দিল্লীর বা বাংলার মুসলিম রাজশক্তির সার্বভৌমত্ব মেনে নিলেও তাঁদের রাজ্যের কোন অংশে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ শাসন কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যা হোক্—হামিদ খান এবং হামিদুল্লা বা হামিদুদ্দীন খানকে অভিন্ন ধরলে তিনি হন হোসেন

শাহের (আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বা জালালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ) সমসাময়িক অর্থাৎ অন্তত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তার অনেক পর পর্যন্ত তাঁর বর্তমান থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। নসরুল্লা হামিদের পুত্র বোরহানদ্দির 'ধবল মাতঙ্গেশ্বর' রোসাঙ্গরাজের 'নিজ মুখে' প্রশংসা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয় চট্টগ্রাম অঞ্চল রোসাঙ্গ অর্থাৎ আরাকানের রাজার অধীনে যাওয়ার (আঃ ১৫৬০ খ্রীঃ) পরেও বোরহানদ্দি জীবিত ছিলেন। সুতরাং হামিদের অধস্তন অষ্টম পুরুষ নসরুল্লার জীবৎকাল এ দিক্ দিয়েও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের আগে কোন মতেই হয় না। অতএব তাঁর 'জঙ্গনামা'র রচনাকাল মোহাম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেনে'র রচনাকালের (১৬৪৬ খ্রীঃ) নিঃসন্দেহে পরবর্তী।"

পৃষ্ঠা ২৬৬, ছত্র ২০ :—"১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে"র পরে একটি তারকাচিহ্ন (*) যোগ হবে এবং এর পাদটীকা হিসাবে এই বাক্যটি পড়তে হবে :—

"রতিকান্তের গুরু হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার তারিখ ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের অনেক আগেই ধরতে হবে, কারণ রামগোপাল দাস 'রসকল্পবল্লী'র দ্বাদশ কোরকে রতিকান্তের মৃত্যুর কথা লিখেছেন।

পৃষ্ঠা ২৮৭, ছত্র ১৯—২০ :—"সুতরাং ঘনরামের জননীর নাম যে 'সীতা'ই ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।" এই বাক্যটির পরে পঠনীয়,

"এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত ভনিতা থেকে,

কৌকুসাবী অবতংসে কুশধ্বজ রাজবংশে
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান্।
তাঁহার দুহিতা সীতা সত্যবতী পতিব্রতা
তার সুত ঘনরাম গান॥

(পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃঃ ৫৯৬)

সুতরাং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতের ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে সংশয়ের আর কোন অবকাশ নেই। উপরে উদ্ধৃত ভনিতাটির দিকে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।"

পৃষ্ঠা ৩০১, পাদটীকা :—এখানে ছাপা বাক্যটির পরে নিম্নলিখিত বাক্যটি যুক্ত হবে,

"কিন্তু এই দু'টি পুথি নিঃসন্দেহে এক ; কারণ এদের লিপিকাল ("বিতারিখ ১০ ফাল্গুন ॥ সকাব্দা ১৭৩১ ॥") ও তা লেখবার ধরন অভিন্ন, পুষ্পিকার অন্যান্য অংশও অভিন্ন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে দিয়ে পুথিটি নকল করিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তির অযোগ্যতা, অসাবধানতা ও অসাধুতার দরুন (সে ঐ নকলের মধ্যে নিজের লেখা দু'চার ছত্রও ঢুকিয়ে দিয়েছিল) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠের সঙ্গে পুথির পাঠের কিছু পার্থক্য সৃষ্ট হয়েছে।"

পৃষ্ঠা ৩০৮, পাদটীকা, ছত্র ৩ :—"...সংস্কৃত 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ"—এর পর পঠনীয় :—

"এবং (তাঁর মতে) এই 'রাজরত্নাকর' ত্রিপুরার ইতিহাস সম্বন্ধে একটি সুপ্রাচীন ও মূল্যবান বই।"

পৃষ্ঠা ৩১১, ছত্র ১০ :—"গ্রামে জমি দেন" স্থলে "গ্রাম ইজারা দেন" পঠনীয়।

পৃষ্ঠা ৩১১, ছত্র ১৩ :—"ইজারা নেন" স্থলে "পত্তনি নেন—কর্মচারী রামদেব নাগের নামে" পঠনীয়।

পৃষ্ঠা ৩১২, ছত্র ২৫ ও ২৮ :—এই দুই ছত্রেই "ইজারা" স্থলে "পত্তনি" পড়তে হবে।

পৃষ্ঠা ৩১৪, ছত্র ৪ :—"....সেখানে ফিরে আসেন।" এর পর পঠনীয়,

"বর্গীর হাঙ্গামার জন্য বর্ধমানের মহারাজার মা মূলাজোড়ের সন্নিহিত কাউখালি গ্রামে বাস করছিলেন বলে তাঁর রামদেব নাগের নামে মূলাজোড় গ্রাম পত্তনি নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল ; ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার অবসান হলে রাজমাতা বর্ধমানে ফিরে যান এবং রামদেব নাগের পত্তনি বজায় রাখার আর কোন দরকার না থাকায় তার অবসান ঘটানো হয় ; ফলে ভারতচন্দ্রও তখন মূলাজোড়ে ফিরে আসেন। আনারপুরে জমি পাবার পরেও মূলাজোড় গ্রামের অধিবাসীদের অনুরোধে ভারতচন্দ্র পত্তনির আমলে মূলাজোড় ছেড়ে চলে যান নি বলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যা লিখেছেন, তা যে সত্য নয়—পূর্বোদ্ধৃত দলিলটি থেকে তার প্রমাণ মেলে। বর্ধমানের রাজপরিবারের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের যে শত্রুতার সম্পর্ক ছিল, তারও ফলে তাঁদের পত্তনি-নেওয়া মূলাজোড় গ্রামে বাস করা ভারতচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

পরিশিষ্ট 'ঘ'

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা 'শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকুণ্ডলী' প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ

(বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩০, ছত্র ৪-৭ দ্রষ্টব্য)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-দিবস ও জন্মকালীন গ্রহসংস্থান সম্বন্ধে এখনও মতবিরোধ দেখা যায়, ইহা নিতান্তই বিস্ময়জনক। কারণ, যে দিবস একটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কোন দ্বিমত বা সংশয় হইতেই পারে না।...

পাশ্চাত্য দেশে গ্রহণের তালিকা ১৫০।২০০ বৎসর ধরিয়া নানা গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে—একটি তালিকা Cunninghum's Book of Indian Eras গ্রন্থে এবং তাহা হইতে "বিশ্বকোষে" মুদ্রিত হওয়ায় সুপ্রাপ্য হইয়াছে। আলোচ্য চন্দ্রগ্রহণের ইংরাজী তারিখ উক্ত সমস্ত গ্রন্থে অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইয়াছে—১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ (জুলিয়ান কেলেণ্ডার)।...ঐ দিন ১৪০৭ শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার ছিল। ..

আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় আলোচ্য গ্রহণের গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, "পূর্ণিমা নবদ্বীপে প্রায় ৪০ দণ্ড। দিবামান ২৯ দণ্ড। রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল, গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি" (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, পৃঃ ৩৪৬ পাদটীকা) এই গণনা স্থূল বলিয়া সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নহে। গ্রহণ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ Oppolzer's Canon der Finsternisse ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—খৃষ্টপূর্ব ১২০৭ হইতে ২১৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমস্ত সূর্য-চন্দ্র গ্রহণের বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, আলোচ্য চন্দ্রগ্রহণ "সর্বগ্রাস" হইয়াছিল (পৃ—৩৬৬।২) গ্রহণ মধ্য ১৬ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট (গ্রীণউইচ্) অর্থাৎ ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় অনুযায়ী রাত্রি ১০টা ১৭ মিনিট এবং নবদ্বীপে ১০টা ৪২ মিনিট। মোট স্থিতিকাল ৩ ঘণ্টা ২৮ মিনিট—তন্মধ্যে ঠিক এক ঘণ্টাকাল নিমীলন বা সর্বগ্রাস। .. নবদ্বীপে গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল স্থানীয় সময়ে রাত্রি ৮টা ৫৮ মিনিটে। সুতরাং মহাপ্রভুর জন্ম সিংহ লগ্নে হইয়া থাকিলে জন্মের প্রায় এক প্রহর পরে গ্রহণ আরম্ভ

।

হইয়াছিল—গ্রহণের পূর্বে জন্মের কথা প্রামাণিক লেখা দ্বারাও সমর্থিত হয় (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ১৯-২০)।

[এই প্রবন্ধে দীনেশবাবু দেখিয়েছেন যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর একটি সন্দর্ভে এবং বিষ্ণুদাসের 'সীতাগুণকদম্বে' চৈতন্যদেবের জন্মের তারিখ সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে, প্রথম গ্রন্থে বার ও দ্বিতীয় গ্রন্থে নক্ষত্র উল্লেখ করা হয়েছে, শেষেরটি ভুল। ব্রজমোহন দাসের 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে' (বৃহস্পতিবর্ষের অর্থহীন নির্দেশ বাদ দিলে) তারিখটি বার সমেত সঠিকভাবে লিখিত হয়েছে এবং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' সর্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের কথা অভ্রান্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে দীনেশবাবু দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১০০ ও পৃঃ ২৭৪ দ্রষ্টব্য।]

নির্ঘণ্ট

[যে সব পৃষ্ঠাসংখ্যা মোটা অক্ষরে ছাপা হয়েছে, তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই নির্ঘণ্টে মূল আলোচনায় উল্লেখ ও পাদটীকায় উল্লেখের মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষা করা হয় নি।]

সঙ্কেতপঞ্জী

বা. সা. ই. ১=ডঃ সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড। এই গ্রন্থের সংস্করণগুলি অনেক সময়ে | ১, | ২, | ৩, | ৪—এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। "পূ." = পূর্বার্ধ এবং "অ." = অপরার্ধ বুঝতে হবে।

বা. সা. ২=মণীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্য', ২য় খণ্ড।

শ্রীচৈ. চ. উ.=ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'।

সা. প. প ='সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'।